মাসুদ রানা

হ্যাকার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

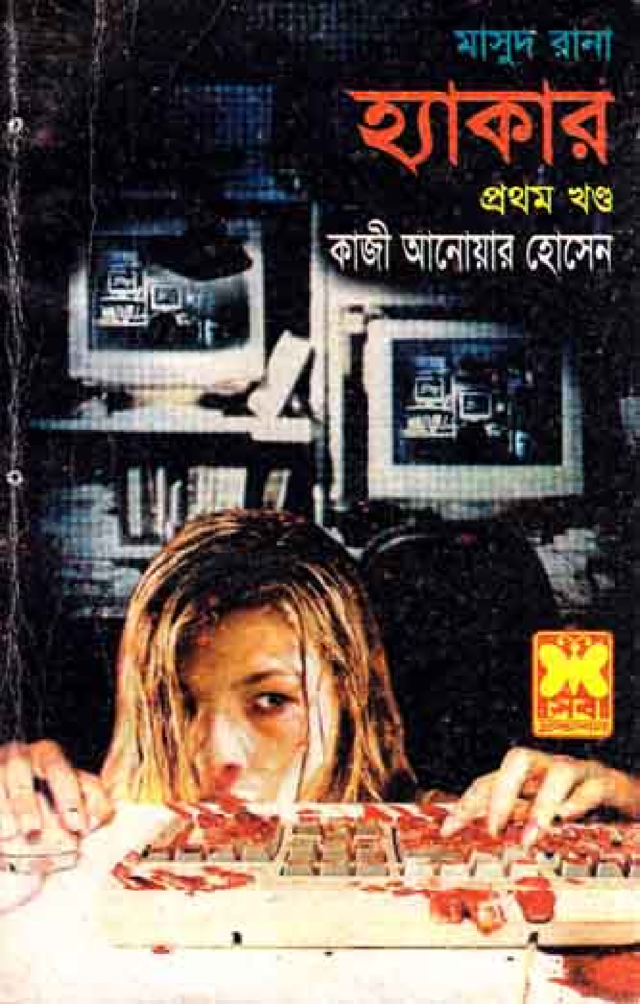

মাসুদ রানা

হ্যাকার-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

একটা খবর একই সঙ্গে কীভাবে ভাল আর মন্দ হয়, বলতে পারেন? ঠিক আছে, উদাহরণ দেয়া যাক।

নাসার ডিপ স্পেস প্রোব *ভয়েজার-টু*'তে রিসিভ করা হয়েছে অত্যাশ্চর্য এক সিগনাল—ভিনগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার অকাট্য প্রমাণ। সুসংবাদ, তাই না?

কিন্তু খারাপ খবরটা হচ্ছে, ওটার ভিতর লুকিয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর কোড, যা আগামী চারদিন পর সারা পৃথিবীর কম্পিউটার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।

আর এর পিছনে যারা জড়িত, তারা কোনও ভিনগ্রহবাসী নয়, এই গ্রহেরই দু-পেয়ে জানোয়ার।

এই মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে হ্যাকিং, সাইবার-ক্রাইম আর সাইবার-টেররিজমের সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা অন্ধকার জগতে ঢুঁ মারতে চলেছে মাসুদ রানা। কিন্তু কাজটা সহজ নয় মোটেই। উদয় হয়েছে ওর পুরনো শত্রু ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগ। যে-কোনও মূল্যে রানাকে ঠেকাতে মরিয়া সে। রয়েছে অচেনা শত্রুর লেলিয়ে দেয়া ভয়ঙ্কর খুনীরাও। আগামী ৯০ ঘণ্টা নরক দর্শন করে ফিরবে রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.boiRboi.net

এক

জুন, ১৯৯০। গ্লস্টারশায়ার, ইংল্যান্ড।

অফিস ছুটি হওয়ায় কিংসউড ইলেকট্রনিক্সের পার্কিং লটে বাড়িমুখী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভিড়। প্রচুর মানুষ জায়গাটায়. তারপরও একটু খেয়াল করলেই একজোড়া যুবক-যুবতীর উপর চোখ আটকে যাবে আপনার। স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এমন চমৎকার জুটি সচরাচর চোখে পড়ে না। সেইসঙ্গে চমকেও যাবেন, যদি শোনেন—ওরা বিবাহিত এবং সাত বছর বয়েসী এক কন্যাসন্তানের জনক-জননী। হঠাৎ দেখায় ওদের কলেজ-পড়ুয়া উচ্ছল তরুণ-তরুণীর মত মনে হলেও বাস্তবে দুজনেরই বয়েস উনত্রিশ. বেশ কিছুদিন হলো ইউনিভার্সিটির পাট শেষ করে চাকরিজীবনে প্রবেশ করেছে।

মাইকেল ওয়ালডেন টগবগে যুবক—ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, মাথাভর্তি কোঁকড়া কালো চুল, দু'চোখে রাজ্যের উজ্জ্বলতা। অসম্ভব সুপুরুষ, মুখে সারাক্ষণই একটা হাসিখুশি ভাব ফুটে আছে, যেন পৃথিবীর কোনওকিছুই তাকে বিচলিত করতে পারবে না। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে, যা মেয়েরা সাধারণত এড়িয়ে যেতে পারে না। মাইকেলের সুগঠিত-সুঠাম দেহও এর একটা কারণ হতে পারে, হঠাৎ দেখায় তাকে অ্যাথলিট বলে ভ্রম হয় প্রায় সবারই। অবশ্য দেহের চেয়ে তার মগজটা অনেক বেশি

প্রখর—পরিচিতজনরা একবাক্যে স্বীকার করবে ব্যাপারটা।

মগজের কথাই যদি বলতে হয়, তা হলে ডেবিকেও এড়ানোর উপায় নেই। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত মেধা রয়েছে তার, লেখাপড়ায় তার কৃতিত্বও উল্লেখ করার মত। অবশ্য ডেবির রূপ-যৌবন হারিয়ে দেবে বাকি সব গুণকে। সিল্কের মত মসৃণ কোমর-ছাড়ানো সোনালি চুল তার, পটলচেরা চোখের নীল মণিতে সাগরের গভীরতা। তীক্ষ্ণ নাক, ছোট্ট কপাল, পাতলা ঠোঁট আর ডিম্বাকৃতির মুখটা যেন শিল্পীর হাতে গড়া হয়েছে—চেহারাটা হয়ে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর আর মায়াময়। সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার দেহটাও ছিপছিপে, তাতে অকৃপণ হাতে যৌবনের সম্পদ ঢেলেছেন সৃষ্টিকর্তা, নশ্বর এক নারীকে পরিণত করেছেন সব পুরুষের আরাধ্য দেবীতে।

অবশ্য বিপরীত লিঙ্গকে নাচানোর মত যত রসদই থাকুক, তা কখনও ব্যবহার করে না মাইকেল বা ডেবি। একে অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ওরা, ভুলেও চোখ তুলে অন্য কোনও নারী বা পুরুষের দিকে তাকায় না। তাকাবার প্রয়োজনও অবশ্য পড়ে না, দম্পতি হিসেবে অত্যন্ত সুখী দুজনে। সেই স্কুলজীবনে সম্পর্কের শুরুটা করেছে ওরা, অল্প বয়েসের প্রেম পরিণত বয়স পর্যন্ত টেকে না বলে যে মতবাদটা আছে, সেটাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছে. আজও সেই শুরুর মতই অটুট ওদের বন্ধন। অবশ্য এর পিছনে প্রধান কারণ দুজনের মধ্যকার চমৎকার বোঝাপড়া। ব্যক্তিত্ব আর পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই ওদের, ছোটখাট যেসব বিভেদ আছে, সেগুলোও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে জানে দুজনে—সম্পর্কটা এত বছর টিকে থাকার রহস্য সেটাই। এই চমৎকার বোঝাপড়াটার জন্যই আজ পর্যন্ত ওদের জীবনে অন্য কোনও নারী বা পুরুষ আসেনি।

বিধাতা নাকি পৃথিবীতে সবার জন্যই উপযুক্ত একটা জুটি তৈরি করে রাখেন, প্রত্যেক মানুষ অবচেতনভাবে সারাটা জীবন তার অপর অর্ধাংশকে খুঁজে বেড়ায়, সত্যি সত্যি পায় অল্প ক'জন। মাইকেল আর ডেবি সেই সৌভাগ্যবানদের দুজন। ব্যাপারটা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি ওদের, তাই দ্রুত বিয়ে করে একে অপরকে চিরতরে বেঁধে ফেলতে উৎসুক হয়ে রয়েছিল শুরু থেকেই। মাইকেলের বয়স একুশ পেরোতেই আইনগত বাধাটা আর রইল না, শুভ কাজে আর দেরি করেনি ওরা—মাইকেলের একুশতম জন্মদিনটাই ওদের বিয়ের দিন। এক বছরের মাথায় কোল জুড়ে এসেছে ফুটফুটে এক রাজকন্যা, তাকে নিয়ে সুখের সংসার গড়েছে দুজনে।

অবশ্য ওদের গল্পটা শুধু প্রেম আর ভালবাসার বললে ভুল হবে। দুজনে যে অত্যন্ত মেধাবী, তা তো আগেই বলা হয়েছে। স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিল ওরা, পড়াশোনা করেছে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে। শুধু তাক লাগানো ফলাফলই নয়, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তরতর করে এগোতে থাকা এই ফিল্ডে চমৎকার কিছু আবিষ্কারও ইতোমধ্যে করে ফেলেছে ওরা, ফলে উদীয়মান কম্পিউটার বিজ্ঞানী হিসেবে নামডাক ছড়াতে শুরু করেছে। ঘরে ছোট্ট একটা সন্তান রেখে ওরা কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর। পড়াশোনা শেষ করার আগেই একের পর এক আকর্ষণীয় চাকরির প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু লোভের ফাঁদে পা দেয়নি ওদের কেউই। লেখাপড়া শেষ করেছে, ডক্টরেট নিয়েছে, তারপর যোগ দিয়েছে চাকরিতে।

কিংসউড ইলেকট্রনিক্স যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে নামজাদা ও বড় কোম্পানিগুলোর একটা, ওয়ালডেন দম্পতিকে পেতে তাদের শুধু

boirboi.net

টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হয়নি, মেনে নিতে হয়েছে স্বামী-স্ত্রী'র হাজারটা শর্ত, সেইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে কাজ করার স্বাধীনতা দেবার। আজ দেড় বছর হলো যোগ দিয়েছে মাইকেল আর ডেবি, ইতোমধ্যে কিংসউডকে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেক্টরে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে ওরা।

গ্রীষ্মের এই সুন্দর বিকেলে অফিস শেষ করে বেরিয়ে এসেছে মাইকেল আর ডেবি, বাড়ি ফিরবে। ভিড় এড়িয়ে এগিয়ে পার্কিং লটের এক প্রান্তে রাখা নিজেদের টয়োটা কারে উঠে বসল ওরা। কোম্পানি দামি গাড়ি আর শোফার দিতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি ওদের কেউ, পাঁচ বছর আগে কষ্ট করে কেনা এই গাড়িটা ওদের কাছে অনেক বেশি আপন আর নানা রকম স্মৃতিতে ভরা। এই অনুভূতি আর কোনও গাড়ি দিতে পারবে না ওদের।

ড্রাইভিং সিটে বসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল মাইকেল, ইগনিশন ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। ডেবিও প্রত্যুত্তরে হাসছে দেখে তাকে হালকা করে চুমো খেল ও, তারপর হ্যান্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল। ধীরগতিতে অন্যান্য গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল টয়োটা পার্কিং লট থেকে। দুজনের কেউই জানল না, মাত্র দশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা কালো শেভি ভ্যানটা থেকে নজর রাখা হচ্ছে ওদের উপর।

ভ্যানের ভিতর রুক্ষ চেহারার দুজন লোক বসা—ড্রাইভার বিশালদেহী; তার সঙ্গী বেঁটেখাটো, নাকের তলায় ঝাঁটার মত গোঁফ। টয়োটাকে বেরিয়ে যেতে দেখে কোলের উপর থেকে একটা ওয়াকিটকি তুলে নিল ঝাঁটাগুঁফো, বোতাম টিপে বলল, 'টার্গেট রওনা দিয়েছে, সবাই রেডি থাকো। টিম ওয়ান, রোডব্লক করে ফেলো। টিম টু, তৈরি হও, টার্গেট আর আমরা তোমাদের

ক্রস করব দশ মিনিটের মধ্যে। তারপরই রাস্তা আটকে দেবে, কোনও ট্রাফিক যেন না থাকে।'

'দিস ইজ টিম টু,' ওপাশ থেকে জানানো হলো, 'আমরা অলরেডি ট্রাফিক ডাইভার্ট করে দিতে শুরু করেছি। রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই।'

'আগেই শুরু করলে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ঝাঁটাগুঁফো। 'কেউ যদি সন্দেহ করে বসে?'

'তেমন কোনও ভয় নেই, রাস্তাটা এমনিতেই নির্জন। সব মিলিয়ে মাত্র চারটে গাড়ি এসেছিল। আমাদের পোশাক দেখে কিচ্ছু সন্দেহ করেনি।'

'তা হলে তো ভালই। স্ট্যান্ড বাই, আমরা আসছি এখুনি।' ড্রাইভারের দিকে তাকাল ঝাঁটাগুঁফো। 'লেটস্ গো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্টার্ট দিল বিশালদেহী, পার্কিং লট থেকে ভ্যান নিয়ে বেরুল ধীরে, মেইন রোডে এসে হু হু করে গতি বাড়িয়ে দিল। মাইকেল পাগলের মত গাড়ি চালায়, টয়োটা এগিয়ে গেছে অনেকটা, সেটাকে ধরতে হবে।

'সাবধানে চালাও,' ঝাঁটাগুঁফো বলল। 'টার্গেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্ব রাখবে সারাক্ষণ, বেশি কাছে যেয়ো না।'

খানিক পরেই নজরে পড়ল মাইকেল আর ডেবির নীল টয়োটা, শহরের রাস্তা ছেড়ে হাইওয়ে একজিটের পাশে ইন্ডিকেটর জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ট্রাফিক বাতি সবুজ হবার জন্য। একটু দূরত্ব রেখে কালো ভ্যানটাও থামল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেল, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে হাইওয়েতে গাড়িটাকে তুলে আনল মাইকেল, রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে শুধু একটা কালো ভ্যান দেখতে পেল, সামনে বা পিছনে আর কোনও গাড়ি নেই। রাস্তা ফাঁকা দেখে গতি

বাড়িয়ে দিল ও, দ্রুত ছুটছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। হাইওয়ের এই পথ ধরে কয়েক মাইল এগোলেই কটস্‌ওল্ড হিলের পার্বত্য এলাকা, সেখানে উইনস্টোনের পাহাড়ি উপত্যকায় নির্মল প্রকৃতির মাঝে ওদের বাড়ি। যদিও প্রায় সভ্যতা-বিবর্জিত এমন জায়গা বসবাসের জন্য সাধারণ লোকজন পছন্দ করে না, তবে মাইকেল আর ডেবি অন্যরকম ধ্যানধারণার মানুষ। শহরের যান্ত্রিকতা পছন্দ নয় ওদের কারও, সারাদিন জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার পর দিনের শেষে ওরা চায় নির্মল একটা পরিবেশ, সেজন্যই ওখানে আবাস গড়েছে দুজনে। সমস্যা একটাই, যাওয়া-আসা করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সময়টা কমিয়ে আনার চেষ্টায় থাকে মাইকেল। অবশ্য ঝুঁকি তেমন নেই এতে—রাস্তাটায় খুব একটা ট্রাফিক থাকে না। জোরে চালালেই যে অ্যাকসিডেন্ট হবে, তা নয়।

স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি পেরুচ্ছে দেখে বাঁকা চোখে স্বামীর দিকে তাকাল ডেবি। বলল, 'আস্তে চালাও। এত তাড়া কীসের?'

মুচকি হাসল মাইকেল। 'কত কাজ পড়ে আছে, জানো না? বাসায় গিয়ে মেয়েটাকে আদর করতে হবে, ঘরদোর গোছাতে হবে, ডিনার তৈরি করতে হবে, তারপর তোমাকে নিয়ে বিছানায়...'

'মারব এক কিল!' চোখ রাঙাল ডেবি। 'ইস্‌সি রে, ভাবখানা দেখো! এমনভাবে বলছে যেন নিজে করবে! কাজ তো সব করতে হবে আমাকেই!'

'তুমিই তো করবে,' হাসল মাইকেল। 'তাড়াতাড়ি না গেলে কাজ সেরে বিছানায় আসবে কীভাবে...উহুহ্‌!'

স্বামীর হাতে জোরে চিমটি কেটেছে ডেবি। ভুরু নাচিয়ে

boiRboi.net

বলল, 'কী...কেমন মজা?'

ব্যথা পাওয়া জায়গাটা অন্য হাতে ডলল মাইকেল। শাসাল, 'আজ রাতে তোমার খবর আছে!'

আবারও চিমটি কাটল ডেবি।

'অ্যাই, অ্যাই! করছ কী?' বলল মাইকেল। 'ড্রাইভিঙের সময় ডিস্টার্ব করতে হয় না—এটা জানো না? অ্যাকসিডেন্ট হলে কিন্তু আমাকে দুষতে পারবে না।'

'করো তোমার ড্রাইভিং,' কপট রাগের সুরে বলল ডেবি। 'বাড়ি ফিরে প্রতিশোধ নেব। আজ রাতে একা শোবে তুমি, আমি থাকব আমার মেয়ের সঙ্গে।'

'কী সর্বনাশ! এত নিষ্ঠুর হতে পারবে তুমি?'

'উঁহুঁ, ওসব মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবে না...'

কথা বলতে বলতে কটস্ওল্ডের পার্বত্য এলাকায় পৌঁছে গেল গাড়ি। দিগন্তজোড়া উঁচু-নিচু পাহাড় ঢেকে রেখেছে সামনেটা, আর এরই মাঝ দিয়ে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে চলে গেছে রাস্তা। প্রথম ঢালটায় চড়ার সময় পথের পাশে আরেকটা ভ্যান পেরিয়ে এল ওরা, তবে ওটার উপস্থিতিটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না।

ভ্যানটার গায়ে লেখা: *লিওয়ে কনস্ট্রাকশনস্*। টয়োটা পেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে সেটা থেকে নামল চারজন লোক, সবার পরনে কভারঅল আর হেলমেট। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর অনুসরণকারী কালো ভ্যানটাও পেরিয়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা, কাঠের তৈরি রোডব্লক আড়াআড়িভাবে বসিয়ে বন্ধ করে দিল রাস্তা, মাঝখানে বসাল একটা সাইনবোর্ড। তাতে বড় বড় করে লেখা:

সাবধান!

রাস্তা মেরামতের কাজ চলিতেছে।

বিকল্প পথ ব্যবহার করুন।

রিয়ারভিউ মিররে দৃশ্যটা দেখে সন্তুষ্টি ফুটল ঝাঁটাগুঁফোর চেহারায়। মুখের কাছে ওয়াকিটকি তুলে বলল, 'টিম থ্রী, আর দু'মাইল!'

দু'মিনিটও লাগল না দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে, মাইকেল বরাবরের মত প্রবল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। লোকেশনটা একটা তীক্ষ্ণ বাঁক, পুরো পথের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ, রীতিমত ব্লাইন্ড টার্ন যাকে বলে—দুপাশ থেকে আসা গাড়িগুলো কেউ কাউকে দেখতে পায় না। দীর্ঘদিন থেকে যাওয়া-আসা করতে করতে অভিজ্ঞ হয়ে গেছে মাইকেল, মোড়ে এসে লম্বা করে হর্ন দিল, অপরপ্রান্তে কোনও শব্দ না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো, গতি খুব একটা না কমিয়ে বাঁক নিতে শুরু করল।

ঠিক তক্ষুণি দেখা দিল বিপদ, বাঁকের ওপাশ থেকে মূর্তিমান দানবের মত উদয় হলো আঠারো-চাকার বিশাল এক ট্রাক, পুরো রাস্তা দখল করে ছুটে আসছে ছোট্ট টয়োটাকে লক্ষ্য করে। চিৎকার করে উঠল ডেবি।

মাথা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মাইকেলের, বিপদটাকে চাক্ষুষ করে হতবুদ্ধি হলো না সে, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষটা এড়াল। রাস্তার কিনার ধরে কোনাকুনিভাবে ছুটে গেল ওদের গাড়ি, ঢালের প্রান্তে লাগানো নিচু রেলিঙে সজোরে আঘাত করল টয়োটার ফ্রন্ট-এন্ড, ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল অনেকটা, অর্ধেক পৌঁছে থমকে গেল।

সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় বেঁচে গেছে ওয়ালডেন দম্পতি, তারপরও ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠোকর খেয়ে কপাল কেটে গেছে। এক হাত তুলে গড়াতে থাকা রক্ত মুছল মাইকেল, তাকাল চারপাশে। বিস্মিত হয়ে দেখল, চলে যাচ্ছে ট্রাকটা, দাঁড়াচ্ছে না। ভাবখানা এমন—যেন কিছুই ঘটেনি। ব্যাপারটা কী, ওদের

boiRboi.net

সাহায্য না করে চলে যাচ্ছে কেন? মুহূর্তেই ধরতে পারল কারণটা, তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিল মাইকেল, চোখে পড়ল পাহাড়ের খাড়া ঢাল—কয়েকশো ফুট দীর্ঘ। রেলিং ভেঙে অর্ধেক দৈর্ঘ্য বেরিয়ে গেছে টয়োটার, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে টালমাটাল করছে, পড়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

এবার স্ত্রীর দিকে নজর দিল ও, অচেতনের মত এলিয়ে পড়ে আছে ডেবি। ডাকল, 'ডেবি! ডেবি!! তুমি ঠিক আছ?'

গুঙিয়ে উঠল ডেবি। চোখ খুলে বলল, 'ক...কী...কী ঘটল?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল। 'অ্যাকসিডেন্ট, তবে ইচ্ছাকৃত। ট্রাকটা মোড় ঘোরার আগে হর্ন দেয়নি, তারওপর কীভাবে পুরো রাস্তা আটকে আমাদের দিকে ছুটে এল, দেখোনি? ইচ্ছে করে করেছে, আমাদের পিষে ফেলতে চাইছিল চাকার তলায়।'

'মাই গড! কিন্তু কেন? কে আমাদের মারতে চাইবে?'

শব্দ করল না, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শুধু ঠোঁট নাড়ল মাইকেল।

'না-আ!' আঁতকে উঠল ডেবি। 'ও পাগল হতে পারে, তাই বলে এতটা নয়!'

পিছনে ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে আলোচনাটা আর বাড়াল না মাইকেল। বলল, 'থ্যাংক গড, কেউ সাহায্য করতে এসেছে।' ঘাড় ফেরাতেই কালো ভ্যানটাকে থেমে দাঁড়াতে দেখল ও, যেটা শুরু থেকে ওদের পিছু পিছু আসছে। 'প্লিজ, আমাদের সাহায্য করুন!'

ভ্যান থেকে নেমে এসে রেলিঙের অক্ষত অংশ ধরে ঝুঁকল বাঁটাগুঁফো। জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, 'খুব খারাপ... খুব খারাপ, ড. ওয়ালডেন!'

চমকে উঠল মাইকেল। 'আপনি... আপনি আমার নাম জানেন?'

'শুধু নাম না, অনেককিছুই জানি,' লোকটা হাসল। 'জানি আপনি কেমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান, জানি কত জোরে এই বাঁকটা পেরোন...সেজন্যই তো ভেবেচিন্তে এত আয়োজন করে অ্যাকসিডেন্টের ব্যবস্থা করলাম। রাস্তার দু'মাথায় রোডব্লক দিয়ে পুরো পথটা নির্জন করা, তারওপর টাইমিং মিলিয়ে ট্রাকটাকে বাঁক ঘোরানো... এসব কি কম ঝক্কি-ঝামেলার কাজ? ওটাকে গুঁতো না মেরে আপনি খুব খারাপ কাজ করেছেন। অবশ্য...' দু'পা পিছিয়ে অবস্থাটা ভাল করে দেখল সে। 'এটাও খুব একটা মন্দ নয়। হেড-অন কলিশনের চেয়ে ভালই বলতে হবে। নাহ্, ড. ওয়ালডেন, আপনাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষটা এড়িয়ে বেশ চমৎকার আরেকটা সেটআপ তৈরি করে দিয়েছেন।'

অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মাইকেলের, গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু দরজা বরাবর শূন্যতা থাকায় সেটা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে থেমে গেল। তা ছাড়া নড়লেই টলমল করছে কিনারায় আটকে থাকা বাহনটা, খসে পড়ার পাঁয়তারা করছে।

হতাশ হয়ে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল মাইকেল। জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি? এসব কেন করছেন?'

'অধমের পরিচয় দিয়ে কী করবেন, বলুন? শুধু এটুকু জেনে রাখুন, এ-কাজের জন্য ছয় অঙ্কের পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে আমাকে। এনিওয়ে, আর কোনও কথা নয়। গুড বাই, ড. ওয়ালডেন। টেক কেয়ার।'

নেতার ইশারায় ভ্যান সামনে বাড়াল বিশালদেহী ড্রাইভার, ফ্রন্ট বাম্পার নিয়ে ঠেকাল টয়োটার রিয়ার এন্ডে, ধাক্কা দিতে শুরু

boiRboi.net

করল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়তে শুরু করল ছোট্ট গাড়িটা, এখুনি খসে পড়বে। ভিতরে ডেবি উন্মত্তের মত চিৎকার করছে, জানালা দিয়ে মাইকেল চেঁচাল, 'এ কাজ কোরো না! এ কাজ কোরো না!!'

জবাবে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল ঝাঁটাগুঁফো, ডানহাত তুলে টা-টা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে কিনারা থেকে খসে পড়ল টয়োটা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো বাতাসে ভেসে রয়েছে ওটা, কিন্তু তিনশো ফুট নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়তেই বোঝা গেল, ওটা দৃষ্টিভ্রম ছিল।

নাক সোজা পড়ায় ফ্রন্ট-এণ্ড থেঁতলে গেল গাড়িটার, তারপরই একপাশে আছাড় খেয়ে গড়াতে শুরু করল, প্রতি পাকের সঙ্গে ভেঙেচুরে তুবড়ে যাচ্ছে ওটার ইস্পাতের শরীর। গড়ানো যখন থামল, তখন আর গাড়ি বলে চেনার উপায় নেই বাহনটাকে, স্রেফ একটা লোহার তালে পরিণত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে গেছে, পাথুরে জমির সঙ্গে ঘষা খেয়ে ইস্পাতের ছড়ানো ফুলকির সংস্পর্শে ছোট ছোট আগুন ধরে গেছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রইল ঝাঁটাগুঁফো। হতাশ হতে হলো না তাকে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল উল্টে থাকা গাড়িটাকে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল।

ওয়াকিটকি তুলে সব টিমকে ফেরার নির্দেশ দিল লোকটা। তারপর ভ্যানে উঠে ড্যাশবোর্ডে লাগানো ওয়্যারলেস টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

'গারফিল্ড বলছি।'

'রিপোর্ট করো।' ওপাশ থেকে বলা হলো।

boiRboi.net

'মিশন সাকসেসফুল,' বলল ঝাঁটাগুঁফো গারফিল্ড। 'টার্গেট নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।'

'ভেরি গুড,' সন্তুষ্ট শোনাল অপরপ্রান্তের গলাটা। 'তোমাদের পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লাইন কেটে দিল গারফিল্ড। পোড়া টয়োটা থেকে পাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার দিকে শেষবারের মত তাকাল সে। তারপর ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক।'

দুই

সাম্প্রতিক সময়। ফেব্রুয়ারি ১৩। নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন লোক লুই পামার। পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তার বয়স, তারপরও শরীর দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। এর পিছনে গোপন রহস্যটা হচ্ছে পরিমিত আহার এবং নিয়মিত ব্যায়াম। প্রতি বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কয়েক মাইল করে হাঁটে সে, সেটা রুটিনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে রাতের খাওয়া শেষ করে নির্দিষ্ট একটা রুটে পুরো তিন মাইল সে হাঁটবেই হাঁটবে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সেভেন্টি নাইন্থ স্ট্রীটের দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঠিক সাড়ে সাতটায় নেমেছে সে, চলে এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে, বাড়তি কোনও ক্যালরি যেন শরীরে জমা না থাকে। নিয়মিত রুটের মাঝামাঝি রয়েছে পামার, ঘড়ির

দিকে তাকিয়ে দেখল সাতটা পঞ্চাশ বাজে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে, টাইমিঙে পিছিয়ে পড়েছে।

আটশো তেতাল্লিশ একর আয়তনের সেন্ট্রাল পার্ক এক বিস্ময়কর জায়গা। হঠাৎ দেখায় প্রাকৃতিক মনে হলেও খুব কম লোকই জানে যে, পার্কটা আসলে ফ্রেডারিক অমস্টেড আর কালভার ভস নামে দুই ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্টের ডিজাইন করা এবং সেই অনুসারে কৃত্রিমভাবে গাছগাছালি লাগিয়ে ও জলাশয় খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে। আঠারোশো শতকের মধ্যভাগে গাণিতিক হারে বাড়ছিল নিউ ইয়র্কের জনসংখ্যা, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে গড়ে উঠছিল একের পর এক দালানকোঠা, তাই সিটি কাউন্সিল বিশেষ এক মিটিং ডেকে ইঁটপাথরের শহরের মাঝখানে নিদেনপক্ষে একটা নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক ম্যানহাটনের ঠিক মাঝখানে এই বিশাল পার্কটা তৈরি করা হয়। কৃত্রিমভাবে বানানো হলেও পার্কের পরিবেশটা দারুণ ভাল লাগে পামারের। এখানে এলেই ফুসফুসে বিশুদ্ধ বাতাস পেয়ে মনটা ভাল হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে পার্কের নির্জন একটা অংশের রুট ধরে সকাল-সন্ধ্যা হাঁটছে পামার—এই সময়টা তার একান্ত নিজের, জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা ভুলে প্রকৃতিকে উপভোগ করে সে।

এত বছরে কখনও হাঁটতে বেরিয়ে বিপদে পড়েনি পামার, তাই আজও ফুরফুরে একটা ভাব নিয়ে পা চালাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক আওয়াজ এসেছে কানে, সামনে-পিছনে দু'দিকেই হয়েছে শব্দটা—শুকনো পাতার মড় মড়...যেন খুব কাছেই কেউ পা ফেলছে। চোখ পিটপিট করল সে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না কিছু।

ফস করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল সামনে, সেই আলোয়

কঠিন চেহারার এক যুবককে দেখতে পেল পামার, সিগারেট ধরাচ্ছে তার দিকে ফিরে। দু'পা ফাঁক করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে হাঁটার পথটা রুদ্ধ হয়ে যায়।

অবচেতন মনে সতর্ক হবার তাগিদ অনুভব করল পামার, হঠাৎ আজ ভয় করছে তার। গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'এক্সকিউজ মি, মিস্টার। তুমি আমার পথ আগলে রেখেছ। সরো, যেতে দাও।'

সিগারেটে জোরে এক টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল যুবক। বলল, 'আপনি কোথাও যাচ্ছেন না, মি. পামার।'

'মানে! কে তুমি? আমার নাম জানলে কী করে?'

'জানাটাই আমাদের কাজ।'

'আমাদের! কারা...' কথা শেষ করতে পারল না পামার। পিছনে খসখস শব্দ হলো, পরমুহূর্তে দুপাশ থেকে দু'জোড়া হাত শক্ত করে চেপে ধরল তার বাহু। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল পামার, লাভ হলো না। প্রতিপক্ষ যে শুধু সংখ্যায় বেশি, তা-ই নয়; তাদের গায়েও প্রচণ্ড জোর।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সামনে এগিয়ে এল প্রথম যুবক। এবার সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল পামার, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে তোমরা? কী চাও? টাকা লাগলে আমার পকেটে ওয়ালেট আছে, ওটা নিয়ে আমাকে রেহাই...'

'টাকা চাই না আমরা,' বলে বন্দির নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ল যুবক। নীরস কণ্ঠে বলল, 'চাই আপনার প্রাণপাখিটা।'

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে যাওয়ায় কাশছিল পামার, কথাটা শুনে থমকে গেল। বলে কী এই লোক! প্রাণপাখি চায় মানেটা কী! বিস্মিত অবস্থাতেই যুবককে নড়ে উঠতে দেখল সে, পরমুহূর্তে নাভীর নীচে খচ্ করে বিঁধল কী যেন, হ্যাঁচকা টানে নাভীর দু-ইঞ্চি

boiboi.net

উপরে উঠে এল জিনিসটা। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁচকে যেতে চাইল ওর শরীর। এবার পিছিয়ে গেল যুবক, পেটে ঢোকানো জিনিসটা বের করে নিয়েছে একইসঙ্গে। ব্যথাটা কমেনি একবিন্দু, পেট থেকে উষ্ণ একটা স্রোত বের হচ্ছে, টের পেল পামার। অকস্মাৎ বুঝল কী ঘটেছে—ছুরি মারা হয়েছে তাকে! কেন!

পামারকে ছেড়ে দিল আততায়ীর দুই সঙ্গী, মাটিতে পড়ে গেল সে, একহাতে তলপেট চেপে ধরে রক্তক্ষরণ থামানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু লাভ হলো না তাতে। অবিরাম বেরুচ্ছে রক্ত, প্রতি বিন্দুর সঙ্গে নিংড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে জীবনীশক্তি। চেঁচাল না পামার, জানে—তাতে লাভ নেই। পার্কের এই অংশে এই সময় কোনও মানুষ থাকে না। লোকগুলোও জানে তা, সেজন্যই এখানে অপেক্ষা করছিল। পুরোপুরি প্রফেশনাল এরা, ছুরি মেরে পালিয়ে যায়নি, তিনদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, শিকারের মৃত্যু নিশ্চিত না করে নড়বে না।

সাধারণ একটা ছুরিকাঘাতে সঙ্গে সঙ্গে মরে না মানুষ, কয়েক ঘণ্টা টিকতে পারে। তবে পামারের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটল। নিখুঁত দক্ষতায় স্পর্শকাতর একটা জায়গায় ছুরি মেরেছে অভিজ্ঞ খুনী, মাত্র দশ মিনিটেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল স্বাস্থ্যবান মানুষটার। এই সময়টুকু নরকযন্ত্রণায় কাটল তার, শেষ দিকে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। কাতরাতে কাতরাতে অবিশ্বাসের চোখে নিজের হত্যাকারীর দিকে তাকিয়ে রইল সে, নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকে চলেছে যুবক, সঙ্গীদেরও অফার করল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল পামার।

নিস্পন্দ শরীরটাকে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে নিশ্চিত হয়ে নিল প্রথম যুবক। সঙ্গীদের বলল, 'টাকা-পয়সা, ঘড়ি,

চেইন... সব নিয়ে নাও। ব্যাপারটা ডাকাতির মত দেখাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই সঙ্গী। খানিক পরেই তিনজনের দলটা মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

লুই পামারের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো পরদিন সকালে। পুলিশ এল, তদন্ত হলো, কিন্তু তেমন কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মাদকাসক্ত কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের করা ছিনতাই ও খুন হিসেবে লেখা হলো রিপোর্ট। নিউ ইয়র্কের কয়েক হাজার অমীমাংসিত কেসের একটা হয়ে ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে রইল লুই পামারের হত্যাকাণ্ড।

ফেব্রুয়ারি ২৭। বেলফাস্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড।

লুই পামারের ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ কুর্ট মাসডেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর নেই তার। মদ, মাদক আর মেয়েমানুষ—এগুলো তার জীবনযাত্রার একেবারে অবিচ্ছেদ্য অংশ। খাওয়াদাওয়ার বেলায়ও কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা মানে না। প্রলম্বিত আয়ুর প্রতি তেমন লোভ নেই তার, বরং যে ক'টা দিন বাঁচবে; আনন্দ, ফুর্তি আর নিয়মভাঙা জীবনযাপন করতে চায় সে। সৌভাগ্যই বলতে হবে—বিশাল একটা সফটওয়্যার কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ হওয়ায় টাকাপয়সার কোনও অভাব নেই তার, জীবনের প্রতিটা সাধ-আহ্লাদ ইচ্ছেমত মিটিয়ে নিতে পারছে।

কিন্তু এই প্রবল অত্যাচার আর অনিয়ম তার শরীর মেনে নিতে পারেনি। দিনে দিনে গোলাকার হয়ে উঠেছে সেটা—মেদ জমেছে, ভুঁড়ি বেড়েছে, একই সঙ্গে জায়গা করে দিয়েছে রোগব্যাধিকে। ফলে পঞ্চাশ পেরুনোর আগেই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে। গত এক বছরে

boiRboi.net

দু'দফা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার, এখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঝুলছে।

এই মুহূর্তে বেলফাস্টের নামকরা একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে মাসডেন, দ্বিতীয় দফা হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় তিনদিন আগে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়েছে। এ ক'দিন ইনটেনসিভ কেয়ারে ছিল, আজ সকালেই সাধারণ কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে তাকে।

রাত তিনটে দশ। হাসপাতালে কবরের নিস্তব্ধতা, ডিউটিরত স্টাফরাও যার যার স্টেশনে বসে ঘুমে ঢুলছে। ইমার্জেন্সি ইউনিট ছাড়া আর কোথাও কোনও ব্যস্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে না।

পাঁচতলার এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ডাক্তারের পোশাক পরা এক লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে—গলায় স্টেথোস্কোপ লাগানো, অ্যাপ্রনের পকেট থেকে ঝুলছে একটা আই.ডি. কার্ড। রিসেপশনে বসে থাকা নার্সের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যসূচক একটু হাসল সে, হাতের ক্লিপবোর্ড দেখিয়ে বোঝাল—রাউন্ডে এসেছে। নার্সও একগাল হেসে তাকে যেতে বলল। ডাক্তারকে চিনতে পারছে না বটে, তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। এই হাসপাতালে প্রশিক্ষণ দেয়া বা নেয়ার জন্য প্রায়ই বহিরাগত ডাক্তার আসে, আর রাতের এই জঘন্যতম শিফটটা গ্রহিতাদের ঘাড়েই গছানো হয়। এ-ও তেমন কেউ হবে নিশ্চয়। আবার নিজের কাজে মন দিল নার্স।

কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে, তাই রাউন্ড নেয়ার ভঙ্গিতে পরপর তিনটে কেবিনে ঢুকল বহিরাগত ডাক্তার। শেষে করিডরে বেরিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল, কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না। তারপর দ্রুত ঢুকে পড়ল কুর্ট মাসডেনের কেবিনে।

বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে মাসডেন, নিঃশ্বাসের তালে তালে

boiRboi.net

ওঠানামা করছে মস্ত ভুঁড়িটা। মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো তার, বিছানার পাশে স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো স্যালাইন ব্যাগ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় তরল বয়ে চলেছে সরু পাইপ ধরে, সরাসরি শিরায় ঢুকছে বাঁ হাতে লাগানো সুঁই দিয়ে। মাথার কাছে মেঝেতে চাকা লাগানো একটা বড় কার্ডিয়োগ্রাফির যন্ত্র আছে—রোগীর বুকে তার দিয়ে লাগানো প্যাডের সাহায্যে হৃৎস্পন্দন মনিটর করছে, যন্ত্রটার আট ইঞ্চি স্ক্রিনে সবুজ একটা রেখা হয়ে ফুটে উঠেছে তা।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করল ডাক্তার, তারপর পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনল একটা খালি সিরিঞ্জ। চোখের সামনে তুলে সেটাতে বাতাস ভরল সে, এগিয়ে গিয়ে স্যালাইনের লাইনে সুঁইটা ঢোকাল, ধীরে ধীরে পুশ করে বাতাসটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। প্রবাহমান তরলের মাঝখানে বড় একটা বুদ্বুদের মত দেখাল সেটাকে, আস্তে আস্তে নীচে নেমে যাচ্ছে। নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বাতাসটুকুকে মাসডেনের শিরায় ঢুকতে দেখল আততায়ী লোকটা, একই সঙ্গে কার্ডিয়োগ্রাফ থেকে খুলে নিল একটা তার।

বাতাসের বুদ্বুদটা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছুতেই চোখ মেলে তাকাল মাসডেন, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় তার শরীরটা কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। তৃতীয় দফা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বেচারার, এ অবস্থায় নার্সদের স্টেশনে তারস্বরে বেজে ওঠার কথা অ্যালার্ম, দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে আসার কথা কর্তব্যরত চিকিৎসক আর সেবিকাদের, কিন্তু কার্ডিয়োগ্রাফ থেকে বিশেষ তারটা খুলে ফেলায় সেসবের কিছুই ঘটল না। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল, কাঁপতে থাকল শরীর; একসময় থেমে গেল সব—মারা গেল মাসডেন।

তাড়াহুড়ো করল না খুনী। শান্তভাবে কেবিন থেকে নিজের

boiRboi.net

উপস্থিতির সমস্ত প্রমাণ আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলল। তারপর কার্ডিয়োগ্রাফের তারটা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

এতক্ষণে বাজতে শুরু করল অ্যালার্ম। পাগলের মত ছুটে এল কর্তব্যরত ডাক্তার আর নার্সেরা। রোগীর জীবন বাঁচাতে তাদের অবিরাম প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হলো, কারণ মরা মানুষ তো আর জীবন ফিরে পায় না।

মার্চ ১০। ক্রাইস্টচার্চ, ইংল্যাণ্ড।

সাগরপারের চমৎকার একটা ভিলায় থাকে হার্বার্ট গ্র্যান্ট। দশ বছর আগে একটা সফটওয়্যার তৈরি করার পর তার জীবনটাই রাতারাতি বদলে গেছে; সারা বিশ্বের বড় বড় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই ব্যবহার হচ্ছে সেটা। বুদ্ধি করে সফটওয়্যারটার স্বত্ব নিজের কাছে রেখে দিয়েছে সে, প্রতিবার ওটা বিক্রির একটা লভ্যাংশ পাচ্ছে এ কারণে। সেই থেকে বলতে গেলে আর কোনও কাজ করেনি গ্র্যান্ট, হাতে আসা অঢেল টাকা দিয়ে সাগরপারের ভিলাটা কিনেছে, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আরাম-আয়েশের জীবন কাটাচ্ছে।

গ্যারাজে চারটে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি রয়েছে তার, প্রাইভেট জেটিতে বাঁধা আছে দুটো ইয়ট। তবে সবকিছুর চেয়ে তার প্রিয় বাহন হচ্ছে দশ মিটার লম্বা ধবধবে সাদা রঙের সেইলিং বোটটা। ইঞ্জিন আর প্রপেলার লাগানো ইয়টের চেয়ে সুনীল সাগরে পাল তুলে ভেসে বেড়াতেই সে বেশি পছন্দ করে।

প্রতি রোববার সকালে বোটটা নিয়ে সেইলিঙে বেরুনো তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আবহাওয়া খারাপ না হলে সাধারণত এর ব্যত্যয় ঘটে না। আজ তেমনই এক রোববার—আকাশ পরিষ্কার, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। স্ত্রী-সন্তানকে না জাগিয়ে বরাবরের মত খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছে গ্র্যান্ট।

boiRboi.net

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তীর থেকে পাঁচ মাইল দূরে চলে এল বোট। বাতাস বেড়েছে, সেইল ফুলে উঠেছে তাতে, তরতর করে পানি কেটে ছুটে চলেছে ফাইবারগ্লাসে তৈরি নৌকাটা, নাক-মুখে ঝাপটা মারছে সমুদ্রের নোনা বাতাস। আহ্, কী শান্তি! প্রফুল্ল মনে চারপাশে তাকাল গ্র্যান্ট। সোনালি রঙের একটা ইয়ট নজর কাড়ল তার, পোর্ট সাইডে একশো গজ দূরে ভাসছে। শুরু থেকেই জলযানটাকে দেখতে পাচ্ছে সে, সারাক্ষণ ওর বোটের কাছাকাছি থাকছে। অনুসরণ করছে না তো!

পরক্ষণেই আপনমনে হেসে উঠল গ্র্যান্ট। কী সব আবোল-তাবোল ভাবছে! তাকে আবার অনুসরণ করবে কে? আর যদি করতেই হয়, সাগরে কেন? নাহ্, ওসব কিছু না। হয়তো ওর দক্ষ সেইলিঙে মুগ্ধ হয়েছে ইয়টের লোকজন, তাই কাছাকাছি থাকছে। ডেকের উপর বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে একটা লোক এদিকেই তাকিয়ে আছে দেখে ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হলো। অচেনা দর্শকের দিকে ফিরে হাত নাড়ল সে, মুখে হাসি ফোটাল।

রোদের মধ্যে অনেকটা সময় কাটানোয় গলা শুকিয়ে গেছে। হ্যাচ খুলে আন্ডারওয়াটার কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা বিয়ারের ক্যান বের করল গ্র্যান্ট। এটা তার পার্মানেন্ট স্টক, সবসময় বোটেই থাকে বেশ কিছু পানীয়ের ক্যান।

মুখ খুলে চুমুক দিল গ্র্যান্ট, কয়েক দফায় ঢকঢক করে গিলে খালি করে ফেলল অর্ধেক ক্যান। তাকাল দিগন্তের দিকে। হঠাৎই দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এল তার, মাথাও ধরেছে, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না ঠিকমত—ব্যাপার কী? বেচারার জানা নেই, ভোর রাতে তার বোটে উঠেছিল বাইরের কেউ; ইঞ্জেকশনের সুঁই দিয়ে ফুটো করে সবগুলো ক্যানে মিশিয়ে দিয়েছে রাসায়নিক দ্রবণ। কেন কী ঘটছে

boighar.net

বোঝার সময় পেল না গ্র্যান্ট, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল বোটের মেঝেতে।

দৃশ্যটা দূরবীনে দেখতে পেয়ে ইয়টের চালককে হাত দিয়ে ইশারা করল ডেকে দাঁড়ানো কঠিন চেহারার যুবক। গর্জে উঠল শক্তিশালী প্রপেলার, গতি বাড়িয়ে সেইলিং বোটের পাশে গিয়ে থামল। ইতোমধ্যে ভিতর থেকে আরও দুজন বেরিয়ে এসেছে ডেকে, নাগালের মধ্যে আসতেই লাফ দিয়ে বোটে নামল তারা, হার্বার্ট গ্র্যান্টের অচেতন দেহ তুলে নিল। প্রথমে বোটের কিনারায় ঠুকে শিকারের কপালে কালসিটে ফেলল তারা, তারপর অজ্ঞান দেহটা ফেলে দিল সাগরের পানিতে। আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পেল না গ্র্যান্ট, বুদ্বুদ তুলে তলিয়ে গেল অতলে।

দক্ষতার সঙ্গে কাজ সারল খুনীর দল, বোট ছেড়ে উঠে আসার আগে বদলে ফেলল সমস্ত মাদক মেশানো বিয়ারের ক্যান, কম্পার্টমেন্টে রেখে এল মাদকবিহীন নতুন এক লট। এরপর তারা হারিয়ে গেল ইয়ট নিয়ে।

সেদিনই সন্ধ্যায় কোস্টগার্ডের তল্লাশিদল খুঁজে পেল পরিত্যক্ত সেইলিং বোটটা। গ্র্যান্টের পচা, ফুলে-ফেঁপে ওঠা লাশটা পাওয়া গেল আরও দু'দিন পর। ময়নাতদন্ত হলো, কিন্তু লাশের শরীরে কোনও মাদক পাওয়া গেল না। নিজস্ব রাসায়নিক গুণের কারণে ওটা মানবদেহে ঢোকার কয়েক ঘণ্টা পর মিলিয়ে যায়; ঘটেছেও তা-ই। লাশের কপালে আঘাতের দাগ দেখে মৃত্যুর কারণটার ভুল ব্যাখ্যা করল ডাক্তার। ধারণা করা হলো, সেইলিঙের সময় ভেজা ডেকে পা পিছলে মাথায় আঘাত পায় গ্র্যান্ট, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় পানিতে।

এটা যে একটা খুনের ঘটনা, তা কেউ আর জানতে পারল না।

boiRboi.net

মার্চ ২৬। বার্মিংহ্যাম, ইংল্যাণ্ড।

রাত করে বাড়ি ফেরে ট্রিসিয়া মিলনার। না, আমোদ-ফুর্তি করে নয়... সাতচল্লিশ বছর বয়সে কেউ ক্লাব বা ডিসকোতে আমোদ-ফুর্তি করতে যায় না, ওটা ছেলে-ছোকরাদের কাজ। ট্রিসিয়ার সময় কাটে অফিসে। পাঁচ বছর আগে ব্যাভিচারী স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাবার পর সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে সে। কপাল ভাল যে, সন্তান-সন্ততি হয়নি তার, পিছুটান নেই সেজন্য। স্বামীর স্বরূপ দেখার পর থেকে গোটা পুরুষজাতির উপর ঘেন্না ধরে গেছে ট্রিসিয়ার, নতুন করে সঙ্গী খোঁজার রুচি হয়নি। একাকী জীবনটাকে নিজের পেশায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়েছে।

প্রায় প্রতিদিনই রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত অফিসে কাটায় ট্রিসিয়া, মাঝে মাঝে তো আরও বেশি। আজ বেজেছে সাড়ে দশটা। এগারোটায় বাড়ি পৌঁছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাতের জিনিসপত্র সামনের ঘরে নামিয়ে রাখল সে, বেডরুমে ঢুকে কাপড় ছাড়ল, তারপর শাওয়ারে ভিজে শরীরটা ঝরঝরে করে নিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলে তোয়ালে জড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে অভ্যাসমত কিচেনের দিকে রওনা হলো ট্রিসিয়া। অন্যদের মত সন্ধ্যায় সাপার করে না সে, বাড়ি ফিরে তারপর খায়। সারাদিন তো কেনা খাবারই খেতে হয়, তাই রাতের বেলা বাড়ি ফিরে নিজ হাতে রান্না করে, যাতে অন্তত একটা বেলা ঘরে বানানো খাবারের স্বাদ পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ থেকেই মৃদু একটা গন্ধ পাচ্ছিল, কিচেনের দরজা খুলতেই সেটা তীব্র হয়ে ঝাপটা মারল নাকে। ফুসফুসে ঢুকতেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ট্রিসিয়ার, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কেন

গন্ধটা এত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। গ্যাস... গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে রান্নাঘরের ভিতর, এবং সেটা বেশ প্রচণ্ড আকারে। ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল, ভেবে পেল না সে। স্পষ্ট মনে আছে, সকালে অফিসে যাবার আগে নিজ হাতে বার্নারের চাবি বন্ধ করে গেছে। তা হলে কী... লাইনে লিক করেছে? কত বড় লিক যে এভাবে গ্যাস ছড়াচ্ছে? এই তো, এখনও গ্যাস বেরুনোর শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দেখতে হয় ব্যাপারটা—ভেবে দরজার পাশের সুইচে চাপ দিল ট্রিসিয়া, আলো জ্বালবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দুর্ঘটনা।

বালবের ভিতর যে কারসাজি করে রাখা হয়েছে, তা জানা ছিল না হতভাগ্য মহিলার। সুইচে চাপ দিতেই বিকট শব্দে ফেটে গেল সেটা, ফুলকি ছড়াল। আগুন ধরাতে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল, প্রচণ্ড শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। কিচেনের জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল, সেই ফোকর দিয়ে এমনভাবে কমলা রঙের ধারা বেরুল, যেন মহাশূন্যের পথে রওনা হওয়া রকেটের একজস্ট দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

ট্রিসিয়া মিলনার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল না। শরীরের বেশিরভাগটাই পুড়ে গেছে তার, ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে সারা গা থেকে। মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র... এই অবস্থাতেই মুমূর্ষু শরীরটাকে হামাগুড়ি দিয়ে সে টেনে নিয়ে গেল কিচেনের পাশের স্টাডিরুমে, সেখানে একটা টেলিফোন আছে। শরীরের সর্বশক্তি একত্র করে টেবিল ধরে ওঠার চেষ্টা করল সে, কিন্তু নাক পর্যন্ত তুলতে পারল শুধু। টেলিফোন পর্যন্ত পৌঁছুল না হাত, অসহায়ের মত খামচাল কিছু ধরে রাখার চেষ্টায়। টেলিফোন সেটের ঠিক পাশে বসানো কম্পিউটারের কীবোর্ড আর মাউস রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল—ট্রিসিয়ার অন্তিম প্রয়াসের চিহ্ন হয়ে

রইল তা। একটু পরেই হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল কাজপাগল মহিলা।

অবশ্য এতকিছু চাক্ষুষ করল না বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে গাড়িতে বসে অপেক্ষারত তিন খুনী। শুধু বিস্ফোরণটা দেখেই মুখে হাসি ফুটল তাদের, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। জানে, এই মৃত্যুটাকেও দুর্ঘটনা হিসেবেই আখ্যা দেয়া হবে। ভুলে চুলার গ্যাস ছেড়ে রাখা আর শর্ট সার্কিটে তাতে আগুন ধরে যাওয়া নতুন কিছু নয়। হাসিমুখে গাড়ি স্টার্ট দিল তারা; চলে গেল ঘটনাস্থল থেকে।

এপ্রিল ০৮। গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালা, স্কটল্যাণ্ড।

শৌখিন পর্বতারোহী হিসেবে নামডাক আছে ভ্যাল মর্টিমারের। ফ্রী ক্লাইম্বার—মানে কোনওরকম যন্ত্রপাতি বা সিকিউরিটি গিয়ার ছাড়া যারা পাহাড়ে চড়ে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত দক্ষতা রয়েছে তার। অবশ্য এই দক্ষতা একদিনে আসেনি, বছরের পর বছর একাগ্র চেষ্টা আর পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দক্ষতাটা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যাতে চাইলেই ক্লাইম্বিংকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারত মর্টিমার। কিন্তু নেয়নি, এটা তার জন্য স্রেফ একটা শখ...অবসর কাটানোর উপায়। মূলত সে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বহুজাতিক একটা আই.টি. কোম্পানির বড়সড় পদে আছে। বলে রাখা ভাল, পাহাড়ে চড়ার চেয়ে পেশাটাকে সে কয়েকগুণ বেশি ভালবাসে।

তারপরও সুযোগ পেলেই বিপজ্জনক শখটা নিয়ে মেতে ওঠে মর্টিমার, তার স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবের হাজার বারণ মানে না। এ এক অদম্য নেশার মত, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়কে জয় করে অন্যরকম আনন্দ পায় সে। যেখানে আর মাত্র দ'বছর পর জীবনের অর্ধশতক পার

boierboi.net

করতে যাচ্ছে, সেখানে এ ধরনের কাজ যে মোটেই উচিত নয়—সেটা বুঝেও বোঝে না। হাজার হোক, মানবশরীর তো, বয়সের সঙ্গে যুদ্ধে সেটাকে হারতেই হবে। কিন্তু যতদিন সম্ভব, শরীরটাকে যেমন খুশি ব্যবহারের স্বাধীনতা হারিয়ে যেতে দিতে চায় না সে, ছুটির দিনগুলোয় নিত্যনতুন পাহাড় জয়ের মাধ্যমে থামিয়ে রাখতে চায় সময়কে।

গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালার ঈগলস্ ক্লিফের চারশো ফুট খাড়া দেয়াল বেয়ে চূড়ায় যখন পৌঁছুল মর্টিমার, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। চূড়ার সমতল এক টুকরো জমিতে বসে হাঁপাতে লাগল সে, কোমরে ঝোলানো পানির বোতলটা তুলে একটা চুমুক দিল। ঠিক তক্ষুণি কানে ভেসে এল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

কপালে হাত তুলে চোখদুটোকে রোদ থেকে আড়াল করল মর্টিমার, তাকাল আকাশে। মার্কিংবিহীন একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে এদিকেই। তাকে বিস্মিত করে মালভূমির উপরে এসে থামল ওটা, ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। বাতাসের ধাক্কায় চোখ ছোট করে ফেলতে হলো মর্টিমারকে। উড়ন্ত ধুলোবালি প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে শরীরে, নিজের অজান্তেই পিছন ফিরে একটু কুঁজো হয়ে গেল সে।

ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার, ইঞ্জিন বন্ধ না করেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল পাইলট, তার পিছু পিছু আরও দুজন। লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে তিনজন, দেখে অবাক হলো মর্টিমার। কারা এরা? কী চায়?

'মি. মর্টিমার?' কাছাকাছি এসে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল পাইলট—কঠিন চেহারার এক যুবক সে।

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

চোখের সামনে বামহাতের কবজি তুলল যুবক, ঘড়ি দেখে

boiRboi.net

বলল, 'আপনার দেরি হয়েছে। ভেবেছিলাম আরও দশ মিনিট আগে পৌঁছুবেন চূড়ায়... আপনার রেকর্ড অন্তত তা-ই বলে।'

বিভ্রান্ত বোধ করল মর্টিমার, লোকটা এসব কী বলছে? সে জানতে চাইল, 'আমার যে দেরি হয়েছে, তা বুঝলেন কীভাবে? কখন ক্লাইম্বিং শুরু করেছি, তা জানেন?'

'জানি,' হাসল যুবক। 'আপনার গত পাঁচটা ক্লাইম্বের প্রতিটাই মনিটর করা হয়েছে।'

'মনিটর করা হয়েছে?' মর্টিমার বুঝতে পারছে না। 'কেন?'

'যাতে আপনার জন্য নিখুঁতভাবে ফাঁদ পাতা যায়,' যুবকের মুখের হাসি বিস্তৃত হলো।

'এসব কী বলছেন আপনি!' মর্টিমার রেগে গেল। 'কীসের ফাঁদ?'

'এখুনি টের পাবেন।' বলে সঙ্গীদের ইশারা করল যুবক। তারা এগিয়ে গিয়ে হতভম্ব হয়ে থাকা মর্টিমারকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল, নিয়ে গেল ক্লিফের কিনারায়।

এইবার ভয় পেল প্রৌঢ় পর্বতারোহী, কাঁপা গলায় বলল, 'কী হচ্ছে এসব? হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুয়িং?'

'দুর্ভাগা ফ্রী-ক্লাইম্বারদের কপালে যেটা ঘটে,' জবাব দেয়ার সুরে বলল যুবক। 'সেফটি লাইন না থাকার কুফল বলতে পারেন... নীচে পড়ে ছাতু হতে হয় ওদের।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মর্টিমারের। 'কে তোমরা? কেন এ-কাজ করছ?'

'আমরা আজরাইলের দূত। আপনার সময় ফুরিয়ে এসেছে তো, তাই জান কবচ করতে এসেছি।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল যুবক। 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। এমন বিপজ্জনক একটা শখ বেছে নিয়েছেন, তারওপর একা একা

boiRboi.net

এসেছেন পাহাড়ে চড়তে—ওফ্! আমাদের কাজটা বড্ড সহজ করে দিয়েছেন আপনি।'

'এ-কাজ কোরো না,' অনুনয় করল মর্টিমার। 'প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দাও!'

'উঁহুঁ, সেটি হবার নয়,' মাথা নাড়ল যুবক। 'এনিওয়ে, এবার বিদায় জানাতেই হয়। গুড বাই, মি. মর্টিমার। মনে রাখবেন, ইটস্ নাথিং পার্সোনাল। হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট!'

দোলনার মত একটা দোল দিয়ে মর্টিমারকে ক্লিফ থেকে ছুঁড়ে দিল খুনীরা। বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল হতভাগ্য মানুষটার, হাত-পা ছুঁড়ে বাতাস খামচে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল, পতন থামাতে পারল না। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে দেহটাকে প্রবল বেগে পড়ে যেতে দেখল খুনীরা, চারশো ফুট নীচে যখন 'থপ' করে আছড়ে পড়ল, এত উপর থেকেও শোনা গেল শব্দটা।

কাজ শেষ করে হেলিকপ্টারে গিয়ে উঠল তিন খুনী, টেকঅফ করে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

এপ্রিল ১৯। লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড।

আগে যে পাঁচজনের কথা বলা হয়েছে, তাদের সবার চেয়ে ব্যতিক্রম ডুইট গার্ডনার। একমাত্র মিলটা বয়সের দিক থেকে, নইলে বাকি সবকিছুই তার আলাদা। ছোটখাট মানুষ সে, চোখে ইয়া বড় এক চশমা পরে, ঘরকুনো স্বভাবের। শখ বলতে কিছুই নেই, বিপজ্জনক কোনও কাজ করে না—খুবই ভীতু টাইপের লোক, একা একা কোথাও যায় না। ইন্টারনেটভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সে, অফিস আর বাসাই হচ্ছে তার যাওয়া-আসার একমাত্র গন্তব্য। ছুটির দিনেও ঘরে বসে থাকে, বউ-ছেলেমেয়ের সঙ্গে সময় কাটায়।

টানা সাতদিন সার্ভেইলান্স চালিয়ে হতাশ বোধ করল তিন খুনী, দুর্ঘটনা ঘটাবার মত কোনও সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। হাল ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে, উপায়ান্তর না দেখে দলনেতা ঝুঁকিপূর্ণ একটা প্ল্যান ঠিক করল। এ ধরনের পদ্ধতি সাধারণত শেষ চেষ্টা হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, অবস্থাটা সেরকমই হয়ে পড়েছে।

অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে একা গাড়ি চালায় না গার্ডনার, পাবলিক বাসে যাতায়াত করে। এর ফলে মাত্র দুই মিনিটের জন্য উন্মুক্ত থাকে সে, যখন বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। ওই সময়টুকুই বেছে নিল খুনীরা, সবার সামনে তাকে মেরে ফেলার জন্য।

ঘটনাটার দিন নিজের বাড়ির দশ গজ দূরে মারা গেল গার্ডনার, আশপাশের বাড়িঘর আর ফুটপাথে চলতে থাকা পথচারীরা সবিস্ময়ে বেচারাকে গাড়িচাপা পড়তে দেখল। রাস্তা পার হচ্ছিল তখন গার্ডনার, আচমকা কোনও রকম জানান না দিয়ে উদয় হলো একটা উদ্দাম প্রাইভেট কার, সোজা লোকটাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেল।

যথারীতি পুলিশ এল, তদন্ত হলো, কিন্তু ঘাতক গাড়িটার কোনও হদিস পাওয়া গেল না। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বেশ কয়েকদিন মাথা ঘামাল কেসটা নিয়ে। তবে গোবেচারা গার্ডনারের কোনও শত্রু না থাকায় এবং খুনটার পিছনে কোনও জোরালো মোটিভ পাওয়া না যাওয়ায় ব্যর্থ হলো তারা। শেষে কাণ্ডটা কোনও বেপরোয়া মাতাল ড্রাইভার ঘটিয়েছে ভেবে হাল ছেড়ে দিল পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত পুলিশ বিভাগ।

boiRboi.net

ছ'টা খুন—ঘটেছে ছয় জায়গায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ছ'রকমভাবে।

এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাওয়া না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মৃত্যুগুলোর তদন্তে যারা জড়িত ছিল, তাদের আরও গভীরে যাওয়া উচিত ছিল, তা হলে হয়তো প্রয়োজনীয় ক্লু পেয়ে যেত তারা। ফাঁস করতে পারত জটিল এক ষড়যন্ত্রের জাল, যেটা আগামী কিছুদিনের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য পাতা হয়েছে।

তিন

পহেলা মে। স্যান বার্নাডিনো কাউন্টি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

গোল্ডস্টোন অবজারভেটরি নামে পরিচিত নাসার গোল্ডস্টোন ডিপ স্পেস কমিউনিকেশন কমপ্লেক্স, অর্থাৎ, *জি.ডি.এস.সি.সি*-র অবস্থান মোহাভি মরুভূমির ঠিক মাঝখানটায়। কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কয়েক সারিতে মোট সত্তরটা বিশাল ডিশ অ্যান্টেনা রয়েছে এখানে, ওগুলোর সাহায্যে মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন প্রোব ও স্যাটেলাইটের পাঠানো তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বস্তুত অবজারভেটরিটা নাসার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে। এমন আরও দুটো অবজারভেটরি রয়েছে নাসার—একটা স্পেনের মাদ্রিদে, অন্যটা অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায়। গোলাকার পৃথিবীর পুরো কার্ভেচার কাভার করার জন্য ঠিক একশো বিশ ডিগ্রি তফাতে স্থাপন করা হয়েছে এই তিনটে অবজারভেটরি।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবরে স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর

পেরিয়ে গেছে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়, আর এর মাঝে মনুষ্যনির্মিত হাজারো কৃত্রিম উপগ্রহে ভরে গেছে পৃথিবী নামের আমাদের সুনীল গ্রহটার চারপাশের মহাশূন্য। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে অসংখ্য প্রোব, ওগুলো আমাদের গ্রহের বাড়তি চোখ হিসেবে কাজ করে। সূর্য, মঙ্গল বা শনি গ্রহ পর্যন্ত রয়েছে এসব প্রোব—দৈনিক ভিত্তিতে নিজ নিজ লক্ষ্যকে মনিটর করে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে ওগুলো। এছাড়াও রয়েছে ইন্টারস্টেলার প্রোব, সৌর-জগতের সীমানা পেরিয়ে এখন অসীমের পথে ছুটছে।

গোল্ডস্টোন অবজারভেটরির বিশালায়তন অপারেশন্স সেন্টারে বসে এমনই একটা প্রোবের রিপোর্ট রিসিভ করছে ডোনাল্ড সালিভান। একচল্লিশ বছর বয়স তার, আজ পাঁচ বছর হলো এখানে কাজ করছে। এই দীর্ঘ সময়ে তেমন সাড়াজাগানো কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি সে, তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। *ভয়েজার-টু* প্রোবের রিপোর্ট এবং সঙ্গে আসা একটা ট্রান্সমিশন তার ভুরু কুঁচকে দিয়েছে। স্ক্রিনে ফুটে ওঠা আঁকাবাঁকা রেখাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

১৯৭৭ সালের অগাস্টে লঞ্চ করা হয়েছিল *ভয়েজার-টু*-কে। চল্লিশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে যাবার পরও সেটা আজও কার্যক্ষম। এই লম্বা সময়ে কয়েক কোটি মাইল পাড়ি দিয়েছে ওটা, সৌরজগতের সীমানা পেরিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। যে উদ্দেশ্যে ওটাকে পাঠানো হয়েছিল, তা কি সফল হতে যাচ্ছে তবে? কান থেকে হেডফোন নামিয়ে রাখল সালিভান, বুক ধক ধক করছে। আনমনে মাথা নাড়ল সে, পাশ থেকে তুলে নিল ইন্টারকমের রিসিভার, কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল।

দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে সাড়া দিল জন কেলভিন অবজারভেটরির অপারেশনাল ডিরেক্টর। 'হ্যালো?'

'সালিভান বলছি, স্যর।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটেছে, স্যর। ভয়েজার-টু'র ট্রান্সমিশন রিসিভ করেছি আমি। ওটায়...কিছু একটা আছে!'

'কী আছে?'

মাথা নাড়ল সুলিভান। 'বলে বোঝাতে পারব না, স্যর। ইউ হ্যাভ টু সি ফর ইয়োরসেলফ...'

দোসরা মে। লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র।

মেক্সিকো হয়ে দু'দিন আগে আমেরিকা পৌঁছেছে মাসুদ রানা, ওখানে ছোট্ট একটা রুটিন মিশন শেষ করে এসেছে। প্রথমে গিয়েছিল ওয়াশিংটনে, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কর্ণধার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে দেখতে। ভদ্রলোক বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বাংলাদেশের একজন সত্যিকার শুভানুধ্যায়ী—রানাকেও অসম্ভব স্নেহ করেন। হঠাৎ করেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাঁর। বয়স নিতান্ত কম হয়নি অ্যাডমিরালের, হৃৎযন্ত্র আচমকা গড়বড় করলে সেটাকে দোষ দেয়া যায় না। তারপরও অস্থির হয়ে উঠেছিল ও, যত দ্রুত সম্ভব ছুটে গেছে তাঁকে দেখতে। এখন অবশ্য বিপদমুক্ত হয়েছেন হ্যামিলটন, ডাক্তাররা তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখে সেরা চিকিৎসাটাই দিচ্ছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হতেই লস অ্যাঞ্জেলেসের ফ্লাইট ধরেছে রানা, হাতের কাজ সারার জন্য।

গত কয়েক মাস একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত থাকায় রানা এজেন্সির প্রশাসনিক কাজকর্মে একটা বড় গ্যাপ পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নেই হাতে,

boirboi.net

কয়েকটা দিন ফ্রি পেয়ে যাওয়ায় এই সুযোগে বেশ কয়েকটা শাখার বাৎসরিক পরিদর্শনটা সেরে নেবে বলে ঠিক করেছে ও।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে পৃথিবীব্যাপী নেটওঅর্ক গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস।

সবার আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছে রানা, গত দেড় বছরে এখানে ওর পা পড়েনি, কী পরিমাণ কাজ জমে আছে, আল্লাহই জানে। রাতটা এজেন্সির ভাড়া করা একটা অ্যাপার্টমেন্টে কাটিয়ে সকাল ন'টায় অফিসে চলে এল ও, কিন্তু এলিভেটর থেকে বের হয়েই বুঝল, টাইমিঙে গড়বড় হয়ে গেছে।

চোখের সামনে পুরো ফ্লোর জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড দেখতে পেল ও, ওভারঅল পরা ওয়ার্কার আর কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালে সে এক ভয়াবহ অবস্থা! লোকজনের কোলাহল, হাতুড়ি পেটার ঠক ঠক, দেয়ালে ড্রিল-মেশিন দিয়ে দিয়ে ছিদ্র করার বিকট আওয়াজ—কান পাতা দায়। হতভম্ব হয়ে গেল রানা। নতুন অফিসে এসে উঠেছে লস অ্যাঞ্জেলেস শাখা, আগের ভাড়া করা বিল্ডিংটা ছেড়ে উইলশায়ার অ্যাভিনিউয়ের এই নবনির্মিত ভবনের টপ ফ্লোরটা কিনে নেয়া হয়েছে। এসব বেশ কয়েকদিন আগের কথা, এরা যে এখনও শিফটিং শেষ করতে পারেনি, তা ওর জানা ছিল না।

মহা হট্টগোলের মাঝখানে এলিভেটরের সামনে মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাখাপ্রধান নাফিজ ইমতিয়াজ, ভাবখানা এমন, যেন কিছুই ঘটছে না। ওকে বেরুতে দেখে দু'পা সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'সুপ্রভাত, মাসুদ ভাই।'

'ইয়াল্লা, নাফিজ! এ কী অবস্থা?' বিস্মিত গলায় বলল রানা।

'সরি, ইন্টেরিয়রের কাজটা এখনও শেষ করতে পারিনি।'

'মানে!' কানফাটা আওয়াজের কারণে গলা উঁচু করে কথা বলতে হচ্ছে রানাকে। 'এসব অন্তত দু'সপ্তাহ আগে শেষ হবার কথা।'

'এখানে দাঁড়িয়ে শুনবেন? তার চেয়ে আপনার রুমে চলুন, মাসুদ ভাই, ওখানেই সব বলছি।'

'আমার রুম! আছে কিছু? আমি তো স্রেফ ধ্বংসস্তূপ দেখছি।'

'আছে, আছে,' আশ্বাসের সুরে বলল নাফিজ। 'রুটিন কাজ চালাবার জন্য একটা উইং সবার আগে রেডি করেছি। আসুন আমার সঙ্গে।'

নাফিজের পিছু পিছু ফ্লোরের ডানদিকে গেল রানা। দেখা গেল কথাটা মিথ্যে নয়, সত্যিই বেশ খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে ডেস্ক আর টেবিল বসানো হয়েছে, এক কোণে কাঁচে ঘেরা ডিরেক্টরের চেম্বারও দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এই অংশটাও পুরোপুরি তৈরি বলা চলে না, মেঝেতে টাইলস্ বসানো থেকে শুরু করে ফলস্ সিলিং লাগানো, পার্মানেন্ট লাইট ফিটিংস স্থাপন করা—সব বাকি। তারপরও কাজ চালানোর একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাঁচঘেরা অফিসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিতেই শব্দের অত্যাচার অনেকটাই কমে [illegible] নিজের চেয়ারে বসল রানা,

boiRboi.net

মুখোমুখি নাফিজ।

'এসব হচ্ছেটা কী, বলো তো?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল রানা। 'অফিসের ইন্টেরিয়র প্রিপারেশন আর শিফটিঙে পনেরো দিনের বেশি লাগার কথা নয়। এই বিল্ডিঙে গত মাসের এক তারিখেই তো এসেছ। সে হিসেবে ধরলে মাসের অর্ধেকের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার কথা।'

'এক তারিখে আসতে পারিনি, মাসুদ ভাই,' নাফিজ বলল। 'লিগাল ফর্মালিটিজ শেষ হয়নি বলে বিল্ডাররা পজেশন বুঝিয়ে দেয়নি। সব ঝামেলা মিটিয়ে আমরা এসেছি উনিশ তারিখে।'

'এত দেরি হয়েছে? আমাকে জানাওনি কেন?'

'পেলাম কোথায় যে জানাব?' পাল্টা অভিযোগ নাফিজের গলায়। 'কী নাকি এক সিক্রেট মিশন নিয়ে ইয়োরোপ গেছেন, হেড অফিস কোনও কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনই দিতে রাজি হলো না। শেষে ওদেরকেই ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছিলাম।'

'ও! তা-ই বলো। যাক গে, এ-ই যখন অবস্থা, আমাকে মানা করে দিলেই পারতে। অফিস রেডি হলে নাহয় আসতাম।'

'জী না, মাসুদ ভাই। সেটি হচ্ছে না। একবার আপনার প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিলে কবে আবার আপনার পদধূলি পড়বে, কে জানে! আমাদের কথা তো মনে হয় ভুলেই গেছেন। শেষ কবে এই ব্রাঞ্চে এসেছেন, মনে আছে?'

হাসল রানা। 'আসলে এত ব্যস্ত থাকি যে কী বলব...'

'সেটা আমরাও জানি। সেজন্য আপনার শিডিউলটা হাতছাড়া করতে চাইনি, অফিসে নরক গুলজার চললেও নিয়ে এসেছি। কী পরিমাণ কাজ জমে আছে, কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'নিয়ে এসো তা হলে,' রানা বলল। 'আজ-কালের ভিতর তোমাদের কাজগুলো দেখে নিয়ে অন্য ব্রাঞ্চে যেতে হবে।'

boiRboi.net

'বলতে হবে না, সব রেডি আছে।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তিনজন জুনিয়র অপারেটর, সবাই দুহাতে ছোটবড় একগাদা ফাইল নিয়ে এসেছে। নাফিজের ইশারায় সব টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা হলো। চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল রানা, উঁচু উঁচু তিন সারি ফাইলের আড়ালে ও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

'ইয়াল্লা! এগুলো সব আমাকে দেখতে হবে?'

'জী, হুজুর,' সকৌতুকে বলল নাফিজ। 'এবার বুঝুন, দেড় বছর লস অ্যাঞ্জেলেসের মত বড় শাখায় না এলে কী ঘটে!'

'আল্লাহ, রক্ষে করো! মরেই যাবো,' মাথায় হাত দিল রানা। তারপর গলায় মধু ঢেলে বলল, 'ভ্রাতা নাফিজ, এখান থেকে কিছু কমিয়ে আমাকে একটু ভারমুক্ত করতে পারো না?'

হেসে ফেলল নাফিজ। 'জানতাম, এত দেখে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না, সেজন্যে অনেকটা ভারমুক্ত করেই রেখেছি। লাল রঙের কাভারে যত ফাইল আছে, সব বাদ দিতে পারেন। আমি জোড়াতালি দিয়ে ওগুলোর সমাধান করে রেখেছি।'

'তা হলে সামনে দিয়েছ কেন?'

'যাতে বুঝতে পারেন, ডিরেক্টরেরও কাজ আছে শাখাগুলোয়। দূর থেকে শুধু সুপারভাইজ করলেই হয় না। প্রশাসনিক কাজকর্ম আর বড় বড় ফিনানশিয়াল ডিলগুলোর জন্য আপনাকে সশরীরে প্রয়োজন। আমরা এমনিতে ম্যানেজ করে নিই বটে, তবে সবসময় এভাবে কাজ চালানো যায় না। উই নিড আওয়ার ডিরেক্টর, মাসুদ ভাই... অন্তত ছ'মাসে-বছরে একবার হলেও!'

'যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, বাবা। যাও, এখন থেকে নিয়মিত আসব। এখন বাড়তি ঝামেলাগুলো সরিয়ে বাঁচাও আমাকে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'ঠিক আছে, সরাচ্ছি। এরপর যা থাকবে, সব কিন্তু দেখে দিয়ে যাবেন। ওগুলো সব ফিনানশিয়াল আর জটিল কেস সংক্রান্ত, জোড়াতালি দিয়ে ম্যানেজ করতে পারব না।'

'দেব, দেব। সরাও তো এখন।'

জুনিয়র অপারেটররা লাল রঙের সমস্ত ফাইল কাভার নিয়ে বেরিয়ে গেল, টেবিলের স্তূপটা অর্ধেকের চেয়ে কমে গেল তাতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। নাফিজকে বলল, 'এক কাপ কড়া কফি আনাও তো, সব কাজ আজই শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল নাফিজ। 'পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আর হ্যাঁ, আজকের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিয়ো, চোখ বোলাব।'

দরজার কাছে চলে গিয়েছিল নাফিজ, উল্টো ঘুরে বলল, 'ওটা বোধহয় সম্ভব হবে না। এখন সব রিপোর্ট ই-মেইলে আসে, জানেন তো। অথচ আমাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এখনও চালু হয়নি।'

'সে কী! তা হলে তোমরা কাজ চালাচ্ছ কীভাবে?'

'জরুরি কিছু হলে স্যান ফ্রান্সিস্‌কো ব্রাঞ্চ থেকে ফোনে জানিয়ে দেয়, তা ছাড়া দু'দিন পর পর লোক মারফত ডকুমেন্টও আনিয়ে নিচ্ছি। আপাতত এভাবেই চলছে।'

'দিস ইজ টোট্যালি আন-অ্যাকসেপ্টেবল,' রানা বিরক্ত হলো। 'কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সবার আগে চালু হওয়া উচিত। রায়হান কোথায়? ঢাকা থেকে ওকে আনাওনি?'

'আমাকে দোষ দেবেন না, খবর দিয়ে পাঁচদিন আগেই আনিয়েছি ওকে। ওর কম্পিউটার উইঙেরও সেটআপ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেডি করে দিয়েছি আমি। তবু কেন নেটওয়ার্ক চালু হয়নি, সেটা ও-ই বলতে পারবে।'

boiRboi.net

'কী আশ্চর্য! নেটওয়ার্কটা যে কত জরুরি, তা কি ও জানে না?'

'আপনিই জিজ্ঞেস করুন, আমার কথা তো কানেই তোলে না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কোথায় ও? চলো তো!'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে পথ দেখাল নাফিজ, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের মাঝখান দিয়ে জায়গা করে রানাকে নিয়ে এল ফ্লোরের অন্যপ্রান্তে, কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা মাঝারি আকারের কামরার সামনে—ওটাই এই ব্রাঞ্চের কম্পিউটার উইং। পার্টিশানের ওপাশে বড় বড় টেবিলের উপর বসানো হয়েছে মোট দশটা কম্পিউটার আর সার্ভার। এই মুহূর্তে একজন মাত্র মানুষকে দেখা যাচ্ছে কামরার ভিতরে।

দরজা ঠেলে ঢুকল রানা, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা বাতাস। এসি'র টেম্পারেচার অসম্ভব রকম কমিয়ে রাখা হয়েছে, রানা এজেন্সির কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ একদমই গরম সহ্য করতে পারে না। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে রায়হান রশিদ, সামনের মনিটরের দিকে তাকিয়ে মগ্ন—রুমে যে নতুন মানুষ ঢুকেছে, তা টেরই পেল না। শব্দ না করে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, ছেলেটা কী নিয়ে এত ব্যস্ত, জানার ইচ্ছে। স্ক্রিনে ফুটে থাকা দুর্বোধ্য সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কিছুই বুঝতে পারল না ও, কিন্তু সবার উপরে জ্বলজ্বল করতে থাকা লেখাটা দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল:

"ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।"

'হুঁ, বসে বসে তা হলে নাসার কম্পিউটারে হানা দেয়া হচ্ছে!' গম গম করে উঠল রানার গলা।

কানের কাছে কথা শুনে চমকে উঠল রায়হান, ধড়মড় করে

boirboi.net

উঠে দাঁড়াল, ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেল চেয়ারটা। ঘুরে রানার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল সে, পরমুহূর্তে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা।

'মাসুদ ভাই! কখন এসেছেন?' আবেগের আতিশয্যে রানাকে জাপটে ধরল সে। কাজটা করতে গোটা এজেন্সির আর কারও সাহস হবে না, কিন্তু রায়হানের ব্যাপারটা ভিন্ন—আচার-আচরণ এখনও ছেলেমানুষের মত তার, রানাকে জাপটে ধরা ঠিক হবে কি হবে না, সে ধরনের কোনও চিন্তাই করে না। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা রায়হান, একহারা, ছিপছিপে শরীর। চেহারাটা খুব সুন্দর না হলেও অনাকর্ষণীয় নয়। মুখে একবিন্দু দাড়িগোঁফ না থাকায় বন্ধুরা তাকে মাকুন্দ বলে খেপায়। ছাব্বিশ বছর বয়স তার, কিন্তু দেখায় অনেক কম...প্রথম দেখায় কলেজ পড়ুয়া বলে ভ্রম হয়। চেহারা তো বটেই, চোখের মণিদুটোও এর একটা প্রধান কারণ, ওখানে নিপাট সরলতা ছাড়া আর কিছু নেই। মুহূর্তেই যে কাউকে আপন করে নেবার অদ্ভুত গুণ আছে রায়হানের মধ্যে, কেউ তাকে অপছন্দ করতে পারে না। স্বাভাবিক; এমন চমৎকার একটা ছেলেকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

বকাঝকা করতে এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, পাল্টা আলিঙ্গনের ইচ্ছেটা গলা টিপে মারল। 'হয়েছে, হয়েছে,' গলায় কপট রাগ ফোটাল ও। 'করছটা কী, জানতে পারি? আবার হ্যাকিং! তোমার কি এরই মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি?'

'না, না, মাসুদ ভাই। আপনি যা ভাবছেন, তেমন কিছুই নয়। এটা নির্দোষ অনুপ্রবেশ, কিছু চুরি করছি না।'

'তা হলে ঢোকার দরকারই বা কী?'

'কৌতূহল নিবৃত্তি,' রায়হান বলল। 'এবং চর্চা। প্র্যাকটিস না

রাখলে ব্রেনে মরচে ধরে যাবে না? দরকারের সময় আপনাকে ইনফরমেশন এনে দেব কীভাবে?'

'তাই বলে নাসা?' রানা বিরক্ত, 'দুনিয়ার সবচেয়ে প্রোটেক্টেড এবং সিক্রেট মেইনফ্রেমগুলোর মধ্যে ওটা একটা। কী পরিমাণ সিকিউরিটি আছে, তা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো। একবার যদি ট্র্যাক করে ফেলে, তা হলে কী হবে ভেবে দেখেছ? পুলিশ, এফবিআই, সিআইএ, এনএসএ...সবাই একসঙ্গে পিছনে লেগে যাবে। কে সামলাবে ওসব?'

'খামোকা চিন্তা করছেন, মাসুদ ভাই,' রায়হানের মুখে অহংকারী হাসি। 'জানেন না? *ডাবল আর*-কে কেউ ট্র্যাক করতে পারে না।'

'ওহ্ নো, নট অ্যাগেইন!'

আজ থেকে তিন বছর আগে সারা পৃথিবীর সব গোপন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক *ডাবল আর* নামে এক হ্যাকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল...রায়হানই ছিল সেই হ্যাকার। অসম্ভব প্রতিভাবান আর মেধাবী সে, প্রোগ্রামিং আর কম্পিউটার সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে তার ভিতর একটা সহজাত দক্ষতা রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র ছিল ও, ভাল ফলাফলের কারণে স্কলারশিপ পেয়ে চলে আসে আমেরিকায়, ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে। ভার্সিটিতে কিছু অসৎ বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে হ্যাকিঙে উৎসাহী হয়ে ওঠে। সহজাত দক্ষতার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হ্যাকারে পরিণত হয় ও। একটার পর একটা সিকিউরিটি সিস্টেম ভেদ করে নামীদামি সব প্রতিষ্ঠান আর সরকারী সংস্থার মেইনফ্রেম থেকে গোপন তথ্য চুরি করে কালোবাজারে বিক্রি করত রায়হান, পিছনে রেখে যেত একটা

মাত্র চিহ্ন—পর পর দুটো ইংরেজি বর্ণ—*আরআর*।

ওকে ট্র্যাক করার কোনও উপায়ই ছিল না, নিজের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট মুছে দিতে বা লুকিয়ে ফেলতে দারুণ সেয়ানা ছিল ছেলেটা। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে এফবিআই ওকে ধরার জন্য একটা বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে—*অপারেশন ডাবল আর*। কম্পিউটারের মাধ্যমে যেহেতু ট্র্যাক করা সম্ভব নয়, তাই বিপরীত দিক থেকে কাজ শুরু করে তারা—রায়হানের বিক্রি করা তথ্যগুলোর উৎসের সন্ধানে নামে। তবে এমন তথ্য তো একটা নয়, কয়েকশো। এফবিআইয়ের সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের স্বল্প লোকবল দিয়ে এই বিপুল কাজ সম্ভব ছিল না। হাতের কাছে যত বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ছিল, সবাইকেই কাজে লাগায় তারা—এর মধ্যে রানা এজেন্সিও ছিল। অন্য সবার চেয়ে ভাল কাজ দেখায় ওরা, রানা নিজেই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রায়হানের খোঁজ বের করে ফেলে ও, ততদিনে বিদেশি একটা ইন্টেলিজেন্সও কীভাবে যেন চিনে ফেলেছে তাকে। কিডন্যাপ করা হলো রায়হানকে, মাঝসাগরে একটা জাহাজ থেকে ছোটখাট একটা যুদ্ধ করে রানা কীভাবে ওকে উদ্ধার করে এনেছিল—সে আর এক গল্প।

এরপর রায়হানকে এফবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়াটাই ছিল সঙ্গত। কিন্তু রানা ভেবে দেখল, তাতে লাভ নেই কোনও। আমেরিকানদের ভাল করেই চেনে ও। জেলের চেহারাও দেখবে না ছেলেটা, ওকে সিআইএ বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থা নিজেদের কুটিল কোনও স্বার্থে ব্যবহার করবে। তা ছাড়া ততদিনে রায়হানও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। রোমাঞ্চ এবং অল্প সময়ে বড়লোক হবার নেশায় না বুঝে হ্যাকিং করত ও, কিন্তু কিডন্যাপিঙের সেই ঘটনা ওর ভিতর আত্মোপলব্ধি এনে

দিয়েছে—বুঝিয়ে দিয়েছে ওর ক্ষমতার ভালমন্দ দিক। সবকিছু ভেবে রানা ঠিক করল, রায়হানের এই অত্যাশ্চর্য দক্ষতা স্বদেশ এবং সারা পৃথিবীর কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে—মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানও সম্মতি দিলেন এতে। ফলে নতুন জীবন পেল রায়হান, যোগ দিল রানা এজেন্সি তথা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। বিসিআই এজেন্টরা ডাবল আর-কে খুঁজে বের করার মত সমস্ত সূত্র মুছে দিল, রায়হানও আর কোনওদিন সাইবার-ক্রাইমের পেশায় ফিরে যায়নি। বিসিআইয়ের ট্রেনিং শেষ করে ও এখন পুরো প্রতিষ্ঠানের চিফ আই.টি. এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছে। মাঝে মাঝে হ্যাকিং অবশ্য করতে হয় ওকে, তবে সেটা দেশ ও দশের কল্যাণে—উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য।

'আমি এত কিছু বুঝি না,' বলল রানা। 'জলদি ওটা বন্ধ করো।' আঙুল তুলে মনিটরটা দেখাল ও। 'যতক্ষণ অনলাইন থাকছ, ডিটেক্ট হয়ে যাবার ভয় ততই বাড়ছে।'

'রিল্যাক্স, মাসুদ ভাই,' রায়হান আশ্বাস দিল। 'অনলাইনে নেই আমি, দরকারি জিনিসটুকু ডাউনলোড করে অনেক আগেই কম্পিউটারটা অফলাইন করে রেখেছি। যেটা দেখছেন, ওটা সেভ করা ডেটা।'

'ডাউনলোড করেছ!' রানা অবাক হলো। 'কী ডাউনলোড করেছ?'

'অবিশ্বাস্য একটা জিনিস!' চোখ বড় করে বলল রায়হান। 'না দেখলে বিশ্বাসই হবে না আপনার। এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।'

বাধা দিল রানা। 'দেখাদেখির অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে কাজের কথায় এসো। এখানকার নেটওয়ার্ক এখনও চালু

boiRboi.net

হয়নি কেন? নাসায় যখন ঢুকতে পারছ, তখন তো মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাকই আছে।'

'খালি আমি ঢুকতে পারলেই তো হবে না, অন্য কেউ যাতে এখানে ঢুকতে না পারে, সে ব্যবস্থাও তো করতে হবে। আমাদের খুব শক্ত একটা সিকিউরিটি সিস্টেম তৈরি করা দরকার।'

'কেন, এতদিন সিকিউরিটি ছিল না?'

'হাহ্, পুরনো সিস্টেমটা?' রায়হানের চেহারায় অবজ্ঞা। 'ওই ফায়ারওয়াল ভাঙতে একজন হ্যাকারের আধঘণ্টাও লাগবে না। দিনকাল পাল্টে গেছে, মাসুদ ভাই। এখন আমাদের আরও উন্নত সিস্টেম বসাতে হবে।'

'বসাও না! কে মানা করছে? তোমাকে আনাই তো হয়েছে সেজন্য।'

'শুধু মুখে বসাও বললেই কী আর হয়? আমাকে তো মালমশলা দিতে হবে।'

'মালমশলা?'

'হ্যাঁ। হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার মিলিয়ে বিশ স্তরের একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা দাঁড় করাব আমি, কারও বাপেরও সাধ্য নেই চুরি করে ভিতরে ঢোকে।'

'তুমিও পারবে না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'আমিও পারব না,' মাথা নাড়ল রায়হান। 'ইট উইল বি ইউনিক অ্যান্ড স্টেট অভ দ্য আর্ট। বিসিআই হেডকোয়ার্টারসহ এজেন্সির বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চে ইতোমধ্যে ওটা চালু করে দিয়েছি আমি। আগামী ছ'মাসের মধ্যে বাকি সমস্ত শাখায় ওটা ইন্সটল করার নির্দেশও দিয়েছেন চিফ।'

'তা...তোমার এই ইউনিক সিস্টেম বসাতে ক'দিন লাগে?'

'বেশি না, মাত্র একদিন।'

boiRboi.net

'একদিন!' রানা চোখ কপালে তুলল। 'তুমি এসেছ পাঁচদিন হয়েছে, এখনও সব বন্ধ কেন?'

'দোষটা আমার নয়,' বলল রায়হান। 'সফটওয়্যার রেডি আছে, অভাবটা হার্ডওয়্যারের। এখানকার সব কম্পিউটার অন্তত তিন বছরের পুরনো। ফায়ারওয়ালটার জন্য বেশ কিছু নতুন পার্টস লাগবে। নাফিজ ভাইকে তো আমি তিনদিন আগেই লিস্ট দিয়েছি, জিনিস না এলে কাজ করি কীভাবে?'

এবার নাফিজের দিকে ফিরল রানা। 'কথাটা কি সত্যি?'

'ও কী একটা কাগজ যেন পাঠিয়েছিল বটে,' কাঁচুমাচু মুখে বলল নাফিজ। 'আমি আসলে ব্যস্ততার জন্য দেখতে পারিনি।' বসের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

একরকম পালিয়ে বাঁচল সে।

'বেচারাকে একটু ছাড় দিন, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'আসার পর থেকেই দেখছি, অফিস রেডি করার জন্য পাগলের মত খাটছে। তার মধ্যে আপনি আবার আসছেন বলে খবর পাঠিয়েছেন। ওর তো মাথা খারাপের মত অবস্থা—আপনি এলে কোথায় বসতে দেবে, কী করবে না করবে...এতসব ঝামেলার ভিতর আমার মেমোটা চোখ এড়িয়ে গেলে দোষ দেয়া যায় না।'

'দোষ দিচ্ছি কে বলল?' রানা ভুরু নাচাল। 'তবে মাঝে মাঝে একটু শাসন করতে হয়, বুঝেছ?'

'আপনার এ-সব সাইকোলজিক্যাল টেকনিক বুঝে কাজ নেই আমার,' বলে একটা চেয়ার টেনে ধরল রায়হান। 'বসুন, নাসা থেকে কী পেয়েছি—দেখাই আপনাকে।'

'বসতে হবে না, এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। স্ক্রিনের ওসব হায়ারোগ্লিফিক্স বোঝার ক্ষমতা নেই আমার—এটা তোমার জানা

boiBoi.net

থাকা উচিত। সুতরাং ওগুলো দেখে মুগ্ধ হতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'ওহ্, এটা?' হেসে উঠল রায়হান। 'সিগনালটাকে ভিজুয়্যালি ট্রান্সফার করেছি বলে এমন দেখাচ্ছে।'

'সিগনাল!' রানা অবাক। 'কীসের সিগনাল?'

'সেটাই তো আপনাকে দেখাতে...না, না, শোনাতে চাইছি। আসুন, বসুন এখানটায়।'

'আমার বসার সময় নেই, রায়হান,' রানা মাথা নাড়ল। 'নাফিজ একগাদা ফাইল দিয়ে রেখেছে...চোখ কপালে উঠে যাবার অবস্থা।'

'চোখ-কান শুধু কপালে নয়, মাথার তালুতে অলরেডি উঠে আছে আমার—নাসার এই জিনিসটার কল্যাণে। আপনারও একই অবস্থা হবে, চুপ করে বসুন এখানটায়। ফাইল-টাইলের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছি এখুনি।'

রায়হানের পীড়াপীড়ি দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা, ছেলেটাকে খুব শিয়োর দেখাচ্ছে ওকে চমকে দেয়ার ব্যাপারে! ঘটনাটা কী? 'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দেয়া গেল তোমাকে।' বলে বাড়িয়ে ধরা চেয়ারটা টেনে বসল ও।

'পাঁচ মিনিটও লাগবে না, স্রেফ দু'মিনিট নেব আমি,' বলে নিজের আসনে বসে পড়ল রায়হান। কী-বোর্ডের উপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য নেচে বেড়াল তার দু'হাত, তারপরই স্পীকার থেকে একটা নিচু লয়ের শব্দ ভেসে এল। আওয়াজটা অদ্ভুত, অস্বাভাবিক—এই মনে হয় হাজারটা কণ্ঠ একসঙ্গে সুর মেলাচ্ছে সিম্ফনিতে, পরমুহূর্তেই সে জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে কেমন একটা চাপা গোঙানি! হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় যেন সাইরেন জাতীয় কিছু বাজছে আবার মনে হয়—না, তা নয়, করুণ সুরে বিলাপ

করছে অজানা কোনও প্রাণী। অতিপ্রাকৃত, অপার্থিব এই বিচিত্র সুর, যেন অশুভ কোনও সঙ্কেত দিয়ে চলেছে। পৃথিবীতে সৃষ্টি হওয়া কোনও শব্দের সঙ্গে এর মিল নেই। নিজের অজান্তেই গা শিরশির করে উঠল রানার, ঘাড়ের কাছে সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল খাটো চুলগুলো।

মিনিটখানেক চলল এই অদ্ভুত সুর, তারপর থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল রানা, বুকের ভিতরটা কাঁপছে, ঠাণ্ডাও লাগছে খুব—তবে সেটা এসি'র ঠাণ্ডা বাতাসে নয়, অন্য কোনও কারণে। অবাক লাগল ওর—ভয় পায়নি, তাও বুক ধক ধক করছে, হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে খাঁচা ছেড়ে। ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল ও, তারপর তাকাল রায়হানের দিকে। ছেলেটার মুখে দুষ্টু হাসি, ভুরু নাচিয়ে ভাব করল—কী, বলেছিলাম না?

'কী ছিল ওটা?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল রানা।

'ইউনিক একটা সাউন্ড সিগনাল,' জবাব দিল রায়হান। 'কেন ইউনিক বলছি, জানেন? বুক কাঁপছে না?'

'হ্যাঁ। কারণটা কী?'

'মানুষের কানে শোনা যায় না, এমন একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ বেরুচ্ছিল অদ্ভুত সুরটার সঙ্গে, সরাসরি নার্ভে হামলা চালায় ওটা।'

রানার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না—এভাবে কোনও শব্দ ওর বুক কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দিল তো! জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি আসলেই সম্ভব?'

'হ্যাঁ,' রায়হান মাথা ঝাঁকাল। 'দুনিয়াজুড়ে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্যও পাওয়া গেছে। চোখে ফ্যাকোইমালসিফিকেশন সার্জারির কথা তো

boiRboi.net

নিশ্চয়ই জানেন, সাউণ্ডওয়েভ দিয়ে এখন মানুষকে শুধু ভয় দেখানো নয়, হার্ট অ্যাটাকও করিয়ে দেয়া সম্ভব।'

'যেটা শুনলাম... সেটা ক্ষতিকর কিছু ছিল না তো!' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, না,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'ওটা স্রেফ ভয় ভয় ভাব সৃষ্টি করে, আর কিছু না।'

'হুম! কিন্তু এ জিনিস নাসার কম্পিউটারে কেন? ওরা নিশ্চয়ই সাউণ্ডওয়েভ নিয়ে গবেষণা করছে না?'

'আসল জিনিসটাই তো ধরতে পারেননি, মাসুদ ভাই,' হাসল রায়হান। 'শুধু বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিটা নয়, পুরো সিগনালটাই একটা বিরাট রহস্য।'

'কেন? এই সিগনালে আর কী আছে?'

'কী আছে, সেটা পরের চিন্তা,' রায়হান হেঁয়ালি করছে। 'আগে জেনে রাখুন—এটা মানুষের তৈরি করা নয়।'

'কীভাবে শিয়োর হচ্ছ?'

'কারণ, এটা এসেছে আউটার স্পেস থেকে!' শান্ত গলায় বোমাটা ফাটাল রায়হান।

boiRboi.net

চার

'আউটার স্পেস!' রানা চমকে উঠল। 'তুমি বলতে চাইছ—এটা একটা অ্যালিয়েন কমিউনিকেশন? মানে...ভিনগ্রহবাসীদের পাঠানো মেসেজ?'

'আমার তা-ই ধারণা,' রায়হান মাথা ঝাঁকাল।

'এই উদ্ভট ধারণা তোমার মাথায় এল কেন? জিনিসটা নাসার কম্পিউটারে পাওয়া গেছে, তাই?'

'উঁহুঁ, আমি সংশ্লিষ্ট সমস্ত ডেটা সংগ্রহ করেছি। সিগনালটা রিসিভ করেছে ওদের ডিপ স্পেস প্রোব *ভয়েজার-টু*, ওটা সৌরজগতের বাইরে আছে এই মুহূর্তে। জটিল একটা পদ্ধতিতে সিগনালটার উৎসও বের করেছে নাসা—সেটা পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে...ক্যাডমিয়াম গ্যালাক্সিতে।'

'দু'লাখ আলোকবর্ষ!' রানার গলায় অবিশ্বাস। 'সেটা কীভাবে সম্ভব? এত দূর পর্যন্ত শব্দটা এল কেমন করে?'

'নিশ্চয়ই কোনও ধরনের বুস্টার ব্যবহার করা হয়েছে,' রায়হান আন্দাজ করল। 'পদ্ধতিটার ব্যাখ্যা চাইবেন না দয়া করে, বলতে পারব না। ভিনগ্রহের অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি—আমরা হয়তো ওটার মৌলিক ব্যাপারগুলোই এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝেছি—সিগনালটা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে এনক্রিপ্ট করে দেয়া হয়েছিল, নিচু লয়ের শব্দ অনেক বেশি দূর কাভার করতে পারে, এটা জানেন তো!'

'আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে ব্যাপারটা,' রানা বলল। 'এটা কোনও ভাঁওতাবাজি নয় তো?'

'মনে হয় না,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'ভাঁওতাবাজি হলে এতক্ষণে বিষয়টা প্রচার করে নাম কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত ওরা, দেরি করত না। হাজার হোক, ভিনগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটা।'

'সিগনালটা কখন রিসিভ করা হয়েছে?'

'এই তো, চব্বিশ ঘণ্টার মত হবে। আমি ইলেকট্রনিক লগবুক ঘেঁটে দেখেছি—সত্যি সত্যি *ভয়েজার-টু* প্রোব থেকেই এসেছে

boiRboi.net

ওটা।'

'হুঁ, তার মানে শব্দটার উৎস নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই?'

'না। আমেরিকানরা তো এরই মধ্যে রিসার্চ শুরু করে দিয়েছে—এরিয়া ফিফটি ওয়ানে ওটার একটা কপি পাঠানো হয়েছে। এয়ারফোর্সের তত্ত্বাবধানে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের টপ সিক্রেট কম্পিউটারে ওটার বিশ্লেষণ করছে বিজ্ঞানীদের একটা টিম। অবশ্য ওদের উচিত এখুনি আবিষ্কারটা সারা দুনিয়াকে জানিয়ে রাখা, নইলে পরে কৃতিত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'নাসার স্পেস বেজড প্রোব আর স্যাটেলাইটগুলোর ট্রান্সমিশন সারাক্ষণ মনিটর করে উন্নত সব দেশ—হ্যাকিঙের মাধ্যমে। আমি নিজেই বহুবার ডেটা চুরি করে বিক্রি করেছি। নিশ্চিত থাকতে পারেন, এতক্ষণে অনেকেই সিগনালটার কপি পেয়ে গেছে, গবেষণাও শুরু করে দিয়েছে। যে আগে ব্যাপারটার ঘোষণা দেবে, তারই নামডাক হবে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে বলছ, এখনও সবাই চুপচাপ কেন?'

'এত বড় একটা ব্যাপার...সবাই শিয়োর হয়ে নিতে চাইছে আরকী। হাজার হোক, আমেরিকা ছাড়া বাকি সবাই তো সিগনালটা চুরি করেছে...প্রকাশ করার পর এমনিতেই রোষের শিকার হতে হবে, তার ওপর যদি ভুয়া প্রমাণ হয়...বুঝতেই পারছেন। তা ছাড়া মেসেজটার অর্থ বের করারও একটা ব্যাপার আছে, আমি সে-চেষ্টাই করছিলাম।'

'আমি তো দেখলাম কী সব হিজিবিজির দিকে তাকিয়ে আছ।'

'হিজিবিজি না,' রায়হান হাসল। 'সাউন্ডটার ভিজ্যুয়াল কপি। কোনও প্যাটার্ন আছে কি না, তা-ই দেখছিলাম। শুনে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এটাই বিকল্প কায়দা। আসুন দেখাই।'

কী-বোর্ডের বাটন চেপে শুরুতে দেখা সেই দুর্বোধ্য লেখাগুলো আবার স্ক্রিনে ফিরিয়ে আনল রায়হান। বোকার মত তাকিয়ে রইল রানা, এসবে ও একেবারেই আনাড়ি। কালো পর্দায় ফুটে থাকা আবোলতাবোল সঙ্কেতগুলো কম্পিউটার-বিশারদদের কাছে অর্থবহ হতে পারে, কিন্তু ওর চোখে স্রেফ হিজিবিজিই বটে। রায়হান অবশ্য গভীর মনোযোগে স্টাডি করছে সঙ্কেতগুলো, পাশে রাখা নোটবুকে মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে, একটা অংশ দেখা হয়ে গেলে মাউস দিয়ে স্ক্রোল করে পরেরটুকু নিয়ে আসছে পর্দায়।

'এসব পড়ে তুমি বুঝতে পারছ কিছু?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

কাজ থামিয়ে হাসল রায়হান। বলল, 'না, মাসুদ ভাই। শোনার জিনিস কি আর পড়ে বোঝা যায়? শুধু রীডিং দিতে পারছি—অনেকটা বাংলা অক্ষর দিয়ে চিনা ভাষা লেখার মত ব্যাপার বলতে পারেন। পড়া যায়, কিন্তু অর্থ বোঝা যায় না। আমি আসলে এতে কোনও কমন প্যাটার্ন আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখছি।'

'ঠিক আছে, তুমি কাজ করো তা হলে,' রানা উঠে দাঁড়াল। 'আমি গিয়ে ফাইলপত্র নিয়ে বসি গে। তা ছাড়া তোমার এই আবিষ্কারের কথাও ঢাকায় রিপোর্ট করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল রায়হান, রানাও অফিসের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াল। রুম থেকে বেরুতে পারল না ও, দরজা পর্যন্ত পৌঁছুতেই শোনা গেল রায়হানের

boighar.net

উত্তেজিত চিৎকার।

'ও, মাই গড!'

থমকে গেল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রায়হান। 'কী ব্যাপার, আবার কী হলো?'

'জলদি এদিকে আসুন, মাসুদ ভাই! অবিশ্বাস্য আরেকটা ব্যাপার পেয়েছি!'

কৌতূহলী হয়ে ফিরে এল রানা। 'কী পেয়েছ?'

প্রশ্নটা মনে হলো রায়হানের কানে যায়নি, ও বিড়বিড় করছে, 'এ...এটা কীভাবে সম্ভব? তা হলে কী...তা হলে কী...'

'অ্যাই, রায়হান!' গলা চড়াল রানা। 'কী হয়েছে?'

উত্তেজিত চোখে ওর দিকে তাকাল রায়হান, স্ক্রিনের একটা অংশে আঙুল ঠেকাল। বলল, 'এই...এই অংশটা আমি পড়তে পারছি, মাসুদ ভাই। বুঝতেও পারছি!'

অসঙ্গতিটা ধরতে এক মুহূর্তও লাগল না রানার। 'শ্রবণযোগ্য সিগনালে আবার পড়ে বোঝার জিনিস এল কীভাবে? এইমাত্র না বললে, ওটা সম্ভব নয়?'

'উত্তরটা আমার জানা নেই, ব্যাপারটা আমার কাছেও ধাঁধার মত লাগছে।'

'কেন? কী বলা হচ্ছে ওতে?'

'তা-ও জানি না। অসম্ভব জটিল আর কঠিন একটা কোডে কিছু একটা লুকানো আছে মেসেজটায়। আমি শুধু কয়েকটা ডিজিট পড়তে পারছি।'

'কী ধরনের ডিজিট?'

'তারিখ আর সময়। এক ধরনের টাইম-ডিলেইড কমাণ্ড লুকিয়ে আছে এর ভিতরে, কিন্তু সেটা কী—বলতে পারব না।'

'কবেকার তারিখ?'

boiRboi.net

'চারদিন পরের,' বলে ঘড়ির দিকে তাকাল রায়হান। 'মোটামুটি নব্বুই ঘণ্টা পর কিছু একটা ঘটবে এই মেসেজটার ফলে।'

'কী ঘটবে, সেটা জানার কোনও উপায় আছে?' রানার গলায় থমথমে ভাব।

'কোড ভেঙে পাঠোদ্ধার করতে হবে—ওটাই একমাত্র পথ।'

'কত সময় লাগবে কোড ভাঙতে?'

মাথা নাড়ল রায়হান। 'সরি, মাসুদ ভাই। মিথ্যে আশা দেব না, এই কোড ভাঙা আমার কম্মো নয়।'

'মানে!' রানা অবাক হলো। 'আমি তো জানি—তোমার মত দক্ষ হ্যাকার আর কোডব্রেকার পৃথিবীতে কেউ নেই। আর তুমিই বলছ পারবে না! অন্তত চেষ্টা তো করে দেখো। নইলে নুমায় যোগাযোগ করে ল্যারি কিং আর ওর ভিনাসের সাহায্য নেব।'

অসহায়ের মত রায়হান কাঁধ ঝাঁকাল। 'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, মাসুদ ভাই। এই কোডটা আমি চিনি, এটা সম্পর্কে জানি। কম্পিউটার জগতের সবচেয়ে জটিল কোড—একেবারে অদ্বিতীয় বলতে পারেন। ভিনাস কেন, তার চেয়ে উন্নত কোনও কম্পিউটার দিয়েও ওটা ভাঙা যাবে না। সারা পৃথিবীতে মাত্র দশজন মানুষ এর ব্যবহার জানে। শুধু তারাই পারে এই কোডের মর্মোদ্ধার করতে, অন্য কেউ না।'

'আর তুমি তাদের একজন নও?'

হেসে উঠল রায়হান। 'হতে পারলে বর্তে যেতাম, মাসুদ ভাই। সাইবার জগতের ঈশ্বর হয়ে যেতে পারতাম!'

রানার চেহারায় বিরক্তি ফুটল। 'তোমার কথাবার্তা হেঁয়ালির মত ঠেকছে। নিজে যদি না-ই পারো, তা হলে ডিজিটগুলো পড়লে কীভাবে?'

'ওই দশজনের একজনকে আমি চিনি। তিনিই আমাকে মৌলিক কয়েকটা জিনিস শিখিয়েছেন। ভাগ্যের জোরে সংখ্যাগুলো চিনতে পেরেছি, অন্য কোনওভাবে লিখলে তা-ও পারতাম না।'

'তা হলে কোড ভাঙার জন্য ওই মানুষটাকেই খবর দাও!'

'ভদ্রলোক যে কোথায় আছেন, জানা নেই আমার।'

'খুঁজে বের করা যাবে। তুমি নামটা দাও।'

'ঠিক আছে,' বলে নোটপ্যাডের উপর ঝুঁকল রায়হান, কলম চালাতে গিয়ে থমকে গেল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে—দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কী হলো, থামলে কেন?'

'বিকল্প একটা উপায় আছে, মাসুদ ভাই!' খুশি খুশি গলায় বলল তরুণ হ্যাকার, আঙুল তুলল মনিটরের দিকে। 'এটা স্রেফ একটা প্রোগ্রাম, টাইম মিলিয়ে কমাণ্ড অনুসারে কাজ করবে। আমরা যদি কম্পিউটারের ঘড়িটা নব্বুই ঘণ্টা এগিয়ে দিই...'

'...তা হলেই ফলাফলটা এক্ষুণি দেখতে পাব,' বুঝতে পেরে বলে উঠল রানা। মুখে হাসি ফুটল ওর, কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞের পিঠ চাপড়ে দিল। 'চমৎকার বুদ্ধি, রায়হান। ডু ইট—করো দেখি।'

চেয়ার টেনে বসল রায়হান, পাশে রানা। কী-বোর্ডে দ্রুত কিছু টাইপ করল ছেলেটা, তারপর *এন্টার* বাটন চেপে হেলান দিল। বলল, 'পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে জানা যাবে ব্যাপারটা।'

উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুরু হলো অপেক্ষা। সামান্য এটুকু সময়ও যেন কাটছে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল রানা—এগোচ্ছে সেকেণ্ডের কাঁটা।

পাঁচ।

চার।

তিন।

দুই।

এক!

উত্তেজনায় স্ক্রিনের উপর ঝুঁকল দুজনেই। কিন্তু না, কিছুই ঘটছে না। কয়েক সেকেণ্ড কাটল এভাবে, তা-ও সব আগের মত।

'আশ্চর্য তো!' বিস্ময়ে বিড়বিড় করল রায়হান।

'কেন, কী হয়েছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'কিছু হয়নি, সেটাই অবাক ব্যাপার। হুঁ, স্মার্ট... ভেরি স্মার্ট!'

'কীসের কথা বলছ?'

'কমাণ্ডটা—আমরা যেভাবে জোচ্চুরি করেছি, তাতে যেন কাজ না হয়, সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। প্রোগ্রামার যে-ই হোক, তার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়।'

'তার মানে পুরো নব্বুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'এত সহজে হার মানছি না,' উৎসাহী দেখাচ্ছে রায়হানকে, একটা চ্যালেঞ্জ পেয়েছে সে, চোখেমুখে উত্তেজনা ফুটেছে তাই। 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

টানা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল ও, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। শেষে হাসি ফোটাল মুখে। বলল, 'আমি জানি কী করতে হবে। ভুলটা হয়েছে এক লাফে নব্বুই ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে। এভাবে না, প্রত্যেকটা সেকেণ্ড ধরে এক-এক করে এগিয়ে যেতে হবে। প্রোগ্রামটাকে ভাবতে দিতে হবে যে—সত্যিই সময়টা পার হয়েছে।'

'সেটা কীভাবে করা সম্ভব?' রানা জানতে চাইল।

'ছোট্ট একটা সাব-প্রোগ্রাম লিখতে হবে আমাকে, যেটা কম্পিউটারের ভিতরের ঘড়িটাকে রিপ্লেস করবে,' ব্যাখ্যা করল রায়হান। 'ওটা হবে একটা অ্যাকসিলারেটেড ক্লক, খুব দ্রুত সময়কে নব্বুই ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে যাবে। সিগনালের প্রোগ্রামটাকে আর সবকিছু থেকে আইসোলেট করে আমার তৈরি করা ঘড়িটার সঙ্গে বাইপাস করে দেব। ফলে সময় সংক্রান্ত তথ্য শুধু ওখানটা ছাড়া আর কোথাও থেকে পাবে না ওটা, সত্যি সত্যি মনে হবে নব্বুই ঘণ্টা সময় পেরুচ্ছে।'

'এতসব টেকনিক্যাল কথাবার্তা বুঝতে পারছি না,' সাফ সাফ বলে দিল রানা। 'শুধু এটুকু বলো, কমাণ্ডটার অর্থ বের করতে পারবে কি না।'

'চমৎকার সম্ভাবনা আছে, মাসুদ ভাই,' রায়হান বলল। 'আমি কনফিডেন্ট।'

'সাব-প্রোগ্রামটা লিখতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশি না, বড়জোর আধ ঘণ্টা। আপনি চাইলে অফিসে গিয়ে কাজ করতে পারেন। রেডি হলে আমি খবর দেব।'

উঠল না রানা, কী এক আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেছে, শেষটা না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না। ওদিকে কী-বোর্ডে ঝড় তুলেছে রায়হান, যন্ত্রের মত দ্রুত লিখতে শুরু করেছে সাব-প্রোগ্রামটা, স্ক্রিনে চোখের পলকে ফুটে উঠছে একটার পর একটা লাইন, তাকে আদৌ কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে কি না সন্দেহ। অভিভূত হয়ে দৃশ্যটা চাক্ষুষ করল রানা, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো—ছেলেটা সত্যিই একটা প্রতিভা! সামান্য ভুলে বিপথে চলে গিয়েছিল, সময় থাকতেই বিসিআই নাক গলানোয় বেঁচে গেছে। নইলে এতদিনে জেলে পচত, আর না হয় মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের হাতের পুতুল হয়ে জীবন কাটাত। সোনার বাংলাদেশে ওর মত

আরও কত প্রতিভা সামান্য দিক-নির্দেশনার অভাবে ঝরে যাচ্ছে! যদি পারত, তা হলে দেশটার তরুণ সমাজের একজনকেও নষ্ট হতে দিত না ও। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যদ্দূর সম্ভব, তার একটুও বাকি রাখছে না রানা। ইতোমধ্যে রায়হানের মত বেশ কিছু তরুণকে বিসিআই এবং রানা এজেন্সিতে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে ও, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় অর্থকষ্টে ভোগা বাঙালি ছাত্রদেরও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। কিন্তু দেশের বিশাল তরুণ সমাজের তুলনায় তা আর কতটুকুই বা!

রায়হানের ডাকে সংবিৎ ফিরল রানার।

'হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই।'

ঘড়ি দেখল রানা, আধঘণ্টা চাইলেও বাস্তবে তার প্রায় অর্ধেক সময়ে কাজটা সেরে ফেলেছে ছেলেটা। মুগ্ধ হয়ে ও বলল, 'বাহ্, মাত্র সতেরো মিনিট! তুমি তো দেখছি দারুণ করিৎকর্মা হে!'

লজ্জিত হাসি হাসল রায়হান, সামনাসামনি প্রশংসায় অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। বিনয় করে বলল, 'কী যে বলেন না! আসলে কাজটা বেশি ঝামেলার ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। শুরু করার আগে ভাবিনি এত সহজ হবে।'

'এখন এক্সপেরিমেন্টটা চালানো যাবে তো?'

'এক মিনিট,' বলে শেষ মুহূর্তে কিছু চেক করল রায়হান, সন্তুষ্ট হয়ে ফিরল রানার দিকে। 'হ্যাঁ, সব রেডি।'

'তা হলে শুরু করো তোমার ঘড়ি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এন্টার বাটন চাপল রায়হান, সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে উঠল একটা ডিজিটাল ঘড়ি—এখনকার সময় আর তলায় আজকের তারিখ দেখাচ্ছে। দ্বিতীয়বার এন্টার চাপতেই অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে বাড়তে লাগল সেকেণ্ড আর মিনিটের সংখ্যা, খালি চোখে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না—পরিবর্তনটা এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে।

boiRboi.net

'টার্গেট টাইমে পৌঁছুতে বিশ সেকেণ্ড লাগবে,' বলল রায়হান।

চোখের পলকে বাড়ল ঘন্টা, তারিখও বদলাতে সময় লাগল না। হাতঘড়িতে চোখ রেখে টাইমিং মেলাচ্ছে তরুণ হ্যাকার। ঘোষণা করল, 'আর পাঁচ সেকেণ্ড...চার...তিন...দুই...এক... এখন!'

এরপর যা ঘটল, তার জন্য তৈরি ছিল না ওদের কেউই। স্ক্রিনের ঘড়িটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে থেমে গেল, নরক দক্ষযজ্ঞের সূচনাটা হলো তখনই।

স্ক্রিনে এতক্ষণ ধরে ভাসতে থাকা সবকিছু অদৃশ্য হলো প্রথমেই, সে-জায়গাটা দখল করল নানা রকম আঁকিবুকি আর জ্যামিতিক নকশা—প্রতি মুহূর্তে চেহারা পাল্টাচ্ছে। ভ্রূ কুঁচকে ফেলল রায়হান, ওর মুখের ভাব দেখে রানা বুঝল, কোথাও গোলমাল হয়েছে। কথা বলার সুযোগ পেল না ও, চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা, ছোটাছুটি করে রুমের বাকি কম্পিউটারগুলো চেক করল—সবগুলোর পর্দায় একই কাণ্ড ঘটছে।

'ও মাই গড!' মাথায় হাত দিল রায়হান।

কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না রানা, স্পীকারে ভেসে আসা একটা ধুমধাড়াক্কা বাজনা শুনে থমকে গেল ও। চোখ ফেরাতেই দেখল, নকশা অদৃশ্য হয়েছে স্ক্রিন থেকে, সেখানে টকটকে লাল হরফে ভেসে উঠল একটামাত্র বাক্য:

ইউ আর ডুমড্!

ওটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পীকারে শোনা গেল পুরনো আমলের সিনেমার ভিলেনদের খনখনে হাসি—'হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হা!'

পরমুহূর্তে পায়ের কাছে কম্পিউটারের সিপিইউ-তে ছোট একটা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল মনিটরের পর্দা, ইনপুট হারিয়েছে। চারপাশে তাকাতেই রানা বুঝল, শব্দ আসলে একটা নয়, কয়েকটা হয়েছে; একসঙ্গে হওয়ায় আলাদা করা যায়নি। নাকে পোড়া গন্ধ ঢুকল ওর, আর তার পরপরই একযোগে সব সিপিইউ-র পিছন দিয়ে তীব্রভাবে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এল, তার ভিতর বিকট আওয়াজে ফট ফট করে ফাটছে একেকটা যন্ত্রাংশ। কম্পিউটার উইং চোখের সামনে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা বনে গেছে রায়হান, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়া ছড়ানো কম্পিউটারগুলোর দিকে। কিন্তু রানা উপস্থিতবুদ্ধি হারাল না, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে...লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'রায়হান! পাওয়ার কানেকশন! সবগুলোর পাওয়ার কানেকশন কেটে দাও!'

এবার নড়ে উঠল রায়হান, ছুট লাগিয়ে টেবিলের সারির উল্টোপাশে চলে এল রানার পিছু পিছু। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এল ওরা, তা সফল হলো না। হাত বাড়িয়েই থমকে গেল দু'জনে, তীব্র উত্তাপে গলে গেছে সমস্ত ইলেকট্রিক কর্ডের ইনসুলেশন, তামার তার বেরিয়ে গেছে। ধরতে গেলে শুধু যে শক খেতে হবে, তা-ই নয়, হাতও পুড়ে যাবে।

'মেইন সুইচ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'মেইন সুইচ বন্ধ করতে হবে! কোথায় ওটা?'

'এলিভেটরের পাশে, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে।'

ছুট লাগাল রানা। এই সময় তীব্রস্বরে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম, ছাতে লাগানো স্মোক-ডিটেক্টর ধোঁয়ার স্পর্শ পেয়েই

boiRboi.net

চালু করে দিয়েছে সতর্ক-সঙ্কেত। দরজা খুলে কয়েক পা যেতেই মাথার উপর সক্রিয় হয়ে উঠল স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম, ঝাঁঝরির মত ছিটাতে শুরু করল পানি—পুরো ফ্লোর জুড়ে। যেসব শ্রমিক ইন্টেরিয়রের কাজ করছিল, তাদের আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালাতে দেখল ও, অন্যান্য ফ্লোরেও নিশ্চয়ই একই কাণ্ড ঘটছে। এজেন্সির অপারেটররা ছোটাছুটি না করলেও বিহ্বল হয়ে গেছে। আচমকা আগুন লাগার কোনও আশঙ্কাই ছিল না তাদের মধ্যে, তাই মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। নাফিজের হাঁকডাক শোনা গেল—ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর দাঁড়ি-কমাসহ অনুসরণ করছে সে, গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র আর ইকুইপমেন্ট সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছে।

সময় নষ্ট করল না রানা, পানির ধারাগুলো ভেদ করে দৌড়াতে থাকল। এলিভেটরের বাঁয়ে করিডরের শেষ প্রান্তে স্টেয়ারওয়েলে যাবার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল ল্যান্ডিঙে। এক টানে দেয়ালে লাগানো সুইচবক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল ও, প্যান্টে হাত মুছে টান দিল সার্কিট ব্রেকারে। অ্যালার্মের গগনবিদারী আওয়াজ থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে অফিসে ফিরে এল রানা, কম্পিউটার উইঙে পা দিয়েই দেখতে পেল রায়হানের বিষণ্ণ চেহারা—মেঝেতে গড়াতে থাকা পানি আর পোড়া কম্পিউটারের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা। তাকে ঘিরে রেখেছে নাফিজসহ আরও দুজন।

'সরি, মাসুদ ভাই,' মন খারাপ করা গলায় বলল রায়হান। 'আমি কিছুই বাঁচাতে পারিনি। সব গেছে!'

'কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কীভাবে?' রানা নিজেও হতবাক হয়ে গেছে। 'যেভাবে সব ফাটতে শুরু করল...শর্ট সার্কিট ছাড়া সম্ভব

boiRboi.net

না। এই বিল্ডিঙে এ-ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঠেকাবার ব্যবস্থা নেই?'

'আছে, আমি নিজে সবকিছু চেক করে ফ্লোরটার বুকিং দিয়েছি,' নাফিজ জোর গলায় বলল।

'তা হলে কাজ করল না কেন?'

'কারণ এটা কোনও সাধারণ শর্ট সার্কিট ছিল না,' ধীরে ধীরে বলল রায়হান। 'অডিও সিগনালে লুকানো কমাণ্ডটা, মাসুদ ভাই... ওটাই এ-কাণ্ড ঘটিয়েছে। ওটা...ওটা আসলে একটা ভাইরাস। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাস!'

পাঁচ

এক ঘণ্টা পর।

কাঁচঘেরা চেম্বারটায় গম্ভীর হয়ে বসে আছে রানা, টেবিল খালি। স্প্রিঙ্কলারের পানিতে ফাইলপত্র গেছে ভিজে, সেগুলো শুকানোর জন্য নিয়ে গেছে নাফিজের লোকজন, তাই আপাতত কাজ নেই হাতে। নাফিজ গেছে ফায়ার সার্ভিস আর বিল্ডিঙের অন্যান্য ফ্লোরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে। একা একা বসে থাকতে হচ্ছে সে-কারণে। কোথাও যেতেও ইচ্ছে করছে না। ছোটখাট একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে এখানে; কেন সেটা ঘটল আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতখানি—তা না জেনে নড়তে মন সায় দিচ্ছে না। রায়হানকে কিচ্ছু বলেনি ও, কৈফিয়তও শুনতে চায়নি,

boiRboi.net

শুধু বাকি সবার মত ড্যামেজ রিপোর্ট দিতে বলেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সেই থেকে চেম্বারে বসে আছে রানা, চোখের পলকে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা নিয়ে ভাবছে। কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন প্রশ্ন এসে জমা হচ্ছে মনের ভিতর।

রায়হান বলল, কাণ্ডটা ঘটিয়েছে একটা কম্পিউটার ভাইরাস, কিন্তু ওর জানাশোনা কোনও ভাইরাসের সঙ্গে এর মিল পাচ্ছে না। ভাইরাস জিনিসটা কম্পিউটারের ফাইল নষ্ট করে, বড়জোর অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষতিসাধন করে—এর বেশি কিছু না; শর্ট সার্কিট ঘটিয়ে একই সময়ে দশটা কম্পিউটার পুড়িয়ে দেয় না। যত কিছুই হোক, ভাইরাস হলো একটা সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম—সেটা দিয়ে এ-ধরনের ফিজিক্যাল ক্ষতি কীভাবে করা সম্ভব?

গোলমালটা শুধু এখানে নয়, ভাইরাসটার উৎসের ব্যাপারটা আরও বেশি ভাবাচ্ছে ওকে। নাসার কম্পিউটারে পাওয়া গেছে ওটা, ডিপ স্পেস প্রোবে রিসিভ করা একটা বহির্বিশ্বের সিগনালের ভিতরে। রায়হানের ধারণা ওটা ভাঁওতাবাজি নয়, সত্যিই সৌরজগতের বাইরে থেকে এসেছে সিগনালটা। তার মানে কি ভাইরাসটা ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের তৈরি? সেজন্যেই এতটা ক্ষতি করতে পেরেছে? কিন্তু কেন তারা এমন একটা ভাইরাস পৃথিবীতে পাঠাতে যাবে? মতলবটা কী? পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে? এটা কি তবে গ্রহান্তরের আগ্রাসনের পূর্ব-সঙ্কেত?

হেসে ফেলল রানা। কী সব ভাবছে! এটা কোনও সায়েন্স ফিকশনের গল্প নয়, রূঢ় বাস্তব। ভিনগ্রহবাসীরা নয়, কুকীর্তিটা করেছে পৃথিবীরই কোনও দু'পেয়ে জীব—এ ব্যাপারে ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই। কীভাবে কাজটা সারা হয়েছে, সেটাই প্রশ্ন।

boiRboi.net

কম্পিউটার ভাইরাস জিনিসটা মানুষের আবিষ্কার, আর সেটা ছড়িয়ে মজা পায়, এমন দুষ্ট প্রোগ্রামার আর হ্যাকারের কোনও অভাব নেই দুনিয়ায়। বিশেষ করে ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট হবার সময় স্ক্রিনে ভেসে ওঠা ইউ আর ডুমড্ আর সিনেমার ভিলেনের খনখনে হাসি অল্পবয়েসী হ্যাকারদের রসিকতা হিসেবেই বেশি মানানসই, ভিনগ্রহবাসীদের নয়। এসব দুষ্ট হ্যাকারদের কারণে গত পনেরো বছরে কম্পিউটার জগৎ বেশ কয়েকবার বড় ধরনের ভাইরাস-আক্রমণের শিকার হয়েছে। এসবের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, স্রেফ মজা করার জন্য ছড়ানো হয়েছিল ভাইরাস। এটাও সম্ভবত তেমন কিছু।

তবে এবারকার ক্ষয়ক্ষতির সীমা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে—ধ্বংসযজ্ঞটা দেখার পর তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। সৌভাগ্যক্রমে রায়হানের মত কৌতূহলী এবং দক্ষ একজন কম্পিউটার-বিশারদ হাতের কাছে থাকায় ব্যাপারটা আগেই টের পাওয়া গেছে। চারদিনের মত সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে।

মাঝখান থেকে রানা এজেন্সির দশটা কম্পিউটার নষ্ট হলো আর কী! রায়হানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, রানা চাপাচাপি করাতেই ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট করেছিল ও। নইলে হয়তো সময় পেলে গবেষণা করে প্রোগ্রামটার আসল উদ্দেশ্য বের করে ফেলতে পারত ছেলেটা, সেই কোডব্রেকার লোকটাকেও খুঁজে নিয়ে আসা যেত।

দরজায় শব্দ হতেই চিন্তায় ছেদ পড়ল। রায়হান উঁকি দিচ্ছে। 'আসতে পারি?' অনুমতি চাইল সে।

'এসো।'

মুখোমুখি এসে বসল তরুণ হ্যাকার, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ,

boiRboi.net

যেন ঝড় বয়ে গেছে। তারপরও ওর মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ করা গেল। বলল, 'ডি-ব্রিফিঙের জন্য আমি তৈরি, মাসুদ ভাই।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

'আমার পার্সোনাল ল্যাপটপটা ব্যবহার করেছি, তাই তাড়াতাড়ি হলো। ভাগ্যক্রমে ওটা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড ছিল না, বেঁচে গেছে।'

'হুঁ। কী জানতে পারলে?'

'ভাইরাসই ওটা। ইউনিক...ওয়ান অভ আ কাইণ্ড। অত্যন্ত শক্তিশালী।'

'কিন্তু একটা ভাইরাসের পক্ষে কীভাবে কম্পিউটার পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন। সফটওয়্যার দিয়ে হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করা যায় না...সাধারণত। তবে ব্যাপারটা যে পুরোপুরি সত্যি নয়, সেটার প্রমাণ ১৯৯৯ সালে পাওয়া গেছে। সিআইএইচ ভাইরাসের নাম শুনে থাকবেন হয়তো, ২৫শে এপ্রিল তারিখে সারা পৃথিবী জুড়ে আঘাত হেনেছিল ওটা। সেবারই প্রথম জানা গেল, সফটওয়্যার দিয়ে হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করা যায়। তবে সিআইএইচ শুধু মাদারবোর্ডের ইন্টারনাল মেমোরি ধ্বংস করে দিতে পারত।'

'আর আজ যেটা দেখলাম?'

'সিআইএইচের চেয়ে কয়েক গুণ উন্নত এটা। কীভাবে করেছে জানি না, তবে সিপিইউ-র ভিতরে যত সার্কিট আছে, সবগুলোর ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স বাইপাস করে দিয়েছে এটা, ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে ওগুলোর মধ্য দিয়ে, পুড়ে গেছে সেজন্যই।'

'এটা কি আদৌ সম্ভব?' রানার খটকা লাগছে।

boiRboi.net

'থিয়োরিটিক্যালি...হ্যাঁ। তবে বাস্তবে পারা যাবে কি না, সন্দেহ আছে। ব্যাপারটা অনেকটা টাইম-ট্র্যাভেলের মত, তাত্ত্বিকভাবে করা যায়, কিন্তু সত্যি সত্যি করা সম্ভব নয়। এই রকম শক্তিশালী কমাণ্ড তৈরির মত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখনও আবিষ্কার হয়নি। এটা আমাদের চেয়ে কয়েক জেনারেশন উন্নত প্রযুক্তি।'

পুরনো ভাবনাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রানার ভিতরে। 'তুমি বলতে চাইছ—এটা একটা অ্যালিয়েন টেকনোলজি?'

'উঁহুঁ, তা-ও বলছি না,' রায়হান মাথা নাড়ল। 'এতক্ষণ যেটা বললাম, তা হলো অফিশিয়াল ভার্শান। আনঅফিশিয়ালি জেনে রাখুন—শক্তিশালী ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সত্যিই আবিষ্কার হয়েছে, তবে সেটার প্রমাণ নেই কোথাও।',

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিছু একটা চেপে যাচ্ছ তুমি আমার কাছে।'

'তা হলে আপনাকে একটা গল্প শুনতে হবে। ব্যাপারটা একটা কিংবদন্তি...আমাদের কম্পিউটার জগতের আর্বান লেজেণ্ড বলতে পারেন। আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগে...সঠিক সময়টা বলতে পারব না...দশজন অসম্ভব প্রতিভাবান কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ মিলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার কোড তৈরি করেন। সাধারণত কম্পিউটারের মৌলিক ভাষাটা হলো বাইনারি কোডের—কী-বোর্ড বা মাউসে আমরা যা-ই করি না কেন, কম্পিউটার সেটাকে নিজের মৌলিক ভাষায় এক আর শূন্যতে অনুবাদ করে নেয়। এই দুটো সংখ্যার নানা রকম ভেরিয়েশন দিয়েই সে প্রতিটা কমাণ্ড বোঝে। কিন্তু আমাদের সেই বিজ্ঞানীরা যে কোডটা বানালেন, সেটা আরও মৌলিক—শূন্যের কোনও স্থান নেই তাতে; শুধু এক আছে—ওটা ছিল একটা

সিঙ্গুলার কোড।'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এক মিনিট...শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে কীভাবে পুরো কোড বানানো সম্ভব হলো? অন্তত দুটো এলিমেন্ট না থাকলে তো কোনও পারমিউটেশন বা কম্বিনেশন করা যায় না।'

'একটা সংখ্যা দিয়েই সেটা সম্ভব করলেন তাঁরা। একেকবার সংখ্যাটার স্থায়িত্বের কমবেশি আর ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ দিয়ে ভেরিয়েশন আনা হলো—পদ্ধতিটা খুব জটিল, আমি ঠিকমত বোঝাতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তারপর কী ঘটল—সেটা বলো।'

'যা হবার তা-ই,' রায়হান আবার খেই ধরল। 'ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মৌলিক কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে পরিণত হলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? পরিচিত বাইনারি কোডের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত ওটা, একটা মাত্র সংখ্যা নিয়ে কাজ করে। বাইনারি কোডে তৈরি যে কোনও সিস্টেম ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, প্রচলিত সমস্ত প্রোগ্রামই ওটার সামনে ঠুনকো কাঁচের মত। ছোটখাট দু-এক জায়গায় এই নতুন কোডটার প্রয়োগ ঘটিয়েই থেমে গেলেন আমাদের সেই দশ জিনিয়াস।'

'কেন?' রানা জানতে চাইল।

'হাজারটা জটিলতার কারণে। ওই সময়ের সামগ্রিক কাঠামোয় বাইনারি কোডকে এটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব ছিল না...কে জানে, হয়তো এখনও নয়। আমাদের পুরো কম্পিউটার জগৎটা শুরু থেকে গড়ে উঠেছে বাইনারি কোডের উপর ভিত্তি করে। এটাকে সমূলে একটা নতুন কোড দিয়ে রিপ্লেস করতে গেলে পুরো প্রযুক্তিটাই একেবারে গোড়া থেকে ঝাঁকি খাবে। এতদিন ধরে এই ফিল্ডে যত আবিষ্কার আর অগ্রগতি হয়েছে,

সেগুলোকে নতুন এই ভাষায় ট্রান্সফার করা, পুরো দুনিয়াকে নতুন কোডটা শেখানো—সব মিলিয়ে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। আর এই সিঙ্গুলার কোডটাও এত জটিল যে, সেটা শেখানো আর তাতে সবাইকে অভ্যস্ত করে তুলতে দীর্ঘ একটা সময় ব্যয় হয়ে যাবে। অন্তর্বর্তী সময়টাতে কম্পিউটার-বিজ্ঞানে হয়তো নতুন কোনও আবিষ্কারও আর করা যাবে না, কারণ ভাষাটায় অভ্যস্ত না হলে বিজ্ঞানীরাও তা নিয়ে কাজ করতে পারবেন না।'

'তাই বলে এত উন্নত একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে হবে?'

'ঠিক ফেলে দেয়া হয়নি, মাসুদ ভাই,' রায়হান বলল। 'সেই দশ জিনিয়াস ঠিক করলেন—এটা এখুনি চালু করার সময় হয়নি। বিস্তর গবেষণা আর ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন আছে, যাতে কোডটাকে আরও সহজ করে তোলা যায়...একটা ব্যাকরণ জাতীয় কিছু প্রণয়ন করা যায়, যাতে মানুষ সহজে ওটা শিখতে পারে। সেই সঙ্গে তাঁরা একটা প্রসেস বের করার চেষ্টা চালালেন, যাতে এতদিনের বাইনারি-বেসড কম্পিউটার-জগৎটাকে খুব সহজে এবং কম সময়ে সিঙ্গুলার কোডে ট্রান্সফার করা যায়। বলে রাখা ভাল, আজ পর্যন্ত সফল হননি তাঁরা।'

'হুঁ, মাত্র দশজনে এত বড় কাজ করতে চাইলে তো এই অবস্থা হবেই। কিন্তু এত রাখঢাকের কারণ কী—তা-ই বুঝতে পারছি না। ওঁরা বিষয়টা প্রকাশ করে দুনিয়ার তাবৎ কম্পিউটার-বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিলেন না কেন?'

'সিঙ্গুলার কোডটার অবিশ্বাস্য ক্ষমতার কারণে। ব্যাপারটা আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না? যতক্ষণ না পুরো দুনিয়াকে আপনি এই কোডের আওতায় আনতে না পারছেন, ততক্ষণ ওটা স্রেফ একটা অস্ত্র ছাড়া আর কিছু না। হ্যাকারদের হাতে পড়লে

boiRboi.net

সাইবার-সিকিউরিটি বলতে আর কিছু থাকবে না। বাইনারি কোডে যতই নিরাপত্তা খাড়া করুন, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। ব্যাংক, বীমা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কম্পিউটারাইজড্ ডিফেন্স সিস্টেম পর্যন্ত অসহায় শিকারে পরিণত হবে। এসব ভেবে তাঁরা একটা প্রতিজ্ঞা করলেন—যতদিন না তাঁদের গবেষণা সফল হচ্ছে, ততদিন আর কাউকে কোডটা শেখাবেন না তাঁরা, ওটার কথা কাউকে জানতেও দেবেন না। প্রতিজ্ঞাটা তাঁরা রাখলেন ঠিকই, কিন্তু শুরুতে করা ছোটখাট পরীক্ষাগুলোর কারণে সিঙ্গুলার কোড আবিষ্কারের ঘটনাটা চাপা রইল না, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কম্পিউটার-জগতে। কোডটার একটা নামও দেয়া হলো—ইউনোকোড। স্প্যানিশ ভাষায় *উনো* মানে এক, লেখা হয় হয় ইউ-এন-ও দিয়ে...ওখান থেকেই এসেছে নামটা। সেই দশ স্রষ্টাকে লোকে ইউনো বলে ডাকতে শুরু করল। তবে ওই পর্যন্তই। সেই দশজন ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউ ইউনোকোড শিখতে পারেনি, এমনকী তাদের পরিচয়ও কেউ জানে না। একটা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন ইউনোরা, আমরা মনে করি—তাঁরা সাইবার জগতের ঈশ্বর, তাঁদের মত দক্ষ এবং শক্তিশালী প্রোগ্রামার পৃথিবীতে আর কেউ নেই।'

লম্বা গল্পটা শেষ করে দম নেয়ার জন্য থামল রায়হান।

রানা প্রশ্ন করল, 'আমাদের বর্তমান সমস্যাটার সঙ্গে তোমার এই ইউনোকোডের সম্পর্ক কী?'

'ভাইরাসটা...ওটা ইউনোকোডে তৈরি,' বলল রায়হান। 'সে-কারণেই এত শক্তিশালী। কীভাবে দশ-দশটা কম্পিউটার ধ্বংস করে দিল, দেখলেন না? ভাগ্যিস, নতুন করে সেটআপের কাজ চলছে বলে আমরা বাইরের কোনও নেটওয়ার্কে যুক্ত ছিলাম না। নইলে ওটার সঙ্গে সংযুক্ত যত কম্পিউটার পেত, সব শেষ

করে দিত। আর যদি ইন্টারনেটের সার্ভার কম্পিউটারগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে তো কথাই নেই। চোখের পলকে গোটা পৃথিবীর নব্বুই ভাগ কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'কী বলছ! এতই শক্তিশালী? কোনও রকম সিকিউরিটি দিয়ে ঠেকানো যায় না?'

'যাবে, যদি সেই সিস্টেমটাও ইউনোকোডে তৈরি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন জিনিস আমাদের কারও হাতে নেই।'

রানা বাঁকা চোখে তাকাল। 'তুমি এখনও সব খোলাসা করছ না। ইউনোকোডটা যদি এতই গোপন একটা ব্যাপার হয়ে থাকে, তা হলে তুমি ওটা সম্পর্কে এতকিছু জানলে কেমন করে? দেখামাত্র চিনলেই বা কীভাবে? একজন লোক কোডটা ভাঙতে পারবে বলেছিলে...সে কে? একজন ইউনো?'

'জী, মাসুদ ভাই,' ইতস্তত করে বলল রায়হান। 'আমি একজন ইউনোকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর নাম ড. স্ট্যানলি ডোনেন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে আমার শিক্ষক ছিলেন। এতক্ষণ যা বললাম, সব ওঁর কাছেই শোনা। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন, পছন্দ করতেন, আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর। তিনি যে একজন ইউনো, সেটা ঘটনাক্রমে জেনে ফেলি আমি, কোডটা শেখার জন্য তাঁর পিছনে লেগে যাই। শেষ পর্যন্ত আমাকে ইউনোকোডের মৌলিক কয়েকটা ব্যাপার শিখিয়েছেন তিনি, তবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখাতে রাজি হননি। প্রতিজ্ঞায় অটল তিনি, যতদিন না সব সমস্যা মিটিয়ে আনতে পারছেন, ততদিন কাউকে ইউনোকোডে প্রোগ্রামিং শেখাবেন না। আমার কাছ থেকেও কথা আদায় করে নিয়েছেন, কাউকে যেন তাঁর পরিচয় না জানাই। এখন নেহায়েত এত বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলেই বললাম, নইলে আপনাকেও ব্যাপারটা জানাতাম না।'

'বিশাল সমস্যা তো বটেই,' রানা বলল। 'সিগনালটা নাসার কম্পিউটারে আছে, সেখান থেকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'বেশ ভাল সম্ভাবনা আছে,' রায়হান স্বীকার করল।

'সর্বনাশ! তা হলে তো মোটামুটি একটা প্রলয় ঘটতে যাচ্ছে। কী করা যায়? ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট হবার সময়টায় কম্পিউটার অফ রাখলে হয় না?'

'উঁহুঁ, ডেডলাইন পেরুনোর পর ওটা সচল হয়ে ওঠে। নব্বুই ঘণ্টা পার হবার পর যখনই কম্পিউটার অন করা হোক, তখনই ওটা হামলা চালাবে। তা ছাড়া কতগুলো কম্পিউটারে ভাইরাসটার কপি ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে, তা জানি না আমরা: যদি স্পেসিফিক্যালি ওই কম্পিউটারগুলো বন্ধ রাখা যেত, তা হলে একটা কথা ছিল... নইলে একসঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার বন্ধ করে দিতে হবে। সেটা কি সম্ভব? ভুলক্রমে একটাও যদি অন থাকে, তা হলেই সব শেষ। ইন্টারনেটে সংযুক্ত সব কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'বুঝতে পারছি,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'প্রলয় বলছি সেজন্যেই। সব কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানে তো পৃথিবীকে ঠেলে প্রস্তরযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া!'

'সেটা বোধহয় হবে না,' রায়হান দ্বিমত পোষণ করল। 'আমেরিকাসহ পৃথিবীর যত দেশ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, তারা কখনও নিজেদের সিস্টেমকে সরাসরি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটে যুক্ত করে না, তা ছাড়া ব্যাকআপও থাকে। ইউনোকোড যতই শক্তিশালী হোক, বাতাসে তো আর ভাসতে পারে না। এ-ধরনের বিচ্ছিন্ন একটা নেটওয়ার্কে ঢুকতে গেলে ওটাকে একটা প্রবেশপথ পেতেই হবে।'

boighar.net

'তারমানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি নিরাপদ বলতে চাইছ?'

'হুঁ, তবে তাতে বিশেষ কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি এখন চলে কম্পিউটার দিয়ে। ভাইরাসের আঘাতে সেসবের আর অস্তিত্ব থাকবে না। অর্থনীতি ভেঙে পড়লে শুধু প্রতিরক্ষা দিয়ে আর কী লাভ হবে?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে রানা। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় চমকে উঠল। বলল, 'প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নিরাপদ নয়, রায়হান। কী বলেছিলে, ভুলে গেছ? অডিও-সিগনালটা রিসার্চের দায়িত্ব নিয়েছে আমেরিকান এয়ারফোর্স, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের টপ-সিক্রেট কম্পিউটারে ওটার অ্যানালিসিস চলছে! হ্যাকিং করে যত দেশ ওটা সংগ্রহ করেছে, সবাই নিশ্চয়ই একই কাজ করছে। তারমানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে ঢুকে পড়েছে ওটা!'

'তাই তো! ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল রায়হান। 'সেজন্যই... সেজন্যই ওটাকে ভিনগ্রহবাসীদের সিগনালের মত করে ছাড়া হয়েছে! যে ছেড়েছে, সে জান—এমন একটা জিনিস শুধু টপ সিক্রেট কম্পিউটারেই অ্যানালিসিস করা হবে!'

'কিন্তু নাসা ধাপ্পাটা ধরতে পারল না কেন?'

'ইউনোকোড...মাসুদ ভাই। ওটা দিয়ে করা হয়েছে কাজটা, *ভয়েজার-টু* প্রোবের ট্রান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করে পাঠানো হয়েছে সিগনালটা। এই ধরনের হ্যাকিং ডিটেক্ট করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'তারমানে এই ভাইরাসের পিছনে একজন ইউনো জড়িত আছে, এই তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা রীতিমত অস্বাভাবিক ঠেকছে আমার কাছে,' রায়হান মাথা চুলকাল। 'ইউনোরা এমনি এমনি ঈশ্বর

boiboi.net

খেতাব পাননি, তাঁদের কর্মকাণ্ডও এর পিছনে ভূমিকা রেখেছিল। পৃথিবীর সত্যিকার মঙ্গল চান তাঁরা, সেজন্যই ইউনোকোডকে বাইরের লোকের হাতে পড়তে দেননি। আজ এত বছর পর হঠাৎ একটা ভাইরাস বানিয়ে ছাড়তে যাবেন কেন—এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়,' বলল রানা। 'ভালমানুষেরা হঠাৎ খেপে গেলে কী ঘটে, তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। নিশিকাওয়া ফাকুদা নামে এক জাপানি বিজ্ঞানীকে চিনি আমি, অসম্ভব প্রতিভাবান আর নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু বছরখানেক আগে সব হারানোর বেদনায় রেগে গিয়ে সাগরের পানিতে সর্পলতা নামে এক জিনিস ছেড়ে দিয়ে পুরো পৃথিবীটাই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন প্রায়।'

'আপনিই তো ঠেকিয়েছিলেন তাঁকে, তাই না? ঘটনাটা আমি শুনেছি। ভাবছেন এখানেও তেমন কিছু ঘটেছে? ইউনোদের কেউ একজন খেপে গিয়ে সাইবার-বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে?'

'ভাইরাসটা যেহেতু ওই দশজন ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারে না, সেক্ষেত্রে এই একটা ব্যাখ্যাই থাকে।'

'আমার কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছে না,' রায়হানের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না,' রানা জোর দিয়ে বলল। 'সমস্যাটা খুবই গুরুতর, আমাদের কিছু একটা করতে হবে।'

'ইউনোকোডের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের একজন ইউনো লাগবে, মাসুদ ভাই।'

'ঠিক বলেছ। তোমার ওই টিচার...ড. ডোনেন...তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে না?'

boirboi.net

'হয়তো যাবে। কিন্তু তাঁকে পাচ্ছি কোথায়? আমি আমেরিকায় পৌঁছেই স্যরকে ফোন করেছিলাম, পাইনি। ভার্সিটি থেকে বলল, দু'মাস আগেই নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। স্যর বিপত্নীক, ছেলেমেয়ে নেই, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও তেমন একটা মেশেন না। তাই কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারছে না।'

'ইচ্ছে করে গায়েব হয়ে গেছেন?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'ভদ্রলোক নিজেই এই ভাইরাসটা ছড়াননি তো?'

'অসম্ভব!' রায়হান দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ করল। 'স্যরকে আমি খুব ভাল করে চিনি। তিনি আর যা-ই হোন, পৃথিবী ধ্বংস করে দেবার মত উন্মাদ নন।'

'এখুনি মন্তব্য করা ঠিক হবে না,' রানা শান্তস্বরে বলল। 'আগে ওঁকে খুঁজে তো বের করি!' ইন্টারকমের রিসিভার তুলে বোতাম টিপল ও। 'নাফিজ, ড. স্ট্যানলি ডোনেন নামে এক ভদ্রলোককে লোকেট করতে হবে—তিনি প্রিন্সটনের কম্পিউটার সায়েন্সে অধ্যাপনা করতেন। যেখানে যত সোর্স আছে, সব কাজে লাগাও। এটা একটা ইমার্জেন্সি।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' ওপাশ থেকে বলল নাফিজ।

রিসিভার নামাতেই রায়হান জানতে চাইল, 'আমরা এখন কী করব? চুপচাপ বসে থাকব?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে। দেখি, বিসিআই থেকে একটা জেনারেল অ্যালার্ট প্রচার করা যায় কি না।'

'শুধু অ্যালার্ট প্রচার করে লাভ হবে না,' রায়হান বলল। 'আমাদেরকে একটা বিহিতও বের করতে হবে। লোকজনকে আর কতদিন কম্পিউটার বন্ধ করিয়ে রাখবেন!'

'অন্তত প্রাথমিক বিপর্যয়টা তো এড়ানো যাবে।'

boiRboi.net

'তা-ও যাবে না। এইমাত্র মনে পড়ল, গত বছর দু-দু'বার ইউনো-ভাইরাস আক্রমণ চালাবে বলে গুজব রটেছিল। শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু ঘটেনি। আমরা অ্যালার্ট প্রচার করলে সেটাকেও গুজবই ভাববে লোকে।'

'কে ছড়িয়েছিল ওই গুজব?'

'কেউ জানে না। কেন ছড়াল, তা-ও জানা যায়নি।'

'হুঁ, মূল আক্রমণটার স্টেজিং হিসেবে ছড়ানো হয়নি তো? যাতে এবার সত্যিকার অ্যালার্টেও লোকে গুরুত্ব না দেয়?'

'অসম্ভব কিছু নয়। কারণ শুধু মুখের কথা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই আমাদের কাছে। এটুকুতে দুনিয়ার সমস্ত দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের কমপিউটার নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেবে? কক্ষনো না। তারা চাক্ষুষ প্রমাণ চাইবে। প্রমাণ দেখানো সহজ নয়, আলাদা একটা সাব-প্রোগ্রাম লাগে, দেখলেনই তো!'

'ওটা তুমি তৈরি করে দিলে, তারপর আমরা বিলি করলাম—এমনটা করা যায় না? তা হলে তো সবাই নিজেরাই চেক করে নিতে পারবে।'

'এত সোজা না, মাসুদ ভাই। আমাদেরটা ছোট নেটওয়ার্ক ছিল, তা ছাড়া ওটার সমস্ত খুঁটিনাটি আমি জানতাম, তাই সাব-প্রোগ্রাম বানাতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু যেসব জায়গায় ওটা বিলি করবেন, তাদের নেটওয়ার্ক আর সিকিউরিটি সিস্টেম আলাদা আলাদা রকম হবে। কমন একটা প্রোগ্রাম দিয়ে সব ধরনের সিস্টেমের ইন্টারনাল ক্লক এগিয়ে দেয়া যাবে না।'

'তুমি যদি গাইডলাইন দিয়ে দাও, যার যার নিজস্ব প্রোগ্রামাররা কাজটা করে নিতে পারবে না?'

'প্রোগ্রামটা হয়তো বানাতে পারবে, কিন্তু ইউনো-ভাইরাসের সাথে ব্রিজ করতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজটা খুব জটিল,

boighar.net

ইউনোকোড সম্পর্কে আমি কিছুটা জানি বলে পেরেছি, অন্যেরা এই সুবিধেটা পাবে না।'

'কী! তারমানে তোমাকেই সবখানে গিয়ে কাজটা করে দিয়ে আসতে হবে? আমাদের হাতে এত সময় কোথায়?'

'বললামই তো, এটা একটা বিরাট সমস্যা। শুধুমাত্র অ্যান্টি-ভাইরাস দিয়ে এটার সমাধান করা যেতে পারে—ইউনোকোডের তৈরি অ্যান্টি-ভাইরাস।'

'তারমানে ড. ডোনেন। আপাতত তাঁকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না আমরা, যে এ-কাজ করতে পারে।'

'ঠিক ধরেছেন,' রায়হান একমত হলো।

'কিন্তু তাঁকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তো আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। অন্তত আমেরিকানদের জানাতেই হবে। ওরা কী চিজ জানোই তো! নাইন-ইলেভেনের পর কীভাবে খেপে উঠল, দেখোনি? এবারের ঘটনাটা ঘটলে প্রতিশোধ নিতে আরও ক'টা যে মুসলিম দেশ ছারখার করে দেবে, খোদাই জানে!'

'ব্যাপারটা জানাবেন কাকে? সিআইএ-কে?'

'হুঁ। রেডি হও, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। ওদেরকে হাতে-কলমে ভাইরাসটার কীর্তি দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'

'আমরা কি ল্যাংলিতে যাব—ওদের হেডকোয়ার্টারে?'

'নাহ্, অত সময় নেই হাতে। লস অ্যাঞ্জেলেসে ওদের ব্রাঞ্চ আছে, ওখানেই দেখিয়ে দিয়ে আসব। বাকিটা ওরাই করে নিতে পারবে—যেখানে যেখানে জানাবার দরকার, জানাবে।'

'আমি তা হলে সিডিতে ভাইরাসটার কপি নিয়ে আসি। এখানে ওদের কাছে ওটা না-ও থাকতে পারে।'

'তুমিই বা পাচ্ছ কোথায়?'

'ল্যাপটপে তুলে রেখেছিলাম, অফিস থেকে ফিরেও রিসার্চ

boighar.net

করব বলে।'

'যাও তা হলে। আমি এই ফাঁকে ঢাকায় কথা বলি।'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল রায়হান। রানা পাশ থেকে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে ঘড়ি দেখল। বাংলাদেশে এখন রাত সাড়ে ন'টার মত বাজে। চিফ কি অফিসে, না বাসায়? রাহাত খান অবশ্য বেশ রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করেন, নাফিজকে তাই প্রথমে স্পেশাল সেলফোনের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারেই যোগাযোগ করবার নির্দেশ দিল ও। কপাল ভাল, ইলোরা রিসিভ করল কলটা, তারমানে চিফ এখনও অফিসেই আছেন। কুশল বিনিময়ের সময় নেই, তাই তাড়াতাড়ি বসকে লাইনটা দিতে বলল ও। কয়েক সেকেণ্ড খুটখাটের পর ওপাশ থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

'ইয়েস, এমআরনাইন! অসময়ে হঠাৎ কী মনে করে?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, স্পটলাইটের আলোয় টেবিলের মাঝখানটা কেবল আলোকিত। চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনওরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত, স্যর। তবে বিশাল একটা ক্রাইসিস দেখা দিতে যাচ্ছে আগামী চারদিনের মধ্যে...।' যতটা পারে, গুছিয়ে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল রানা।

সবটা শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন রাহাত খান। শেষে বললেন, 'তুমি শিয়োর?'

'জী স্যর। ভাইরাসটার ক্ষমতা নিজ চোখে দেখেছি আমি।'

boiboi.net

'এটা তো মারাত্মক একটা ক্রাইসিস তা হলে,' বললেন রাহাত খান, গলার স্বরে উদ্বেগটা চাপা রইল না। 'কীভাবে সমাধান করা যায়, কিছু ভেবেছ?'

'একজন ইউনোকে দিয়ে একটা অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করাতে হবে,' রানা বলল। 'আমরা একটা জেনারেল অ্যালার্টও ঘোষণা করতে পারি, তবে তাতে খুব একটা উপকার হবে বলে মনে হয় না।' রায়হানের যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করল ও।

'বুঝতে পেরেছি, তাই বলে তো বসে থাকা যায় না,' রাহাত খান বললেন। 'আমি অ্যালার্ট ঘোষণার ব্যবস্থা করছি, মানুষ অন্তত জানুক ব্যাপারটা।'

'জী স্যর। আর আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে সিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে আসতে চাই।'

'অবশ্যই। ওদের তো জানাতেই হবে। তবে ভাল হত যদি জর্জের মাধ্যমে এগোতে পারতে,' নুমার চিফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা বলছেন রাহাত খান। 'এমন একটা সময়ে ওর হার্ট অ্যাটাক হলো...! যাক, গো অ্যাহেড, এমআরনাইন। আমেরিকানদের ব্যাপারটা জানাবার পর আমি চাই, যে ভাবে হোক, অ্যান্টিভাইরাসটা জোগাড়ের চেষ্টা করবে তুমি। তা ছাড়া কে এই ভাইরাস ছড়াল, তা-ও বের করো। দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস প্রব্লেম। ঠেকানো না গেলে সারা পৃথিবীর পাশাপাশি আমাদের দেশও বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত না হলেও অর্থনীতি, ব্যাংকিং সিস্টেম আর শিক্ষা-দীক্ষার উপর ভয়ানক আঘাত আসবে। থামাও ওটাকে!'

'ইয়েস, স্যর!' বিশ্বস্ত সৈনিকের মত জবাব দিল রানা।

'রায়হান এই পরিস্থিতিতে একটা অ্যাসেট আমাদের জন্য, ওকে কাজে লাগাও। আর হ্যাঁ, সাবধানে থেকো। পুরো ষড়যন্ত্রটার পিছনে যে-ই থাকুক, সে নিশ্চয়ই তোমাদের বাধ দিতে চেষ্টা করবে।'

'আমি চোখ-কান খোলা রাখব, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন।' লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

ছয়

হার্বার ফ্রিওয়ে ধরে উইলশায়ার অ্যাভিনিউ থেকে ডাউনটাউনের বাঙ্কার হিল মাত্র বিশ মিনিটের পথ—ওখানেই ফেডারেল বিল্ডিঙের পনেরো তলায় সি.আই.এ-র লোকাল ব্যুরো অফিস। কিন্তু সকালবেলার রাশ আওয়ারের কারণে পাক্কা পৌনে এক ঘণ্টা লেগে গেল সামান্য পথটুকু পাড়ি দিতে। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেস, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিটিগুলোর একটা; প্রায় তেরো মিলিয়ন মানুষ বাস করে এখানে। সকালে যখন এই বিপুল জনসংখ্যার বড় একটা অংশ কর্মক্ষেত্রে যেতে শুরু করে, তখন রাস্তাঘাটে দেখা দেয় তীব্র যানজট। উনিশটা ফ্রিওয়ে আর আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাবওয়ে সিস্টেম থাকবার পরও পরিস্থিতিটার খুব একটা উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল রানা, ট্রাফিক জ্যাম শুধু বাংলাদেশ নয়,

অ্যামেরিকাতেও আছে।

হাসিটুকু অবশ্য ক্ষণিকের, মাথা থেকে উদ্বেগটা তাড়াতে পারছে না ও, সময় কমে আসছে প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে, ভিতরে ভিতরে তাড়া অনুভব করছে তাই। ড. স্ট্যানলি ডোনেনের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও, কত সময় প্রয়োজন হবে, বলা যাচ্ছে না। অবশ্য সি.আই.এ-কে সমস্যাটার গুরুত্ব বোঝাতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। ওদের সার্চ করার টেকনিক অনেক আধুনিক, বড় বড় বিভিন্ন ডেটাবেজের সাহায্যও নিতে পারে অনায়াসে।

যানজটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর লস অ্যাঞ্জেলেসের ফেডারেল কমপ্লেক্সে পৌঁছুল রানা ও রায়হান। পাশাপাশি পঞ্চাশ ফুট ব্যবধানে যমজ ডিজাইনের বিশতলা-উঁচু দুই টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে—ফেডারেল বিল্ডিং, লস অ্যাঞ্জেলেসের বেশিরভাগ সরকারি ডিপার্টমেন্টের অফিস ঠাঁই পেয়েছে টাওয়ারদুটোয়।

গাড়িটা আন্ডারগ্রাউন্ডে পার্ক করে এক্সপ্রেস এলিভেটরে পনেরো তলায় উঠে এল ওরা। চওড়া করিডর ধরে একটু এগোতেই চোখে পড়ল কাঁচের পাল্লাঅলা বড় দরজা, তাতে সি.আই.এ-র মনোগ্রাম বসানো। তলায় লেখা: *লস অ্যাঞ্জেলেস ব্যুরো।* সুটপরা দুজন এজেন্ট রয়েছে পাহারায়, কোটের বগলের নীচটা সামান্য ফুলে আছে—সশস্ত্র এরা। এগিয়ে যেতেই পথরোধ করল লোকদুটো।

'আই.ডি, প্লিজ!'

নিজের পরিচয় দিল রানা, পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে দেখাল।

'মিস্টার মাসুদ রানা, ডিরেক্টর, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি,' কার্ডটা জোরে জোরে পড়ল প্রথম লোকটা, তারপর মুখ

boiRboi.net

তুলে তাকাল। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, স্যর?'

'আপনাদের ব্যুরো চিফের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ব্যাপারটা জরুরি।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'আমি রওনা হবার পর অফিস থেকে ফোন করে দেবার কথা, দিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'শুধু ফোন করলেই হবে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন কি না, সেটা শিয়োর হয়ে আসা উচিত ছিল।'

'দেখুন, ব্যাপারটা খুব জরুরি,' রায়হান বলল। 'এতসব ফর্মালিটির সময় পাইনি আমরা। আপনারা ভিতরে খোঁজ নিয়ে দেখুন, আপনাদের চিফ নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মি. মাসুদ রানা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে কেউ ফিরিয়ে দেয় না।'

'এসব বলে লাভ নেই,' বলল গার্ড। 'অনুমতি ছাড়া ভিতরে ঢুকতে পারবেন না।'

'অনুমতি আছে কি নেই ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন।'

'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, কেউ আসার কথা থাকলে আমাদের এমনিতেই জানানো হয়।'

'বলতে ভুলে যেতে পারে না?' বলল রানা। 'এক্ষুণি খোঁজ নিন বলছি। ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমাদের দেরি করালে কিন্তু পরে আপনাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে—আগেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল দুই গার্ড। শেষে প্রথমজন বলল, 'ঠিক আছে, দাঁড়ান একটু। আমি খোঁজ নিচ্ছি।' দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল সে, ফিরল মিনিট তিনেক পরে।

'সুসংবাদ। আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন স্যর।'

boirboi.net

পা বাড়াতে গেল রানা, কিন্তু লোকটা হাত তুলে বলল, 'জাস্ট আ মিনিট, স্যর। অফিসে ঢোকার আগে আপনাদের দেহতল্লাশি করতে হবে আমাদের—সেটাই নিয়ম।'

জ্যাকেটের আড়াল থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে দিল রানা। 'তল্লাশির প্রয়োজন নেই, আমার কাছে শুধু এটাই আছে। রায়হান নিরস্ত্র।'

পিস্তলটা নিল গার্ড। 'আগেই জমা দেয়ায় ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখিত, সার্চ আমাদের করতেই হবে।'

বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল রানা, এদের কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। রায়হানকে কথা শোনার ইশারা করে দুই গার্ডের হাতে নিজেকে সঁপে দিল ও। করিডরের দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হলো দুজনকে, হাত-পা ফাঁক করিয়ে দক্ষ হাতে তল্লাশি চালানো হলো শরীরে। ইউনো-ভাইরাসের সিডি আর দুজনের কাছে মোবাইল ফোন, ওয়ালেট ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, জানা কথা—যাবার কথাও নয়। তারপরও হাল ছাড়ল না দুই সি.আই.এ. এজেন্ট, বার বার একই জায়গায় খুঁজে দেখছে। সন্দেহ হলো রানার—ইচ্ছে করেই বোধহয় দেরি করছে এরা। কারণটা কী?

'করছটা কী তোমরা, জানতে পারি?' প্রশ্ন করল ও, সম্বোধনটা এক ধাক্কায় আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে এনেছে। এই ফাজিলদুটোকে সম্মান দেখানোর কোনও মানে হয় না। 'ন্যাংটো করেও দেখবে নাকি? আর কত সার্চ করবে?'

কথাটা শুনে বোধহয় টনক নড়ল দুই প্রহরীর, রানা আর রায়হানকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল। হে হে করে অপ্রস্তুত হাসি হেসে একজন বলল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যর। মাসুদ রানার কীর্তি-কাহিনি কম শুনিনি তো! কী না কী লুকিয়ে রেখেছেন

boiRboi.net

শরীরে...বলা যায় না। তাই শিয়োর হয়ে নিলাম। ব্যাপারটা পিয়োরলি প্রফেশনাল।'

দেয়ালের দিক থেকে ঘুরে সোজা হলো রানা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কিছু লুকিয়ে রেখেছি মানে? তোমরা কি ভাবছ, আমি এখানে কোনওরকম হামলা চালাতে এসেছি?'

অপ্রস্তুত দেখাল গার্ডদেরকে। 'না, না...তা বলিনি তো!'

'তা হলে এভাবে সার্চ করার মানেটা কী?'

'খামোকা রাগ করছেন, স্যর,' বলল দ্বিতীয় এজেন্ট। 'আমরা শুধু আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। আসুন আমার সঙ্গে, নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে।'

'আমাদের জিনিসপত্র ফেরত দাও।'

'ওয়ালেটদুটো আপাতত নিতে পারেন। বাকি জিনিস ফেরার পথে পাবেন। সরি...সিকিউরিটির ব্যাপার, বোঝেনই তো!'

'কিন্তু যে-কাজে এসেছি, তার জন্য সিডিটা আমাদের দরকার।'

'সেটার ব্যাপারে আমাদের ব্যুরো চিফ সিদ্ধান্ত দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা নাহয় আমাদের কাছেই থাক।'

'আর এর মধ্যে যদি মোবাইলে জরুরি কল আসে?'

'কথা বলতে দেয়া হবে, চিন্তা করবেন না।'

কী আর করা, শুধু ওয়ালেট ফেরত নিয়েই লোকটাকে অনুসরণ করে দরজা ঠেলে অফিসের ভিতরে ঢুকল রানা আর রায়হান। সামান্য এগিয়েই চোখে পড়ল রিসেপশন এরিয়া, সেখানে বড় একটা ডেস্ক নিয়ে বসে আছে অল্পবয়েসী এক মেয়ে। ডেস্কটার সামনে পৌঁছে থেমে গেল গার্ড।

'ওয়েলকাম টু সি.আই.এ, মি. রানা অ্যান্ড মি. রশিদ!' হেসে বলল তরুণী, একটা রেজিস্টার ঠেলে দিল।

'এটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'ভিজিটরস্ বুক, স্যর। নাম-ঠিকানা লিখে সই করুন, তারপর পূরণ করে ফেলুন এটা।' ডেস্কের উপর দু'সেট ফর্ম ঠেলে দিল মেয়েটা।

'ওটা আবার কী?'

'পার্টিকুলার্স ফর্ম, স্যর। ভিজিটরদের সমস্ত রেকর্ড রাখার জন্য।'

'ওরেব্বাপরে!' ফর্মটা তুলে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল রায়হান। 'এখানে তো দেখি শুধু আমার না, পুরো চোদ্দপুরুষের ইতিহাস লিখতে হবে!'

'একটু তাড়াতাড়ি করবেন, স্যর,' মেয়েটার মুখে অনাবিল হাসি। 'আপনাদের আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ব্লাড-স্যাম্পল আর ডি.এন.এ-স্যাম্পল দিতে হবে। ছবিও তুলতে হবে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তোমরা কি তামাশা করছ আমাদের সঙ্গে?'

'না স্যর, তামাশা হবে কেন? এটা এখানকার স্ট্যাণ্ডার্ড প্রসিডিওর। ভিজিটর সেজে কেউ ভিতরে ঢুকে যদি স্যাবোটাজ করে রেখে যায়, তা হলে যেন লোকটার সমস্ত রেকর্ড থাকে—সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।'

'ভেবেছটা কী আমাকে? এই প্রথম সি.আই.এ-র ব্রাঞ্চ অফিসে আসিনি আমি, ল্যাংলির হেডকোয়ার্টারেও গেছি। তখন কোথায় ছিল এসব প্রসিডিওর?'

'কোনও কারণে হয়তো আপনার ব্যাপারে শিথিল করা হয়েছিল নিয়মটা,' বলল রিসেপশনিস্ট। 'তবে তখনকার রেফারেন্স দিয়ে লাভ নেই। দুঃখিত, ভিতরে যেতে হলে আপনাদেরকে এখন সব ফর্মালিটি সেরেই যেতে হবে।'

boiRboi.net

কিছু একটা গোলমাল আছে, বুঝতে পারছে রানা। ইচ্ছে করেই ওকে হেনস্থা করছে এরা, ভিতরে যেতে বাধা দিচ্ছে। কারণটা কী, জানতে হবে।

'তো মি. রানা?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'কী ঠিক করলেন? ফর্মালিটি কমপ্লিট করবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

'চলেই যাই, মাসুদ ভাই,' রাগী গলায় বলল রায়হান। 'মরুক এরা...জাহান্নামে যাক!'

'মাথা গরম কোরো না,' বাংলায় ওকে বলল রানা। 'এরা তো চাইছেই আমাদের খেপিয়ে দিয়ে তাড়াতে। দেখাই যাক, না গেলে কী করে?'

'তাই বলে এভাবে অপমানিত হব? সময়ও তো নষ্ট হচ্ছে।'

'নাফিজ যতক্ষণ না ড. ডোনেনের খোঁজ বের করতে পারছে, ততক্ষণ সময় আছে আমাদের হাতে। চলো, এদের নিয়মেই খেলি আপাতত। চিন্তা কোরো না, অপমানের প্রতিশোধটা সময়মত নেব অবশ্যই।'

রিসেপশনিস্টের দিকে ফিরল রানা। ইংরেজিতে বলল, 'কলম হবে?'

দুটো বলপয়েন্ট এগিয়ে দিল মেয়েটা, তারপর আঙুল তুলে পাশের একটা দরজা দেখিয়ে দিল। বলল, 'ওখানে চলে যান, বসার ব্যবস্থা আছে।'

ভিজিটরস্ বুকে সই করে ফর্মসহ ছোট্ট রুমটায় গিয়ে ঢুকল রানা আর রায়হান। ওয়েটিং রুম ওটা, সোফা আর সেন্টারটেবিল আছে। বিশ মিনিট লাগিয়ে জটিল ফর্মটা পূরণ করল ওরা। খানিক পরে অ্যাপ্রন পরে ডাক্তারের সাজে দুজন লোক হাজির হলো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিল, রক্ত নিল, হাঁ করিয়ে গালের ভিতর দিক থেকে নরম কোষও সংগ্রহ করল—ডি.এন.এ

boirboi.net

অ্যানালিসিসের জন্য। সবশেষে একজন ফটোগ্রাফার এসে ছবি তুলল ওদের।

ঘড়ি দেখল রানা, চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ফটোগ্রাফারকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ভড়ং শেষ হয়েছে?'

থতমত খেয়ে গেল লোকটা। বোকার মত বলল, 'জী, হয়েছে।'

'এখন তা হলে ব্যুরো চিফের সঙ্গে দেখা করা যাবে তো?'

'জী, আসুন।'

লোকটার পিছু পিছু বেরুল রানা আর রায়হান। দরজায় দাঁড়ানো ছিল আরও দুজন এজেন্ট, ওরা বেরোতেই এসকর্ট করে এগিয়ে নিয়ে চলল। হাঁটার ফাঁকে একজন এজেন্টকে জিজ্ঞেস করে দেখল রানা, কোনও ফোন এসেছিল কি না; জবাবটা নেতিবাচক এল। তারমানে নাফিজ এখনও ড. ডোনেনকে ট্রেস করতে পারেনি।

হলঘরের মত বিশাল একটা রুমে ছোট ছোট কিউবিকলে বসে কাজ করছে জুনিয়র এজেন্টরা, তার মাঝখান দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের, রুমটার অন্যপ্রান্তে এখানকার ইনচার্জের অফিস। প্রথমেই কাঁচঘেরা আউটার রুম, সেখানে ছোট্ট একটা টেবিল নিয়ে বসে আছে মাঝবয়েসী এক মহিলা—ইনচার্জের পার্সোনাল সেক্রেটারি। মুখোমুখি দেয়াল ঘেঁষে একসেট সোফা আছে, দর্শনার্থীদের বসবার জন্য। এসব অবশ্য পরে দেখল রানা, প্রথমে দেখল কাঁচের দরজার পাল্লায় বড় বড় হরফে ইনচার্জের নাম, আর সেটা দেখেই থমকে দাঁড়াল।

এতক্ষণে পরিষ্কার হচ্ছে রহস্যটা, বোঝা যাচ্ছে—মাসুদ রানার নাম শুনেও কেন দেখা করতে উতলা হয়নি লোকটা। কেনই বা ওদের দেরি করানো হয়েছে এতক্ষণ, করা হয়েছে

হেনস্থা। সবকিছুর কারণ এই লোকটা...দরজার গায়ে ফুটে থাকা তার নামটা জ্বল জ্বল করে সেটাই জানান দিচ্ছে। ওখানে লেখা:

ডগলাস বুলক

ব্যুরো চিফ

'ওহ্ নো!' কপাল চাপড়াবার দশা হলো রানার। 'বুলডগ!'

সাত

পোড়া কপাল বোধহয় একেই বলে। একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে গেল রানার—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়! বড় জুতসই এ পরিস্থিতিতে। নইলে দুনিয়ায় এত লোক থাকতে বুলডগই এখানকার ব্যুরো চিফ হতে যাবে কেন? তাড়াহুড়োয় রানা এজেন্সির অফিস থেকে বের হবার সময় জেনে আসা হয়নি—এখানকার দায়িত্বে কে আছে। তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয়নি। যে-রকম জরুরি একটা ব্যাপার জানাতে ছুটে এসেছে, সেটা যে-কেউই সিরিয়াসলি নেবে, সব ধরনের সহযোগিতা করবে। কিন্তু দরজায় লেখা নামটা দেখে বিশ্বাসটা উবে গেল ওর, ডগলাস বুলক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতের মানুষ। তার মত প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং গোঁয়ার মানুষ খুব কম দেখেছে রানা। দুনিয়া জাহান্নামে গেলেও লোকটার কিছু যায়-আসে না, ব্যক্তিগত শত্রুতার ঝাল মেটানোই তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

খারাপ খবর এই যে, মাসুদ রানাকে বুলডগ নিজের সবচেয়ে

বড় শত্রু মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের ল-এনফোর্সমেন্ট সেক্টরে একসময় ডাকসাঁইটে লোক ছিল ডগলাস বুলক—এফবিআই-এর কাউন্টার-এসপিওনাজ ডিপার্টমেন্টের হেড ছিল, কাউন্টার-টেরর এবং অর্গানাইজড ক্রাইম ডিভিশনও চালিয়েছে অনেকদিন; পরিচিত প্রতিটা মানুষ তাকে বাঘের মত ভয় পেত। কারও জীবন নরকে পরিণত করায় তার জুড়ি ছিল না। এ-কারণে জুনিয়ররা ঠাট্টা করে তাকে আড়ালে-আবডালে বুলডগ ডাকত, সেটাই বেচারার ডাকনাম হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। কর্মদক্ষতার কারণে এক পর্যায়ে সিআইএ-তে নিয়ে আসা হয় তাকে, সেখানে অপারেশন শাখার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ পায়। তর তর করে এগোতে থাকা বুলডগের এই চমৎকার ক্যারিয়ারে রানার কারণে একমাত্র লাল দাগটা পড়েছে, আর দাগটা এতই মোটা যে—এক ধাক্কায় সিআইএ-র স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরের সম্মানিত পদ থেকে সাধারণ কাতারে নেমে আসতে হয়েছে তাকে।

ঘটনাটা বছরখানেক আগের। নিউ অর্লিয়েন্সে একটা জনসভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটনের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, আর গুপ্তঘাতক বলে ফাঁসিয়ে দেয়া হয় রানাকে। পুরোটাই ছিল ষড়যন্ত্র, র‍্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা গোপন অঙ্গ-সংগঠন নিজেদের কুটিল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘটায় কাণ্ডটা। ডগলাস বুলক তখন এফবিআই-এর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কো-অর্ডিনেট করার জন্য নিউ অর্লিয়েন্সেই ছিল, তাকেই দায়িত্ব দেয়া হয় হামলাকারীকে গ্রেফতার এবং পুরো রহস্যটা উদঘাটন করার জন্য। নিজের গোঁয়ার্তুমির কারণে অপারেশনটায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় বুলডগ—র‍্যামডাইনের ছড়িয়ে রাখা মিথ্যে সূত্র দেখে রানাকে ধরার জন্য উঠে-পড়ে

লেগে যায়, গ্রেফতার করতে না পেরে এক পর্যায়ে ওকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করে। অথচ গভীরে গিয়ে মূল রহস্যটা উদঘাটনের কোনও তৎপরতাই ছিল না তার মধ্যে, বরং এরিক স্টার্ন নামে এক এফবিআই এজেন্ট সঠিক সূত্র নিয়ে এগিয়ে এলে উল্টো ওই বেচারাকেই সাসপেন্ড করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত রানা যখন নিজের চেষ্টায় সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এল, তখন প্রকাশ পেয়ে গেল বুলডগের অদক্ষতা আর একগুঁয়ে স্বভাবের কথা। রেগে গিয়ে খোদ প্রেসিডেন্ট শাস্তি দিলেন তাকে—ডাবল ডিমোশন করে। ল্যাংলির হেডকোয়ার্টার থেকে অপসারণ করে এরপর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ক্যানসাসের এক ছোট্ট শহরের শাখা-অফিসে। এতদিন লোকটা ওখানেই ছিল বলে জানত রানা, লস অ্যাঞ্জেলেসে কবে এল খবরই পায়নি। শুধু এটুকু জেনেছিল—সেই ঘটনার পর থেকে ওকে নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে বুলডগ। ডিমোশনের পর মাতাল হয়ে প্রকাশ্যে কথাটা ঘোষণাও করেছে সে বেশ কয়েকবার।

আজব এক লোক এই ডগলাস বুলক—নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায় না, দোষ দেয় না র‍্যামডাইনকেও। তার বদ্ধমূল ধারণা, রানার হাতে নাকানিচোবানি খাওয়ার ফলেই আজ তার এই অবস্থা। আগে জানলে এখানে আসতই না রানা, সি.আই.এ-কে সতর্ক করার জন্য বিকল্প কোনও পথ বের করে নিত। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক, অন্য কোথাও যাবার সময় নেই। সবকিছু বুলডগের কাছেই খুলে বলতে হবে।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে মুখে হাসি ফোটাল মাঝবয়েসী সেক্রেটারি। ইতোমধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেছে: অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন, মি. রানা। প্লিজ, টেক আ সিট।' সোফা

boiRboi.net

দেখাল সে।

'বসার সময় নেই আমাদের,' রানা বলল। 'মি. বুলক কোথায়? অফিসে নেই?' দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'আছেন, তবে এখন তো লাঞ্চ ব্রেক চলছে। আপনাদের বসতে হবে।'

'কতক্ষণ?'

'ব্রেক তো কেবল শুরু হলো... এই ধরুন, এক ঘণ্টা।'

আর কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে—ইচ্ছে করেই ওদের হেনস্থা করছে বুলডগ, দেরি করাচ্ছে। নইলে গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরকে সেক্রেটারির সামনে বসিয়ে রেখে এক ঘণ্টা ধরে লাঞ্চ করে না কেউ। ব্যাপারটা রায়হানও বুঝতে পেরেছে, দুচোখে রাজ্যের বিতৃষ্ণা ফুটল তার। রানারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।

'লাঞ্চ ব্রেক?' থমথমে গলায় বলল ও। 'আমাদের বসিয়ে রেখে খাওয়া-দাওয়া করবেন উনি?'

'ইয়ে...' বোকার হাসি হাসল সেক্রেটারি। 'কী করবেন, বলুন? বসুন না আপনারা, আমি কফির ব্যবস্থা করছি।'

এসকর্টরা ইতোমধ্যে চলে গেছে ওদের পৌঁছে দিয়ে, তার মানে বাধা দেয়ার কেউ নেই। সেটা লক্ষ করে রানা বলল, 'জী না, কফি না, আমরাও লাঞ্চ করব। মি. বুলক আমার খুব কাছের মানুষ, লাঞ্চ শেয়ার করতে মোটেই আপত্তি করবেন না।'

সেক্রেটারি থতমত খেয়ে গেছে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। এই সুযোগে রায়হানকে নিয়ে ঘুরল রানা, হন হন করে হাঁটতে শুরু করল বুলডগের কেবিনের দরজার দিকে।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মহিলা, চেঁচিয়ে বলল, 'থামুন, মি. রানা! খবরদার, জোর করে ঢুকতে যাবেন না...'

boiRboi.net

যেন শুনতেই পায়নি, এই ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল রানা আর রায়হান, ওদের থামাতে ছুটে এল সেক্রেটারি। অযাচিতভাবে এই দুই অতিথি ঢুকে পড়ায় বুলডগ তার উপরই খেপে যায় কি না, এই ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বেচারি। ছুটে আসার সময় ধাক্কা খেয়ে বিকট শব্দে তার চেয়ারটা যে উল্টে পড়েছে, সেটা খেয়ালই করল না।

'যিশুর দোহাই, মি. রানা! প্লিজ...ঢুকবেন না ওখানে!'

পিছন থেকে ভেসে আসা মহিলার অনুনয়-বিনয়ে কান দিল না রানা, দরজায় পৌঁছে গেছে ও, হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকাল ডগলাস বুলক, প্রাণের শত্রুকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল। ছোটখাট গড়নের মানুষ সে, হঠাৎ দেখায় কেউকেটা বলে মনে হয় না। তবে সেটা কেবলই বাহ্যিক রূপ, কাজেকর্মে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ লোকটা—মানুষের জীবন বিষিয়ে তুলতে তার তুলনা হয় না, তার স্বভাব-চরিত্র হিংস্র কুকুর বুলডগেরই মত। প্রায় এক বছর পর লোকটাকে দেখছে রানা, খুব একটা পরিবর্তন আসেনি চেহারায়, চোখের নীল মণিতে এখনও আগের মতই তীক্ষ্ণতা আর শয়তানি।

টেবিলে ঢাউস আকারের দুটো ফাইল খুলে বসে আছে বুলডগ, হাতে কলম—কাজ করছিল নিশ্চয়ই। টিপ্পনী কাটার লোভটা সামলাতে পারল না রানা। বলল, 'বাহ্, বাহ্! আজকাল শুকনো কাগজ দিয়েই লাঞ্চ সারছেন বুঝি? ছুরি-কাঁটাচামচও নেই দেখছি। কিন্তু কাটলারি হিসেবে কলম জিনিসটা বড্ড স্থূল হয়ে গেল না? হাত ব্যবহার করতে ক্ষতি কী?'

কোঁচকানো ভুরু সোজা করে হা হা করে হেসে উঠল বুলডগ। বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা! আপনার সেন্স অভ হিউমার এখনও আগের মতই আছে দেখছি!'

boiRboi.net

'আপনিও বদলাননি। এতক্ষণ যা ঘটল, সেসব নিশ্চয়ই আপনার নির্দেশে?'

দরজায় উঁকি দিল সেক্রেটারি, আতঙ্কে তার চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যর। এঁরা কোনও কথাই শুনলেন না...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল বুলডগ। 'ইটস্ ওকে, ম্যাডেলিন। তুমি যেতে পারো।' তারপর তাকাল রানার দিকে। 'দাঁড়িয়ে কেন আপনারা, বসুন।'

ইশারা পেয়ে বসল রায়হান। রানাও চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'খামোকা আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে কাজটা ভাল করেননি আপনি।'

'কমপ্লেন করবেন নাকি?' বুলডগের গলায় বিদ্রূপ। 'আজকাল তো শুনেছি প্রেসিডেন্ট কার্লটনের সঙ্গে আপনার দারুণ দহরম-মহরম। যান না, ল্যাংলি-হোয়াইট হাউস... যেখানে খুশি গিয়ে বিচার দিন। কিচ্ছু হবে না আমার। আমি শুধু স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি প্রসিডিওর ফলো করেছি, এটা কোনও অপরাধ নয়। বরং আপনারাই জোর করে আমার অফিসে ঢুকে অভদ্রতা করেছেন, বুঝলেন?'

'তা-ই? কাগুজে আইন দেখিয়ে আমাদের হেনস্থা করাটাকে জাস্টিফায়েড বলছেন আপনি? এ স্রেফ রেষারেষি ছাড়া আর কিছু নয়। যা-ই বলুন, মি. বুলক, আপনার পজিশনের লোকের জন্য এভাবে ব্যক্তিগত শত্রুতা প্রকাশ করাটা শোভন নয়।'

'হাহ্! ক্যানসাসের ওই নরকে বছরখানেক কাটালে বুঝতেন—কোনটা শোভন, আর কোনটা শোভন নয়। পজিশনের খোঁটাও দয়া করে দেবেন না আমাকে, ওই ইঁদুরের গর্তে কোনও পদস্থ লোককে পাঠানো হয় না।' উত্তেজনা ফুটল বুলডগের

boiRboi.net

গলায়। 'আপনার...শুধু আপনার কারণে একটা ঝাড়ুদারের চেয়েও তলায় নেমে গিয়েছিলাম আমি। লস অ্যাঞ্জেলেসের এই সভ্যজগতে ফিরতে আমাকে কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তা আপনি কল্পনা করতে পারেন?'

'দোষটা আমার নয়,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'র‍্যামডাইনের কেসটাতে অযোগ্যতা আপনি দেখিয়েছিলেন, আমি নই।'

'ধোয়া তুলসীপাতা সাজবেন না, মি. রানা,' রাগী গলায় বলল বুলডগ। 'হাতে যা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল, সেগুলোর অনুসারে কাজ করছিলাম আমি, আপনাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম। ব্যাপারটা আপনার পছন্দ হয়নি, সেজন্যই সবকিছু চুকে-বুকে যাবার পর প্রেসিডেন্টকে বলে আমার ডিমোশন আর ট্রান্সফার করিয়েছেন আপনি...প্রতিশোধ নিয়েছেন।'

'এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'আমি কিছুই করিনি। আমার সঙ্গে যা-ই ঘটেছিল, তার জন্য র‍্যামডাইন দায়ী ছিল, আপনি নন। আপনার উপর শুধু শুধু রাগ পুষে রাখব কেন আমি?'

'তা হলে প্রেসিডেন্টকে বলে আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন না? সেটা করেননি কেন?'

'আপনার মত মানুষ যে আমার সাহায্যের আশায় থাকবেন, সেটা তো আমার মাথাতেই আসেনি।' সত্যি কথাটাই বলল রানা।

'যাক গে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই কোনও।' আশ্চর্য দক্ষতায় রাগটা দমাল বুলডগ, এখন তার কণ্ঠ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'কী কারণে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন, সেটাই বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বিষয়টা নিয়ে ও-ও আর কথা বলতে চায় না। সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো রায়হান রশিদ—আমার ইনভেস্টিগেশন ফার্মের চিফ আই.টি. স্পেশালিস্ট। নাসার ডিপ

স্পেস প্রোব ভয়েজার-এর পাঠানো একটা ট্রান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করেছে ও...'

কথাটা শেষ হলো না, বাধা দিয়ে বুলডগ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'ইন্টারসেপ্ট মানে? আপনারা নাসার কম্পিউটার হ্যাক করেছেন?'

'এটা তেমন কিছু না, নাসা সারা বছরে কয়েক লক্ষবার হ্যাকিঙের শিকার হয়,' রায়হান বলল। 'জানেন কি না জানি না, প্রতিষ্ঠানটা পৃথিবীর মোস্ট টার্গেটেড হ্যাকিং স্পটগুলোর একটা।'

'এটা তো সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ!' বুলডগ হতভম্ব। 'কোন সাহসে বুক ফুলিয়ে আমাকে বলতে এসেছেন?'

'বাগড়া না দিলে এখুনি জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'দয়া করে আইন-টাইনের ব্যাপারটা আপাতত মাথা থেকে দূর করে দিন। পুরোটা শুনলে আপনি বরং ধন্যবাদ দিতে চাইবেন; ও হ্যাকিং করেছিল বলেই এত বড় একটা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পাওয়া গেছে।'

'কীসের বিপর্যয়?'

আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল রানা, মাঝে মাঝে কথা জোগাল রায়হান। বিপদের ধরন, প্রকৃতি, সময়সীমা—সবই ব্যাখ্যা করল। শুনতে শুনতে বুলডগের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা যাবে বলে ভেবেছিল ওরা, দৃষ্টিতেও হয়তো শঙ্কা ফুটবে... কিন্তু সেসবের কিছুই ঘটল না। বরং ওদের বলা যখন শেষ হলো, তখন লোকটার মুখে মিটিমিটি হাসি।

'আপনি হাসছেন কেন?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল রানা। 'বিপদটা যে কত বড়, তা কি বুঝতে পারেননি?'

'যা বোঝার বুঝে নিয়েছি আমি,' হালকা গলায় বলল বুলডগ। 'এসব আষাঢ়ে গল্প অন্য কোথাও গিয়ে শোনান, মি. রানা। আমার এখানে সুবিধে করতে পারবেন না।'

boiRboi.net

'আষাঢ়ে গল্প!'

'জী হ্যাঁ। ভেবেছেন কী...বিদেশি একজন স্পাইয়ের কথায় গোটা অ্যামেরিকার ডিফেন্স থেকে শুরু করে সব ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বন্ধ করিয়ে দেব, এতই বোকা আমি? যান, যান, আপনার এসব কূটচাল অন্য কোথাও গিয়ে চালুন। এই দেশে সফল হতে পারবেন না, আমরা এত সহজে ভয় পাই না।'

'আপনার ধারণা, আমি কোনও কুমতলব নিয়ে এসব কথা শোনাতে এসেছি?'

'ঠিক ধরেছেন,' বুলডগের মধ্যে আত্মতৃপ্তি দেখা গেল। 'শুনুন মি. রানা, সাইবারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে কমবেশি আমিও জানি। আপনার ওই ইউনোকোড আর ইউনো-ভাইরাস...স্রেফ একটা মিথ, একটা কিংবদন্তি। অ্যামেরিকার বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন—এমন কোনও কোড নেই, থাকতে পারে না। একটা মাত্র ডিজিট দিয়ে কিছুতেই অর্থবহ ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গত বছর দু-দু'বার ইউনো-ভাইরাসের আক্রমণের গুজব ছড়িয়েছিল ইন্টারনেটে, কোনওবারই কিছু হয়নি। মাঝখান থেকে সতর্কতা নিতে গিয়ে সরকারের মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার, লোকবল আর সময়ের অপচয় হয়েছে।'

'আমাদের ধারণা, গুজবটা ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হয়েছিল... এবারেরটার স্টেজিং পার্ট হিসেবে। পর পর দুবার মিথ্যে ঘোষণায় অসতর্ক হয়ে পড়বে লোকে, সত্যিকার আক্রমণটার সময় ওয়ার্নিং দেয়া হলেও গুরুত্ব দেবে না। রাখালবালক আর বাঘের গল্প শুনেছেন না? অনেকটা সেরকম।'

'ভুল জিনিসের উপমা দিচ্ছেন,' কাঠখোট্টা গলায় বলল বুলডগ। 'দিতেই যদি হয় তো নিজেদের আজগুবি গপ্পোটার উপমা দিন। ওটা হলো জুজুর ভয়, বুঝলেন? ওসব শুনিয়ে

boiRboi.net

বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রকে নয়।'

'জানতাম, এ-ধরনেরই কিছু বলবেন আপনি,' রানা বলল। 'সেজন্যেই সঙ্গে প্রমাণ নিয়ে এসেছি আমরা।'

'কী প্রমাণ?'

রায়হান বলল, 'ভাইরাসটার কপি নিয়ে এসেছি আমরা। ইউনোকোড সত্যি না মিথ্যে, তা এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি। ওটা কতটা শক্তিশালী, সেটাও টের পাবেন।'

বাম হাত নেড়ে নিজের অফিশিয়াল কম্পিউটারটা দেখাল বুলডগ। 'দেখান। আমার কম্পিউটারেই দেখান।'

'এটা নিশ্চয়ই আপনাদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত?'

'তা তো বটেই। কেন, কোনও অসুবিধে?'

'আপনি কি এখনই ভাইরাসটা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'অন্য কোনও কম্পিউটার দিন। স্ট্যান্ড-অ্যালোন...নেটওয়ার্কে যুক্ত নয়। পুরনো-টুরনো হলে ভাল হয়, যাতে নষ্ট হয়ে গেলে আপনাকে হা-হুতাশ করতে না হয়।'

ভুরু কোঁচকাল বুলডগ, তারপর ইন্টারকমে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। শেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকটার পিছু পিছু অফিস থেকে বেরুল রানা আর রায়হান। হলঘরের মত বড় কামরাটার মাঝামাঝি গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল ওরা, দরজা পেরিয়ে সরু একটা করিডরে পৌঁছুল। ওটার শেষ মাথায় আরেকটা দরজা, তাতে ছোট্ট একটা ফলক লাগানো: *মেইন্টেন্যান্স স্টোর।*

boiRboi.net

রানাদের নিয়ে স্টোরের ভিতরে ঢুকল বুলডগ। রুমটা মাঝারি আকারের, তিনদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে স্টিলের তৈরি

র‍্যাক আর লকার, তাতে হরেক রকমের জিনিসপত্র—বেশিরভাগই বাতিল মালের মত দেখাল। অবশিষ্ট দেয়ালটাও উন্মুক্ত নয়, সেটার গায়ে ঠেস দিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে পুরনো বাক্স-পেঁটরা, কাগজের কার্টন, বাতিল তার আর লোহালক্কড়। এসবের মাঝ দিয়ে কষ্ট করেই যেন ঠাঁই করে নিয়েছে দুটো জানালা—সেখান দিয়ে মুক্ত আকাশের বদলে দেখা যাচ্ছে ফেডারেল বিল্ডিঙের দ্বিতীয় টাওয়ারটা। মেইন্টেন্যান্স স্টোরটা দুই টাওয়ারের পরস্পরমুখী অংশে পড়েছে, সরাসরি সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না অন্য ভবনটার জন্য, তাই দিনের বেলাতেও এখানে অন্ধকার-অন্ধকার একটা ভাব। ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা দুটো বালব জ্বেলে আলোকিত করা হয়েছে ভিতরটা।

রুমটার এক কোণে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর পুরনো একটা কম্পিউটার জোড়া দিচ্ছে সুটপরা এক এজেন্ট, সেদিকে দুই অতিথিকে নিয়ে গেল বুলডগ। যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল রানা, এক্কেবারে প্রাচীন দশা কম্পিউটারটার। গায়ের রং কোনও এককালে সাদা ছিল হয়তো, এখন সেটা মলিন হতে হতে হলুদ...না, হলুদেরও দিন পার হয়ে গেছে; এখন ওটা প্রায় কমলা রং ধারণ করেছে। মনিটরটা ঘোলা, কী-বোর্ডে ময়লার আস্তর, সিপিইউ-র ধাতব আবরণের জায়গায় জায়গায় রং চটে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে করাল মরিচা।

'আপনারা দেখি আমার কথাটা একেবারে আক্ষরিকভাবে নিয়েছেন,' রানা বলল। 'পুরনো কম্পিউটার চেয়েছিলাম, তাই বলে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক জিনিস বের করে ফেললেন?'

'নষ্ট হলে যেন হা-হুতাশ করতে না হয়—একথা বলেছিলেন না?' বলল বুলডগ। 'সারা অফিসে আপাতত এটা ছাড়া আর কোনও মেশিনের মায়া ত্যাগ করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

boiboi.net

অবশ্য আপনারা এটারই আদৌ কোনও ক্ষতি করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার।'

'এটা তো অলরেডি নষ্ট মনে হচ্ছে,' রায়হান বলল। 'আমরা আর কী করব? ডেল কোম্পানির পেন্টিয়াম-ওয়ান মেশিন...এ তো জাদুঘরে দেয়ার জিনিস। এখনও চলে?'

'জী, চলে,' টেবিলের উপর থেকে সোজা হলো সুট পরা এজেন্ট, অ্যাসেমব্লিঙের কাজ শেষ করেছে। 'আগের আমলের জিনিস অনেক টেকসই হতো। আজকাল তো ইচ্ছে করেই নাজুক জিনিস বানায়। সেগুলো যত কম টিকবে, নতুনগুলো ততই বিক্রি হবে—এই আশায়। ব্যবসায়ীদের কুবুদ্ধি দেখলে অবাক হতে হয়।' ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল সে। 'হাই, আমি এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক নিউটন, এখানকার আই.টি. ইঞ্জিনিয়ার।'

হাত মিলিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দিল রানা আর রায়হান।

'কাজ শুরু করো জলদি।' বুলডগ তাড়া লাগাল। 'ফ্র্যাঙ্ক, তোমার এই কম্পিউটার অন হবে তো?' তার নিজেরও সন্দেহ হচ্ছে।

'হবে, স্যর। আমি কয়েকদিন আগেই একবার চেক করে দেখেছি। মেশিনটা আসলে নষ্ট হয়নি, শুধুমাত্র আজকালকার হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারের সঙ্গে কম্প্যাটিবল না হওয়ায় ফেলে দিতে হচ্ছে।'

ইলেকট্রিক্যাল সকেটে পাওয়ার কর্ড লাগিয়ে সুইচ অন করল নিউটন। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল সিপিইউ-র ভিতরে, জ্যান্ত হয়ে উঠল আদ্দিকালের যন্ত্রটা। ঘোলা স্ক্রিনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল লেখা আর ছবি।

'এই রে, এত ঘোলা হলে কাজ করব কীভাবে?' বলে উঠল রায়হান।

boiRboi.net

'ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিল নিউটন। 'পাওয়ার স্ট্যাবিলাইয হতে পাঁচ মিনিটের মত লাগে মনিটরটার...হাজার হোক, বয়স তো কম হয়নি। আপনি বসুন।' কোনা থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে রায়হানকে কম্পিউটারের সামনে বসতে দিল সে। 'কী নাকি এক ডেনজারাস ভাইরাস দেখাবেন, আমি খুব আগ্রহ বোধ করছি।'

বাটন টিপে সিডি-রমের ট্রে-টা বের করল রায়হান, ইউনো-ভাইরাসের ডিস্কটা ঢোকাল কম্পিউটারে—ইতোমধ্যে বুলডগের নির্দেশে ওটা দিয়ে গেছে বাইরে পাহারায় থাকা এক এজেন্ট। ও জানতে চাইল, 'ড্রাইভটা নষ্ট না তো? ডিস্কটা পড়তে পারবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল নিউটন। 'পারবে। ঠিকই আছে ওটা।'

নিশ্চিত হবার জন্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রায়হান, তারপর হাত রাখল কী-বোর্ডে। বলল, 'এই কম্পিউটারের সিকিউরিটি প্রটোকলগুলো জানতে হবে আমাকে। দয়া করে বলবেন?'

'হোয়াট?' গর্জে উঠল বুলডগ। 'কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ সিকিউরিটি প্রটোকল জানতে চাইছেন...মানে কী এর?'

চেয়ারটা ঘুরিয়ে বুলডগের দিকে ফিরল রায়হান। 'একটা অ্যাকসিলারেটেড ক্লকের সাব-প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডেডলাইনটা এগিয়ে এনে ভাইরাসটা অ্যাক্টিভেট করব আমি। তবে তার আগে কম্পিউটারের ইন্টারনাল ক্লক আর সব ধরনের ডেটা-ফ্লো আইসোলেট করে ফেলতে হবে। সিকিউরিটি প্রটোকল ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।'

'কী সব বলছেন, বুঝতে পারছি না,' বলল বুলডগ, বলার ভঙ্গিতে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে। 'তবে সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি,

boighar.net

কোনও অবস্থাতেই আপনার মত একজন হ্যাকারের হাতে আমি সিআইএ-র কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি কোড তুলে দেব না। অন্য কোনও কায়দা বের করুন।'

মাথা নাড়ল রায়হান। 'আর কোনও কায়দা নেই, সিকিউরিটি প্রটোকল ভাঙতেই হবে। কোডটা যদি না দেন, তা হলে হ্যাকিঙের মাধ্যমে ভাঙাটাই একমাত্র বিকল্প। তবে তাতে খামোকা সময়ই নষ্ট হবে।'

'কিন্তু...'

'রাজি হয়ে যান, মি. বুলক,' রানা বলল। 'ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার জানামতে সব ধরনের কোডই পরিবর্তনশীল, আমাদের কাজ শেষে আপনার সিকিউরিটি প্রটোকলটা নাহয় বদলে ফেলবেন!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিউটনের দিকে তাকাল ব্যুরো চিফ। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কথাটা ভুল বলেননি মি. রানা। প্রটোকলটা বদলে ফেলা যাবে।'

খানিক ভাবল বুলডগ, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়ার সুরে বলল, 'ঠিক আছে, কোডটা দাও ওঁদের।'

পাশে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সংখ্যা আর অক্ষর বলতে থাকল নিউটন, কী-বোর্ডের বোতাম টিপে সেগুলোকে কম্পিউটারে প্রবেশ করাল রায়হান। তারপর বলল, 'সাব-প্রোগ্রামটা তৈরি করছি আমি, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।'

কী-বোর্ডে ঝড়ের বেগে আঙুল চালাতে শুরু করল ও, পাশ থেকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল এজেন্ট নিউটন, চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। একই ফিল্ডে কাজ করে সে, কৌতূহলটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রানা আর ডগলাস বুলকের ব্যাপারটা ভিন্ন। পিছনে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, অলস ভঙ্গিতে, ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে উঠছে। দুজনের

boiRboi.net

মধ্যে এমন কোনও সখ্যতা নেই যে, গল্প-গুজব করে সময় পার করে দেবে। ঘড়ির দিকে বার বার তাকাল রানা—কাঁটা যেন ঘুরছেই না। নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় কফি আনাল বুলডগ, কাপে চুমুক দিতে দিতে কাটানো গেল কয়েকটা মিনিট, তবে তারপর আবার সেই থমথমে পরিবেশ।

অবশেষে...যেন অনন্তকাল পরে শেষ হলো রায়হানের প্রোগ্রাম বানানো। অবশ্য কথাটা মোটেই ঠিক নয়, আগেও একবার করেছে বলে এবার তুলনামূলকভাবে কম সময় লেগেছে ওর—মাত্র চোদ্দো মিনিট। বোর হতে থাকা রানা আর বুলকের কাছে এটাই অস্বাভাবিক দীর্ঘ বলে মনে হয়েছে।

'আমরা রেডি, মি. বুলক,' রিপোর্ট দিল নিউটন।

'তাড়াতাড়ি ছাড়ো,' অধৈর্য গলায় বলল বুলডগ। 'এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর না।'

ড্রাইভ থেকে সিডিটা বের করে নিয়েছে রায়হান। বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর চাপ দিল *এন্টার* বাটনে। নিউটনকে বলে দেয়া হয়েছিল, সে ইতোমধ্যে স্মোক অ্যালার্মের সুইচ অফ করে দিয়েছে।

চারজোড়া চোখের সামনে রানা এজেন্সির সেই দৃশ্যটারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। দ্রুতবেগে ডেডলাইনে পৌঁছে গেল স্ক্রিনে ভাসতে থাকা ঘড়িটা, এরপর আঁকিবুকি আর নকশা...স্ক্রিনে "ইউ *আর ডুমড়*" কথাটা ভেসে ওঠা, স্পিকারে খনখনে হাসি...সব আগের মতই ঘটল। সিপিইউতে বিস্ফোরণ আর আগুনের ফুলকিও বেরুল যথারীতি। পোড়া গন্ধে ভরে গেল পুরো স্টোর। ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধ করা ছিল বলে রক্ষা, নইলে এতক্ষণে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত।

বুলডগ আর নিউটনের দিকে তাকাল রানা—তাদের দৃষ্টি

boiRboi.net

বিস্ফারিত, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইল তারা, তারপর নিজেকে সামলে নিল পোড়-খাওয়া ব্যুরো চিফ। রানার দিকে ফিরে থমথমে গলায় জানতে চাইল, 'এ...এটা ভাইরাস ঘটিয়েছে?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

নিউটন এগিয়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কম্পিউটারটা পরীক্ষা করছে। বিস্মিত গলায় বলল, 'এটা...এটা অবিশ্বাস্য! একটা ভাইরাসের পক্ষে কীভাবে গোটা একটা কম্পিউটার এভাবে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব?'

'একটা না,' শুধরে দিল রায়হান। 'নেটওয়ার্কে থাকলে এটার সঙ্গে যত কম্পিউটার সংযুক্ত থাকবে, তার সবগুলোকেই ধ্বংস করে দেবে।'

'বলছেন কী!' চোখ কপালে তুলল নিউটন, তাকে বিস্তারিত সব খুলে বলা হয়নি, অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'ইউনোকোড দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়,' সংক্ষেপে জবাব দিল রায়হান।

'ইউনোকোড! এ...এটা ইউনোকোডে তৈরি ভাইরাস?'

নিজের আই.টি বিশেষজ্ঞের বিস্ময় নিয়ে মাথা ঘামাল না বুলডগ, রানাকে বলল, 'দেখা যাচ্ছে আপনি ভুয়া হুমকি দিতে আসেননি।'

'দুঃখ প্রকাশ করলে আমি সব অপমান ভুলে যেতে রাজি আছি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

হেসে উঠল বুলডগ। 'নাহ্, আপনাকে হারানো সোজা কাজ নয়। ঠিক আছে, যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত।'

'শুনে খুশি হলাম। তবে ভবিষ্যতে কেউ জরুরি খবর নিয়ে

boiRboi.net

এলে শুরুতেই তাকে হেনস্থা করবেন না। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।'

'সেটা তো বুঝতেই পারছি,' বুলডগ মাথা ঝাঁকাল। 'রাগ করে আপনি চলে গেলে কী বিপদটাই না হতো! এত বড় একটা ব্যাপার তো জানতেই পারতাম না।' নীচের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'গোটা ঘটনাটাই অত্যন্ত সিরিয়াস, মি. রানা। দ্রুত কিছু একটা করা দরকার। এক্ষুণি একটা ফোন করতে হবে আমাকে, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবেন এখানে? বোঝেনই তো আপনাদের সামনে কথা বলাটা...'

'কোনও অসুবিধে নেই,' রানা বলল। 'যান, কথা বলে আসুন।'

'থ্যাঙ্কস্, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

এজেন্ট নিউটনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলডগ, যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল রায়হান, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অন্তত এদের তো বোঝানো গেছে। বড় একটা দায়িত্ব শেষ হলো।'

রানা কিছু বলল না, ওর ভুরু কুঁচকে আছে। কেন যেন খটকা লাগছে ওর, গোলমালের আভাস পাচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে বিপজ্জনক পেশায় থাকবার কারণে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাধারণ মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ, সাধারণত বিনা কারণে খুঁতখুঁত করে না মনটা।

'ওঠো,' রায়হানকে বলল রানা। 'ঝামেলার শেষ হয়নি এখনও। মনে হচ্ছে আরও বড় বিপদ দেখা দিতে যাচ্ছে।'

'মানে!' রায়হান অবাক।

'বুলডগের হাবভাব ভাল ঠেকছে না আমার কাছে। আমাদের যদি অপেক্ষাই করাতে হয়, এখানে কেন? ভাল কোনও ওয়েইটিং

রুম বা অফিসে বসাতে পারত না?'

'কী বলতে চাইছেন?'

'ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, বেরুলে হয়তো জানা যাবে। ওঠো!'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা আর রায়হান, পড়ে গেল দুজন সিআইএ এজেন্টের সামনে, করিডর ধরে তারা এদিকেই আসছিল। ওদেরকে দেখে পথরোধ করে দাঁড়াল।

'সরো! যেতে দাও আমাদের!' ধমকের সুরে বলল রানা।

'কোথায় যাচ্ছেন, স্যর?' জানতে চাইল প্রথম এজেন্ট।

'মি. বুলকের সঙ্গে জরুরি কথা আছে। পথ ছাড়ো।'

'স্টোরেই অপেক্ষা করুন। স্যর এখুনি ফিরে আসবেন।'

'ওখানকার পরিবেশ পছন্দ হচ্ছে না আমাদের,' রানা বলল। 'বসতে হলে বাইরে বসব।'

'দুঃখিত, করার কিছু নেই। স্যর না ফেরা পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হবে আপনাদের।' আদেশের সুর লোকটার গলায়।

'মানে! তোমরা আমাদের বাধা দেয়ার কে?'

'আমাদের পাঠানো হয়েছে আপনাদের পাহারা দিতে, যাতে কোথাও চলে যেতে না পারেন,' বলল এজেন্ট। 'প্লিজ, স্টোরে ফিরে যান।'

'না গেলে?'

কোটের আড়াল থেকে পিস্তল বের করে ওদের দিকে তাক করল লোকটা, দেখাদেখি তার সঙ্গীও। কঠিন গলায় বলল, 'কথা না শুনলে আপনাদের গুলি করবার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাদের, মি. রানা। যান, ভালয় ভালয় ঢুকে পড়ুন ভিতরে।'

থমকে গেল রানা আর রায়হান। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওরা তাকিয়ে রইল মসৃণ, চকচকে, কালো পিস্তলদুটোর দিকে।

boiRboi.net

আট

মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড ক্রোধ ভর করল রানার ভিতর, ইচ্ছে হলো কেড়ে নেয় পিস্তলদুটো, মেরে তক্তা বানিয়ে দেয় লোকগুলোকে। সঙ্গে রায়হান আছে, সে-ও আনআর্মড কমব্যাট জানে; দুইয়ের বিপক্ষে দুই—লড়াইটা মোটেই অসম হবে না। কিন্তু প্রতিপক্ষের চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিল ও। উঁচু দরের ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ এজেন্ট এরা, মোটেই আনাড়ি নয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে, অস্ত্র কেড়ে নেয়া সহজ হবে না। তা ছাড়া মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লড়াইয়ের চেষ্টা করলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে এরা—বুলডগ সেরকম নির্দেশই দিয়ে রেখেছে। আর এই সরু করিডরে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোনও কারণ নেই, ফলাফলটা মারাত্মক হবে।

রানার চেহারায় ওর মনের ভাব সম্ভবত কিছুটা ফুটে উঠেছে, তা লক্ষ করে প্রথম এজেন্ট বলল, 'প্লিজ, মি. রানা, বোকার মত কিছু করতে যাবেন না। যা বলছি, সেটা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'কেন এই ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে, জানতে পারি?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'আপনার জিজ্ঞাসার কোনও জবাব নেই আমাদের কাছে। আমরা হুকুমের চাকর।'

boiRboi.net

‘কোথায় মি. বুলক?’ রাগী গলায় বলল রানা। ‘ডেকে আনো। তাকেই জিজ্ঞেস করব।’

‘স্যর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। প্রশ্ন-ট্রশ্ন যা করার, তখনই করবেন নাহয়।’ পিস্তল নাড়ল লোকটা। ‘এখন ভিতরে ঢুকুন।’

করার কিছু নেই, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে স্টোররুমে ফিরে গেল রানা আর রায়হান, পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল দুই সিআইএ এজেন্ট। নবে খুটখাট শব্দ হলো—তালাও লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে।

‘এসব হচ্ছেটা কী?’ বিস্মিত গলায় বলল রায়হান। ‘এরা আমাদের বন্দি করল কেন?’ বিসিআই-এ যোগ দেয়ার পর এবারই প্রথম ফিল্ড মিশনে এসেছে ও, চোখের পলকে মানুষকে রূপ পাল্টাতেও প্রথমবারই দেখছে।

‘এসপিয়োনাজের দুনিয়ায় স্বাগতম!’ তিক্ত হাসি হাসল রানা। ‘কী ঘটছে বুঝতে পারছ না? ইউনোকোড আর ভাইরাসের কথা সিআইএ-কে জানিয়ে খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছি আমরা। ওদের হাতে অসম্ভব শক্তিশালী আর অব্যর্থ এক অস্ত্র তুলে দিয়েছি।’

‘তারমানে...তারমানে...’ ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পেরে কথা আটকে যাচ্ছে রায়হানের।

‘হ্যাঁ,’ রানা মাথা ঝাঁকাল, সিআইএ-র এমন আচরণের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। ‘এরা চায় না—আর কাউকে গিয়ে ভাইরাসটার ব্যাপারে সতর্ক করে দিই আমরা।’

‘কী ভয়ানক কথা! তা হলে তো গোটা পৃথিবীর কম্পিউটার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।’

‘অ্যামেরিকারটা ছাড়া,’ রানা বলল। ‘অবস্থাটা বুঝতে পারছ

boiRboi.net

না? পুরো দুনিয়ার অর্থনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা আর প্রতিরক্ষায় ধস নামলে ওদের কত সুবিধা? চিন-উত্তর কোরিয়াসহ যেসব দেশ ওদের বিরোধিতা করে, তাদের উপর সরাসরি হামলা চালাতে পারবে, অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় যে-কোনও দেশের ভাগ্য নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে পারবে। অ্যামেরিকা তখন শুধু সুপার-পাওয়ার নয়, আলটিমেট-পাওয়ার হয়ে যাবে। এত বড় একটা সুযোগ বুলডগ কীভাবে হাতছাড়া করে, বলো?'

'ইয়াল্লা! লোকটা মানুষ, না পিশাচ?'

'তারচেয়েও খারাপ। ওকে স্বার্থপর আর গোঁয়ার বলে জানতাম, তাই বলে এত নীচে নামবে—সেটা ভাবতেই পারিনি।' রানার গলায় আক্ষেপ। 'ভুলটা আমারই হয়েছে। এখানে আসার আগেই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভালমত চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ছিল। সমস্যাটা শুধু বুলডগের কারণে নয়, ওর জায়গায় সিআইএ-র যে-কোন বদমাশ ব্যুরো চিফ থাকলেও একই কাজ করত।'

'কিন্তু মাসুদ ভাই...নিজেদের কম্পিউটার-ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে তো অ্যান্টি-ভাইরাস প্রয়োজন হবে ওদের। সেটা কোথায় পাবে?'

'হায় হায় করছি কেন, বুঝতে পারছ না? ইউনোকোডের গল্প বলার সময় ড. ডোনেনের নাম বুলডগকে বলে দিয়েছি আমরা। তাঁকে খুঁজে বের করবে ওরা, অ্যান্টি-ভাইরাস তৈরি করাবে।'

রায়হান মাথা নাড়ল। 'স্যর এদের মত বদমাশদের সাহায্য করবেন বলে মনে হয় না আমার।'

'করবেন...করতে বাধ্য হবেন। কথা না শুনলে শারীরিক আর মানসিক টর্চার চালানো হবে। ওই ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেয়া যায়।'

'কী শোনাচ্ছেন!' রায়হানের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছায়া পড়তে শুরু করেছে। 'কিছু একটা করতেই হবে, মাসুদ ভাই। সব অ্যামেরিকান খারাপ—তা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা যদি উপযুক্ত কারও কাছে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি, নিশ্চয়ই সাহায্য পাব।'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল রানা। একজনই আছেন এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করবার মত—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নুমার চিফ। কিন্তু কপালটাই মন্দ, তিনি তো এখন হাসপাতালে... ইনটেনসিভ কেয়ারে। এদেশে রানার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই বটে, কিন্তু তারা কোনও কাজে আসবে না। সিআইএ-র বিরুদ্ধে কিছু করবার মত ক্ষমতা এবং পজিশন একমাত্র অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনেরই ছিল।

সরাসরি প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটনের কাছে যাওয়া যায় কি না, সেটাও ভেবে দেখল রানা; নিউ অর্লিয়েন্সের সেই শুটিঙের ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর মোটামুটি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভালমত ভেবে প্ল্যানটা বাতিল করে দিতে হলো। প্রথমত, ওকে প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুতেই দেবে না সিআইএ, যতভাবে সম্ভব বাধা দেবে। শেষ পর্যন্ত যদি পৌঁছুনো যায়ও, তাতে বিশেষ লাভ হবে না। আগেই ভদ্রলোকের মগজ ধোলাই করে রাখবে বুলডগের বসেরা। সিআইএ-র মতলবটা প্রেসিডেন্টের পছন্দ না হলেও তিনি প্রকাশ্যে কোনও পদক্ষেপ নেবেন না—মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা কখনোই তাঁদের ডিফেন্স এবং ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইযরদের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেন না।

মানেটা দাঁড়াল—আসন্ন মহাবিপর্যয়টাকে ঠেকানোর জন্য এই মুহূর্তে ও আর রায়হান ছাড়া আর কেউ নেই। অ্যামেরিকার আশা তো বাদই, অন্য কোনও সুপার-পাওয়ারের সাহায্যও পাওয়া যাবে

বলে মনে হচ্ছে না। ইউনোকোডের খবর পেলেই সবাই ওটাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এবার ও বুঝতে পারছে, কেন কোডের স্রষ্টারা জিনিসটাকে গোপন করে রেখেছেন, কেন এটার খবর কাউকে জানতে দেননি। অসহায় বোধ করল রানা, হঠাৎ করে বন্দি হওয়ায় বিশাল সমস্যায় পড়ে গেছে ওরা। কী করা যায়, সেটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। রায়হানকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করায় সে-ও নিশ্চুপ হয়ে গেল।

দশ মিনিট পর শব্দ হলো তালা খোলার। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল বুলডগ, মুখে বিজয়ীর হাসি। বলল, 'সরি, মি. রানা। একটু দেরি হয়ে গেল। ল্যাংলিতে আমাদের ডিরেক্টর এত উত্তেজিত হয়ে আছেন যে ফোন ছাড়তেই চাইছিলেন না।'

রানার ইচ্ছে হলো লোকটার টুঁটি চেপে ধরতে, কিন্তু পিছনে টান টান ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দুই পাহারাদারের কারণে খায়েশটাকে মাটিচাপা দিতে হলো। থমথমে গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'এসব হচ্ছেটা কী, জানতে পারি?'

'কাম অন, মি. রানা!' বুলডগের হাসিটা উজ্জ্বল হলো। 'একথা বলবেন না যে, আপনার মত অভিজ্ঞ একজন এজেন্টকে সবকিছু ভেঙে বলে দিতে হবে।'

'ভাইরাসটাকে আপনারা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন, তাই না?' অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'অন্যান্য সুপার-পাওয়ার, সেইসঙ্গে গোটা পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘোরানোর এত বড় সুযোগ আর কখনও আসেনি আপনাদের সামনে, এটাকে তাই হাতছাড়া করতে চাইছেন না। ঠিক বলেছি?'

'এই তো ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা। আপনি অত্যন্ত স্মার্ট লোক, মি. রানা। ইশারাতেই সব বুঝে ফেলেন।'

'এর মধ্যে স্মার্টনেসের কিছু নেই। আপনাকে চিনতে আর

বাকি নেই আমার। আপনাদের মত লোকদের কাছে বিবেক আর মানবতার চেয়ে অনেক বেশি বড় হচ্ছে অ্যামেরিকার সাম্রাজ্যবাদ।'

'ফাঁপা বুলি আওড়াবেন না, মি. রানা,' মুখ বাঁকা করে বলল বুলডগ। 'আমি হচ্ছি সত্যিকার দেশপ্রেমিক—সবার উপরে দেশের স্বার্থকে স্থান দিই। কীসের বিবেক আর কীসের মানবতা? সবার আগে হলো দেশ, বুঝলেন?'

'এতে আপনার ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ নেই, বলছেন? এত বড় একটা বিজয় হবে অ্যামেরিকার...আপনি তার উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কার আশা করছেন না? ভাবছেন না, এর ফলে হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেয়া হবে আপনাকে...পাবেন মস্ত বড় কোনও পদ?'

হেসে উঠল ধুরন্ধর ব্যুরো চিফ। 'দেশের সঙ্গে নিজেরও যদি একটু-আধটু উপকার হয় তো ক্ষতি কী, বলুন? যা-ই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। এত বড় সুযোগটা আপনিই এনে দিয়েছেন আমাকে। পোয়েটিক জাস্টিস, বুঝলেন? আপনি আমাকে টেনে তলায় নামিয়েছিলেন, আবার আপনিই আমাকে সবার উপরে তুলে দিতে যাচ্ছেন!'

'আপনার এই ষড়যন্ত্র আমি সফল হতে দেব না,' কঠিন গলায় বলল রানা।

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল বুলডগ। 'চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, মি. রানা। একটা পিঁপড়েকেও ঠেকানোর সাধ্য নেই আপনার। সামনে চোদ্দোশিক নেই বলে কোনও ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন না, প্লিজ। আপনি আর আপনার চ্যালা সত্যিই আমার বন্দি। শুধুমাত্র আমাদের অফিসে কোনও হাজত নেই বলে স্টোররুমে রেখেছি, তবে খুব শীঘ্রি শ্রীঘরে পাঠানো হবে আপনাদের।'

'কেন? কী করেছি আমরা?'

'ওমা! নাসার কম্পিউটারে হ্যাক করেননি আপনারা? ওটা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কত বড় একটা হুমকি, জানেন না?'

'বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছেন আপনি, মি. বুলক। এর পরিণাম ভাল হবে না।' রানা হুমকি দিল।

'প্লিজ, এমন ভুল বার বার করার সুযোগ দেবেন আমাকে,' গা-জ্বালানো সুরে বিদ্রূপ করল বুলডগ। 'বাই দ্য ওয়ে, ড. ডোনেনের নামটা বলে দেয়ায় ধন্যবাদ। ওটা জানা না থাকলে আমাদের পুরো প্ল্যানটাই মাঠে মারা যেত। হাজার হোক, এত বছর ধরে ইউনোরা তাদের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছে, এত অল্প সময়ে কি আমরা আর তাদের খুঁজে বের করতে পারতাম?'

'ভদ্রলোক কোথায় আছে, জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখনও না, তবে জেনে ফেলব। নাম জানা থাকলে মানুষ খুঁজে বের করতে আমাদের সময় লাগে না।' এবার বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ব্যুরো চিফ। 'গুড বাই, মি. রানা। এবার আমাকে যেতে হয়। চেষ্টা করব প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় যেন বিদায় দিতে পারি। ততক্ষণ পর্যন্ত...হ্যাভ আ নাইস টাইম।'

দুই প্রহরী নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলডগ। দরজায় আবার তালা লাগিয়ে দেয়ার শব্দ হলো। নিষ্ফল আক্রোশে পাল্লায় একটা ঘুসি বসাল রানা।

রায়হান আনমনে মাথা নাড়ছে, এখনও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও—মানুষ এত কুচক্রী হয়! ক্ষমতা আর স্বার্থের লোভে পুরো মানবসভ্যতাকে এভাবে জলাঞ্জলি দিতে পারে! ঘোর লাগা গলায় ও বলল, 'ব্যাপারটা আমি মানতে পারছি না, মাসুদ ভাই। এত বড় একটা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পাবার পরও সেটাকে ঠেকাতে পারব না? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব?'

নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা, সাহস দেয়ার সুরে বলল, 'এখুনি হতাশ হচ্ছ কেন? প্রায় চুরাশি ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে। এর মধ্যে কত কিছুই তো ঘটতে পারে!'

'চুরাশি ঘণ্টা যা, চুরাশি সেকেণ্ডও তা। এরা আমাদের যেতে দেবে ভেবেছেন?'

'তা দেবে না। যা করার নিজেদেরকেই করতে হবে।'

'কী করব?'

'বুলডগের প্ল্যানের বারোটা বাজিয়ে দেব।'

'কীভাবে?'

'সহজ,' বলল রানা। 'ওর আগে ড. ডোনেনের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের। তাঁর কাছ থেকে অ্যান্টিভাইরাসটা জোগাড় করে ছড়িয়ে দেব সবখানে। বুলডগের কিছুই করার থাকবে না।'

'সেটার জন্য মুক্ত হতে হবে প্রথমে,' রায়হান বলল। 'যাবেন কীভাবে—মারামারি করে?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'পুরো একটা অফিসভর্তি সিআইএ এজেন্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে ওঠা যাবে না।'

'ইস্‌স্‌, মোবাইলগুলো নিয়ে গেছে ওরা!' আক্ষেপ করল রায়হান। 'নইলে নাফিজ ভাইকে একটা খবর দিলেই যেভাবে হোক আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেত।'

'সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন খামোকা ভেবে লাভ কী, বলো?'

'তা হলে?'

স্টোররুমটার উপর নজর বোলাল রানা—ভাল করে দেখল কী কী আছে ভিতরে। ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ ভাবল ও, তারপর বলল, 'দরজা দিয়ে যেহেতু বেরোতে পারছি না, জানালাটা ব্যবহার করলে কেমন হয়?'

'কী বলছেন!' রায়হান বিস্মিত। 'আমরা পনেরো তলায়

boiRboi.net

আছি। এখান থেকে জানালা দিয়ে কীভাবে পালানো সম্ভব? গ্রাউণ্ড ফ্লোর হলে নাহয় একটা কথা ছিল।'

'দেখাই যাক!'

একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল রানা, শার্সি সরিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিল নীচে, ওর দেখাদেখি রায়হানও। ফেডারেল কমপ্লেক্সের পাথুরে চত্বর এত উপর থেকে স্রেফ এক চিলতে রুমালের মত দেখাচ্ছে, চলতে-ফিরতে থাকা মানুষদের লাগছে গুটি গুটি বিন্দুর মত।

'ওরে বাবা রে!' বলে উঠল রায়হান। 'আমার রীতিমত মাথা ঘুরছে।'

কতটা উঁচুতে আছে, মনে মনে হিসেব করে ফেলল রানা। পনেরো তলা...একেক ফ্লোরের উচ্চতা দশ ফুট করে ধরলে নীচের চোদ্দো তলার মোট উচ্চতা দাঁড়ায় একশো চল্লিশ ফুট। উনিশ-বিশ হতে পারে...আচ্ছা, ধরা যাক দেড়শো ফুটই। স্টোররুমের এককোণে স্তূপ হয়ে পড়ে পুরনো বেশ কিছু তার, সেদিকে ইঙ্গিত করে রায়হানকে বলল, 'ওখানে কতটা তার আছে, দেখো তো। পঞ্চাশ গজ হবে?'

'মনে হয় না,' কাছে গিয়ে স্তূপটা ঘেঁটে বলল তরুণ হ্যাকার। 'টেনে-টুনে বিশ-বাইশ গজ হতে পারে।'

'তা-ও মন্দ না,' একটু ভেবে বলল রানা। 'আমাদের ওজন বইতে পারবে?'

পরীক্ষা করল রায়হান—নেটওয়ার্কিঙের জন্য ব্যবহার হওয়া পুরনো কো-অ্যাক্সিয়াল কেইবল্ এগুলো, বেশ মোটা। বলল, 'পারা তো উচিত। কিন্তু কী মতলব আঁটছেন, বলুন তো? জানালা দিয়ে তার বেয়ে নামবেন? কিন্তু মাত্র ষাট ফুট নেমে লাভটা কী? তলায় আরও প্রায় শ'খানেক ফুট বাকি রয়ে যাবে...ওটুকু

boiboi.net

পেরোবেন কীভাবে?'

'নীচে যাব বলেছি নাকি?' রানার মুখে হাসি।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালা দিয়ে তাকাতেই বিশতলা উঁচু দ্বিতীয় ফেডারেল টাওয়ারের ওপর চোখ পড়ল রায়হানের। আঁতকে উঠে বলল, 'ওহ্ নো! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না...'

'নীচে যেহেতু যেতে পারছি না, সেক্ষেত্রে পাশে যাওয়াটাই কি একমাত্র পথ নয়?' বলল রানা। 'দূরত্বটা আমার কাছে পঞ্চাশ ফুটের মত মনে হচ্ছে, ওই দৈর্ঘ্যের কেইবল আছে আমাদের কাছে। তা ছাড়া, ওই বিল্ডিঙে যেতে পারলে পালানোটা খুব সহজ হয়ে যাবে...আফটার অল, ওখানে আমাদের বাধা দেয়ার জন্য একদল সিআইএ এজেন্ট বসে নেই।'

'বুঝলাম সবই,' রায়হান মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু ওপাশে যাচ্ছি কীভাবে? তার আছে বটে, কিন্তু ডগাটা ওই বিল্ডিঙে পার করব কী করে...সেখানে ওটা আটকে দেবেই বা কে? আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।'

'হুম, দেখা যাচ্ছে তোমাকে ইম্প্রোভাইজেশনের ওপর ট্রেনিং দিতে হবে।'

'কী?'

'ইম্প্রোভাইজেশন—হাতের কাছের জিনিস দিয়ে নতুন নতুন প্রয়োগ বের করা।'

'শব্দটার অর্থ জানা আছে আমার, মাসুদ ভাই। কিন্তু আপনি এখানে কী ইম্প্রোভাইজ করতে যাচ্ছেন, সেটাই বলুন।'

'এক্ষুণি দেখতে পাবে,' রানা বলল। 'আগে একটা টুলবক্স খুঁজে বের করো। মেইনটেন্যান্সের স্টোররুম যখন—দু'একটা থাকার কথা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তল্লাশিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তরুণ হ্যাকার

boiRboi.net

রানা খালি হাতে মাপতে শুরু করল জানালাটা—দেখা গেল, ওটা চারফুট চওড়া। পাশের বিল্ডিঙের দিকে তাকাল ও—এটারই যমজ সংস্করণ ওটা; জানালার মাপও একই রকম হবে বলে মনে হচ্ছে। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ওর মুখে।

একটা লকার খুলে টুলবক্স পেয়ে গেছে রায়হান, সেটা নিয়ে হাজির হলো রানার সামনে। 'এবার কী?'

স্টিলের তৈরি ছ'ফুট উঁচু একটা র‍্যাক দেখাল রানা। 'ওটার একটা পায়া খুলে ফেলতে হবে। এসো।'

'পায়া খুলবেন! কেন?'

'সময় হলেই দেখতে পাবে। কথা বাড়িয়ো না তো! এসো।'

টুলবক্স থেকে দুটো স্প্যানার নিয়ে কাজে নেমে পড়ল দুজনে।

নামেই পায়া—আসলে ছ'ফুট উঁচু স্টিলের দণ্ডটা র‍্যাকের একটা স্ট্যাণ্ড, কাঠামোটার মূল ভিত্তি। এরকম মোট ছ'টা খাড়া স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে নাট-বল্টু দিয়ে সমান্তরালভাবে বসানো হয়েছে মোট তিন সারি তাক। প্রথমে র‍্যাক থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলল ওরা। একটা স্ট্যাণ্ড খুলে ফেললে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে পুরো জিনিসটা যাতে হুড়মুড় করে পড়ে না যায়—সেজন্যে এই সতর্কতা। এরপর স্প্যানার দিয়ে নাট-বল্টু খুলতে শুরু করল দুজনে।

সময় বেশি লাগল না, মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা স্ট্যাণ্ড খুলে ফেলা গেল। জিনিসটা দুহাতে তুলে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করল রানা—হ্যাঁ, কাজ চলবে। রায়হানকে তারের টুকরোগুলো জোড়া দিতে বলল ও। 'ভাল করে গিঁট দিয়ো, খুলে যেন না যায়।'

'ভাববেন না,' বলল তরুণ হ্যাকার। 'তার ছিঁড়ে পনেরো

boiRboi.net

তলার উপর থেকে ডানা মেলার কোনও ইচ্ছে আমারও নেই। শক্ত করেই বাঁধব।'

রায়হান যখন কাজ করছে, সেই ফাঁকে পোড়া কম্পিউটারের সামনে থেকে চেয়ারটা এনে কোনাকুনিভাবে স্টোররুমের দরজার নীচে আটকে দিল রানা। এখন আর দরজা খুলে ওদের কাজে আচমকা বাগড়া দিতে পারবে না কেউ।

একটু পরেই রেডি হয়ে গেল পুরো বাইশ গজ তার। রায়হান বলল, 'এবার ব্যাখ্যা করুন প্ল্যানটা!'

তারের একটা মাথা স্টিলের দণ্ডটার মাঝামাঝি বাঁধছে রানা। বলল, 'স্কুল-কলেজের অ্যাথলেটিক্সে বর্শা নিক্ষেপ করেছ কখনও?'

'বর্শা-নিক্ষেপ!'

'হুঁ। করোনি?'

'নাহ্। খেলাধুলোয় কখনোই খুব একটা ভাল ছিলাম না আমি।'

'তা হলে তো দেখছি কাজটা আমাকেই করতে হবে,' বলল রানা, ছ'ফুট দীর্ঘ দণ্ডটার ওজন পরীক্ষা করল আরেকবার। 'অ্যাথলেটিক্সের জ্যাভেলিনের চেয়ে ভারী হয়ে গেছে, তবে পঞ্চাশ ফুট পার করতে পারব আশা করি।'

পালা করে একবার রানার মুখ, আরেকবার জানালার দিকে তাকাল রায়হান—এতক্ষণে ধরতে পারল গুরুর উদ্দেশ্যটা। 'ইয়াল্লা, মাসুদ ভাই...আপনার মাথায় এসব বুদ্ধি আসে কোত্থেকে!'

জবাব না দিয়ে পায়ে পায়ে জানালা বরাবর পেছাতে শুরু করল রানা—রানআপের জন্য জায়গা করে নিচ্ছে, তারবাঁধা স্ট্যাণ্ডটা ধরে রেখেছে কাঁধের উপর...ছোঁড়ার ভঙ্গিতে,

boiRboi.net

কোনাকুনিভাবে। 'কলেজে থাকতে দুবার সিলভার মেডেল পেয়েছিলাম,' রায়হানকে বলল ও। 'দোয়া করো, বিদ্যেটা যেন এখনও কাজে লাগে।'

হেসে উপরদিকে দুহাত তুলে প্রার্থনার একটা ভঙ্গি করল তরুণ হ্যাকার। দম নিয়ে ছুট লাগাল রানা, জানালায় পৌঁছে দক্ষ জ্যাভেলিন-থ্রোয়ারের মত ছুঁড়ে দিল লোহার দণ্ডটা। ধনুকের মত বাঁকা একটা পথে উড়ে গেল ওটা, তবে টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছুল না। পাশের বিল্ডিংটার পাঁচ ফুট দূরে থাকতেই গতি হারাল, খসে পড়ল নীচে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

'আরও জোরে ছুঁড়তে হবে, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান।

মাথা ঝাঁকাল রানা, তার ধরে টেনে তুলে আনল দণ্ডটা। পিছিয়ে গিয়ে আবার পজিশন নিল ও, তারপর দৌড়ে এসে দ্বিতীয়বার ছুঁড়ল ওটা।

এবারও ব্যর্থ হলো রানা। দূরত্ব পুরোটা অতিক্রম করল বটে, কিন্তু জানালা দিয়ে না ঢুকে আঘাত করল একফুট বাঁয়ের দেয়ালে। ঠং করে একটা শব্দ তুলে আবারও পড়ে গেল নীচে।

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল রানা।

'হয়ে যাবে, মাসুদ ভাই,' উৎসাহ দিল রায়হান। 'দান-দান-তিন দান।'

দণ্ডটা আবার তুলে আনতে শুরু করল রানা। বেশ ভারী ওটা, পর পর দুবার ছোঁড়ায় কাঁধ ব্যথা করছে। হাত ঝাড়া দিয়ে ব্যথাটা সয়ে নিল ও, একই সঙ্গে মনে মনে হিসেব করে নিল—কতটুকু কারেকশন দিতে হবে। প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলে দৃঢ় পদক্ষেপে ছুট লাগাল আবার, জানালার সামনে পৌঁছে নিশ্চিত ভঙ্গিতে থ্রো করল দণ্ডটা। ফলাফল দেখার জন্য আগ্রহের আতিশয্যে মুখ বাড়িয়ে

boiRboi.net

দিল রায়হান।

এইবার হয়েছে কাজ—দু'জোড়া আগ্রহী দৃষ্টির সামনে পঞ্চাশ ফুট দূরের জানালাটার উপর সজোরে এক মাথা দিয়ে আছড়ে পড়ল স্টিলের দণ্ডটা। জোরালো শব্দে ভাঙল শার্সির কাঁচ, এতদূর থেকেও শোনা গেল তা। কাঁচভাঙা ফোকর দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল জিনিসটা।

'বুলস্ আই!' খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রায়হান। 'দারুণ দেখিয়েছেন, মাসুদ ভাই!'

'কথা না বলে হাত লাগাও,' রানার কণ্ঠে তাড়া। 'সময় নেই আমাদের হাতে।'

ওর আশঙ্কাটা সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন দরজায় শব্দ হলো, তালা খোলা হচ্ছে। ভিতরে ধুপধাপ আওয়াজে সন্দিহান হয়ে উঠেছে বাইরে দাঁড়ানো দুই পাহারাদার। ঘটনাটা কী, জানতে আসছে ওরা।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার দরজা, আরেকবার জানালা দিয়ে চলে যাওয়া তারের দিকে তাকাল রায়হান, ধরা পড়ে যেতে বসেছে ওরা। ফিসফিস করে বলল, 'ইয়াল্লা, মাবুদ!'

boiRboi.net

নয়

'কুইক!' চাপা গলায় বলে উঠল রানা।

তার ধরে টানতে শুরু করল ওরা, একটু পরেই পাশের

বিল্ডিঙের জানালার চৌকাঠে উঠে এল স্টিলের দণ্ডটা, তবে বেরুল না। চার ফুট প্রস্থের জানালায় ওটার ছ'ফুট দৈর্ঘ্য আড়াআড়িভাবে আটকে গেছে। টান দিয়ে পরীক্ষা করল রানা—না, খুলে চলে আসার ভয় নেই।

দরজার তালা খুলে ফেলেছে দুই প্রহরী, এখন নবে মোচড় দিয়ে পাল্লাটা ঠেলছে, কিন্তু চেয়ারটা আটকে থাকায় খুলতে পারছে না দরজাটা।

'হচ্ছেটা কী ভিতরে?' ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল। 'ঢুকতে দাও আমাদের!'

জবাব না দিয়ে রায়হানের দিকে তাকাল রানা। 'হারি আপ, এ-মাথাটা আটকাতে হবে আমাদের।' আঙুল তুলে সিলিঙে লাগানো একটা ফ্যান ঝোলানোর খালি হুক দেখাল ও।

মাথা ঝাঁকাল রায়হান। রানা বসে পড়েছে, লাফ দিয়ে উঠে গেল কাঁধে। ওকে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। হুকটা নাগালে পেতেই হাতে ধরা কো-অ্যাক্সিয়াল কেইবলের প্রান্তটা ফোকর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল তরুণ হ্যাকার, টান টান করে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে ফেলল।

রায়হানকে মেঝেতে নামাল রানা। 'আগে তুমি যাও।'

'কিন্তু...'

'ধরা পড়ার মত পরিস্থিতি যদি দেখাই দেয়, তা হলে আমিই ধরা পড়ি,' রানা বলল। 'এই মিশনটার জন্য আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজন বেশি। কথা বোলো না, যাও বলছি।'

চাপাচাপিতে পড়ে জানালার চৌকাঠে উঠে পড়ল রায়হান। নীচের দিকে তাকাতেই চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা।

'আমার ভয় করছে, মাসুদ ভাই!' সরল স্বীকারোক্তি করল ও।

'নীচে তাকিয়ো না,' বলল রানা। 'রোপ-ট্রেনিঙে যা যা

boiboi.net

শেখানো হয়েছে, তা মাথায় রেখো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কেইবল্ ধরে ঝুলে পড়ল রায়হান। ভয় পেলেও তা আর প্রকাশ পাচ্ছে না ওর মধ্যে। তারটা ধরে তর তর করে বেয়ে একটু পরই ও পৌঁছে গেল অপর প্রান্তে। ঝুলে থাকা অবস্থায় শার্সির বাকি কাঁচগুলো পরিষ্কার করে নিল, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে।

এবার রানার পালা।

একবার পিছনে ফিরে স্টোররুমের দরজার দিকে তাকাল ও। ধাক্কাধাক্কি থেমে গেছে। দুই প্রহরীর ধাক্কায় ভাঙেনি দরজাটা—চেয়ারটা খুব শক্ত হয়ে আটকেছে, পাল্লাটাও শক্ত। ভিতরে ঢোকার জন্য ওরা এখন কী কৌশল করবে কে জানে। সেটা জানবার কোনও ইচ্ছে নেই, জানালার চৌকাঠে উঠে পড়ল ও।

প্রবল শক্তিতে ঠেলেও যখন দরজার পাল্লাটা খোলা গেল না, বোকা বনে গেল পাহারায় থাকা দুই সিআইএ এজেন্ট। যার কাস্টডি, সে নয়, উল্টো বন্দিরা দরজা আটকে দিচ্ছে...তাকেই বরং যুদ্ধ করতে হচ্ছে দরজা খুলতে...এমন ঘটনা কে কবে শুনেছে! কিছু একটা যে গোলমাল আছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না দুই এজেন্টের।

শেষ পর্যন্ত দরজা খোলায় ব্যর্থ হয়ে কোমর থেকে ওয়াকি-টকি বের করল প্রথমজন, যোগাযোগ করল বুলডগের সঙ্গে।

'কী ব্যাপার?' নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইল ব্যুরো চিফ।

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর,' বলল প্রথম এজেন্ট 'স্টোর রুম থেকে কীসের যেন আওয়াজ হচ্ছিল, কিন্তু কী হয়েছে

boiRboi.net

সেটা দেখার জন্য আমরা ভিতরে ঢুকতে পারছি না। বন্দিরা ভিতর থেকে দরজাটা আটকে দিয়েছে।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল বুলডগ।

'জী, স্যর,' এজেন্টের গলায় সন্ত্রস্ত ভাব। 'সত্যি।'

'আমি আসছি,' বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বুলডগ। 'যেভাবে হোক, তোমরা দরজা ভাঙো!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে মেইনটেন্যান্স স্টোরের করিডরে পৌঁছে গেল সে, সঙ্গে আরও দুজন এজেন্টকে নিয়ে এসেছে। দুই প্রহরী ততক্ষণে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে দরজার নব। সঙ্গীদের ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ইশারা করল সে।

চারজনের সম্মিলিত ধাক্কার সামনে টিকতে পারল না চেয়ারটা, ব্যাকরেস্ট ভেঙে কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। খোলা ডোরওয়ে দিয়ে পিস্তল হাতে ঝড়ের বেগে ঢুকল বুলডগ—খোলা জানালা আর সেখান দিয়ে চলে যাওয়া তারটা দেখে যা বোঝার বুঝে গেল সে। পাগলের মত ছুটে গেল চৌকাঠের দিকে। ওপারের দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে গেল প্রতাপশালী ব্যুরো চিফের।

রায়হান তো আগেই পৌঁছেছে, রানাও কেইবলের শেষ প্রান্তে। বুলডগের বিস্ফারিত চোখের সামনে ওকে টেনে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল তরুণ হ্যাকার। মেঝেতে পা রেখে ঘুরে প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল রানা, হাত নেড়ে টা-টা জানাল।

'রানা!!!' তীব্র আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল বুলডগ।

'বেটার লাক নেক্সট টাইম!' রানাও গলা উঁচু করে শোনাল কথাটা। পরমুহূর্তেই স্টিলের দণ্ড থেকে তারের বাঁধনটা খুলে সেটা ফেলে দিল বাইরে। দেখি এবার কীভাবে এপারে আসো বাছাধন! জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও আর রায়হান।

'গড ড্যাম ইট!' পাগলের মত চৌকাঠে কিল বসাল বুলডগ।

'এ কীভাবে সম্ভব!' বোকা বোকা গলায় বলল তার পাশে দাঁড়ানো এক এজেন্ট। 'লোকটা ম্যাজিশিয়ান নাকি! ওই বিল্ডিঙে গেল কী করে?'

ঘুরে এজেন্টের কলার চেপে ধরল বুলডগ। 'ও ম্যাজিশিয়ান না। ও হচ্ছে মাসুদ রানা! পালিয়ে যে গেল, সব তোমাদের কারণে! চোখে চোখে রাখোনি কেন?'

'স্যর, আপনি তো শুধু বাইরে পাহারা দিতে বলেছিলেন...'

'শাট আপ!' হুঙ্কার ছাড়ল বুলডগ। 'যে ফ্লোরে গেল, ওটা কীসের অফিস?'

'ইয়ে...জানি না, স্যর,' থতমত খেয়ে বলল এজেন্ট। 'তবে জেনে নিতে পারি এক্ষুণি।'

তাকে ছেড়ে দিল বুলডগ। 'বের করো। আর ওখানকার বিল্ডিং সিকিউরিটিকে খবর দাও। পুরো টাওয়ার সিল করে দেয়া চাই, বাঙালির বাচ্চাদুটো যেন ওখান থেকে বেরুতে না পারে কিছুতেই।'

'ইয়েস স্যর!' বলে ছুট লাগাল চার এজেন্টই, বসের রুদ্রমূর্তির সামনে থাকতে রাজি নয়।

এজেন্টরা বেরিয়ে যেতেই সচকিত হয়ে উঠল বুলডগ। পাগলের মত জানালার ধারে আবার ছুটে গেল সে। পাশের বিল্ডিঙে তারস্বরে বাজতে শুরু করেছে ফায়ার অ্যালার্ম। কাজটা কার—বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না ধুরন্ধর সিআইএ কর্মকর্তার, রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকল সে।

'রানা, ইউ কানিং সান অভ আ বিচ!'

আগুনের আতঙ্কে পাগলের মত বেরুতে যাচ্ছে বিশতলা টাওয়ারটার প্রতিটা মানুষ। এর ভিতর থেকে সিকিউরিটির পক্ষে

কোনও ভাবেই সম্ভব হবে না নির্দিষ্ট দুজন মানুষকে খুঁজে বের করা বা তাদের আটকানো।

নিষ্ফল হতাশায় খালি মেইনটেন্যান্স স্টোরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল ডগলাস বুলক।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে বসল রানা আর রায়হান। পার্কিং লট থেকে নিজেদের গাড়িটা আনতে গেলে ধরা পড়ে যাবে, তাই ট্যাক্সিই ভরসা। দ্বিতীয় টাওয়ার থেকে লোকজনের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে কোনও অসুবিধেই হয়নি ওদের। কপাল ভাল, পনেরো তলার যে রুমটায় ওরা নেমেছিল, ওটা ছিল ফেডারেল ট্যাক্সেশন অফিসের ফাইলিং কক্ষ—কোনও মানুষ ছিল না রুমটাতে। কাঁচ ভাঙার শব্দ কেউ না কেউ নিশ্চয়ই শুনেছে, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। হয়তো গুরুত্ব দেয়নি, অথবা ব্যাপারটা দেখা নিজের দায়িত্ব নয় ভেবে এড়িয়ে গেছে...ট্যাক্সেশন অফিসে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয় সবাইকে, নিজের কাজের বাইরে অন্য জিনিসে নজর দেয়ার ফুরসত থাকে না কারও। অবশ্য ফাইলিং রুম থেকে অচেনা দুজন মানুষকে বেরোতে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল কয়েকজন, মুখে ভদ্রতাসূচক হাসি ফুটিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে অফিসটা থেকে রায়হানকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে রানা, সৌভাগ্যক্রমে কেউ পথ আটকে দাঁড়ায়নি। করিডরে পৌঁছে ফায়ার অ্যালার্মের সুইচ টিপে দিয়েছিল ওরা...বাকিটা তো পানির মত সহজ!

'কোথায় যাবেন?' যাত্রীরা উঠে বসতেই জিজ্ঞেস করল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

'আগে চলতে শুরু করো,' জবাব দিল রানা। 'পরে বলছি কোথায় যাব।'

boiRboi.net

কী বুঝল কে জানে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাড়িটাকে সামনে বাড়াল ড্রাইভার।

'এবার কী?' ধাতস্থ হয়ে প্রশ্ন করল রায়হান।

'ড. ডোনেনের কাছে যেতে হবে,' রানা বলল। 'এবং সেটা বুলডগের আগেই। নাফিজের সঙ্গে কথা বলা দরকার...'

'আমাদের ফোনদুটো রেখে দিয়েছে ওরা,' মনে করিয়ে দিল রায়হান।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে গলা চড়াল। 'এই যে ভায়া, তোমার কাছে মোবাইল-টোবাইল আছে?'

'মোবাইল!' ড্রাইভার ভুরু কোঁচকাল।

'হ্যাঁ। একটা ফোন করা দরকার। বিনিময়ে বাড়তি দশ...না, না, বিশ ডলার পাবে।'

'ভারি অদ্ভুত লোক তো আপনারা! কোথায় যাবেন, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই...এখন আবার ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে মোবাইল চাইছেন!'

'এত কথা বলতে বলেছে কে তোমাকে?' বিরক্ত হয়ে বলল রায়হান। 'থাকলে দাও, নইলে চুপ করে থাকো।'

বাড়তি টাকার লোভ বোধহয় সামলাতে পারল না ড্রাইভার, পকেট থেকে নিজের মটোরোলা সেটটা বের করে বাড়িয়ে দিল।

ফোনটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডায়াল করল রানা। একবার রিং হতেই ওপাশ থেকে কল রিসিভ করল নাফিজ।

'হ্যালো?'

'নাফিজ...আমি বলছি। বাংলায় কথা বলো।'

'মাসুদ ভাই!' নাফিজের গলায় উৎকণ্ঠা। 'কোথায় আপনারা? সেই কখন থেকে রিং দিচ্ছি...কেউ ফোন ধরছেন না কেন?'

boiRboi.net

'ফোনগুলো আমাদের কাছে নেই য়ে!'

'নেই কেন?'

হালকা গলায় রানা বলল, 'কী আর বলব...নতুন মডেলের সেট ছিল তো, বুলডগের খুব পছন্দ হয়ে গেল। কিছুতেই আর ফেরত দিল না, রেখে দিল। দেখতে পাচ্ছ না, ধার করা নম্বর থেকে তোমাকে কল করছি?'

'বুলডগ রেখে দিয়েছে...হায় খোদা!' বুঝতে পেরে চমকে উঠল নাফিজ। 'আপনাকে তো বলতেই ভুলে গেছি—ডগলাস বুলক দেড় মাস হলো ব্যুরো চিফ হিসেবে জয়েন করেছে এখানে। আপনাকে দুচোখে দেখতে পারে না লোকটা, কোনও ঝামেলা করেছে নাকি?'

'ঝামেলা মানে আমাকে আর রায়হানকে ঠেকানোর জন্য খেপে উঠেছে—এই আর কী! যাক গে, কাজের কথায় এসো। ড. ডোনেনের খোঁজ পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, সেটা জানাবার জন্যই ফোন করছিলাম। কপাল খুব ভাল বলতে হবে, মাসুদ ভাই। আমার এক সোর্স কয়েকদিন আগে নিজ চোখে দেখে এসেছে ভদ্রলোককে, নইলে খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হত।'

'কেন? কোথায় তিনি?'

'আলাস্কার উত্তরে, আর্কটিক সার্কেলের মন্টেগো আইস শেলফে একটা ক্লাসিফায়েড রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করছেন তিনি। বেশিরভাগ ডেটাবেজ থেকে তাঁর নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে, দু'একটাতে যা-ও আছে, সেখান থেকে তথ্য পেতে হলে হাই-লেভেলের ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন। বুঝতেই পারছেন, সোর্স লোকটাকে না পেলে ওভাবে তাঁর লোকেশন বের করা প্রায় অসম্ভব ছিল।'

boiRboi.net

'এত লুকোচুরি কেন? কীসের প্রজেক্ট ওটা—সরকারি?'

'না। ব্রাইটন টেকনোলজিস্ নামে প্রাইভেট একটা কোম্পানি আইস শেলফে ন্যানোটেকনোলজি সংক্রান্ত গবেষণা চালাচ্ছে। খনিজ পদার্থ মাইনিং করবার চেষ্টা করছে বলে শুনলাম। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজের ভয়ে অস্বাভাবিক রকমের সতর্কতা পালন করছে ওরা—সেজন্যেই এই কাণ্ড।'

'আমাদের ওখানে যেতে হবে, নাফিজ,' সিরিয়াস গলায় বলল রানা। 'এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি। ব্যবস্থা করো।'

'একটা প্লেন চার্টার করব?' জিজ্ঞেস করল নাফিজ। 'তবে তাতে সমস্যা আছে। ক্লিয়ারেন্স ছাড়া রিসার্চ প্রজেক্ট এরিয়ায় আপনাদের ল্যান্ড করতে দেয়া হবে না।'

'বুলডগ যেভাবে পিছনে লেগেছে, তাতে এমনিতেও বিমান চার্টার করা ঠিক হবে না,' রানা বলল। 'গোপনে ওখানে ঢোকার কোনও উপায় আছে?'

'হুঁ, আজ রাতে একটা কোম্পানি-বিমান যাবে আইস শেলফে,' বলল নাফিজ। 'তিন দিন পর পর লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে যায় ওটা—লজিস্টিক রি-সাপ্লাই নিয়ে, সঙ্গে লোডিং-আনলোডিঙের জন্য কিছু ওয়ার্কারও থাকে। একটু চেষ্টা করলে আজকের দুজন শ্রমিকের জায়গায় আপনাদের রিপ্লেস করে দিতে পারব আশা করি—টাকা খাওয়াতে হবে দু'চার জায়গায়, আর নকল কাগজপত্র ম্যানেজ করতে হবে...এই যা। তবে সমস্যা একটাই—বিমানটা ল্যান্ড করার পর মাত্র দু'ঘণ্টা থাকে ওখানে। ওই সময়ের ভিতর যদি ড. ডোনেনকে খুঁজে বের করে ফের বিমানে চড়তে না পারেন, তা হলে পাক্কা তিন দিনের জন্য আটকা পড়ে যাবেন।'

'যখনকারটা তখন ভাবা যাবে। ফ্লাইটটা কখন?'

boiRboi.net

'রাত দশটায়।'

'বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে,' চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। 'বুলডগের তো ক্লিয়ারেন্স নিয়ে ঝামেলা নেই, রাতের মধ্যে ডক্টরকে লোকেট করতে...এমনকী গায়ের জোরে রিসার্চ প্রজেক্টেও ঢুকে পড়তে পারবে।'

'সরি, মাসুদ ভাই,' দুঃখ প্রকাশ করল নাফিজ, 'আপাতত এরচেয়ে ভাল কোনও রাস্তা আমার হাতে নেই। যদি চান তো গোপনে একটা বিমানে করে আইসশেলফে ড্রপ দিয়ে আসতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রজেক্টে ইনফিলট্রেট করতে সমস্যায় পড়বেন আপনারা। ওয়ার্কার সেজে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ, সহজে ঢুকে পড়তে পারবেন। বুলডগের লোকজন যদি আগেভাগে পৌঁছেও গিয়ে থাকে, ছদ্মবেশের আড়ালে থাকায় আপনাদের চিনতে পারবে না।'

'কী আর করা!' অগত্যা রাজি হলো রানা। 'তুমি ব্যবস্থা নিতে থাকো। আমি পরে আবার যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

লাইন কেটে দিল রানা, ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিল ফোনটা। তারপর রায়হানের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। বাংলায় চলল কথোপকথন, যাতে ড্রাইভার শুনেও বুঝতে না পারে কিছু।

'হুঁ, আমাদের মূল সমস্যা তা হলে ডগলাস বুলক,' সব শুনে বলল রায়হান। 'তাকে সরিয়ে রাখতে পারলেই পুরো কাজটা কয়েক গুণ সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য, তাই না, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'সমস্যা হলো, সব ধরনের ডেটাবেজে অবাধ অ্যাকসেস আছে লোকটার। তোমার টিচার কোথায়

boiRboi.net

আছেন, সেটা জেনে নিতে খুব বেশি সময় প্রয়োজন হবে না তার।'

'যদি তার অ্যাকসেস নষ্ট করে দিই?' রায়হান বলল। 'যদি এমন অবস্থা করি যে, সব ধরনের ডেটাবেজে সি.আই.এ-র যে-কোনও ইউযারের প্রবেশ নিষিদ্ধ? বিশেষ করে ড. স্ট্যানলি ডোনেনের নামে কোনও সার্চ চালাতে গেলেই যদি ওদের পুরো সিস্টেম হ্যাং করে যায়?'

'সেটা কি সম্ভব?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'খুব সহজ কাজ, মাসুদ ভাই,' রায়হান হাসল। 'আমি শুধু ছোট্ট একটা ভাইরাস ছেড়ে দেব ওদের মেইনফ্রেমে—যা করার ওটাই করবে।'

'সিআইএ-র মেইনফ্রেমে ঢুকবেটা কীভাবে? হ্যাকিং করে? সেটা তো অনেক সময়ের ব্যাপার!'

'একদমই সময় লাগবে না। ওদের সিকিউরিটি প্রটোকল জানি আমি—ওই যে...সাব-প্রোগ্রাম বানাবার সময় যে দিল, ভুলে গেছেন? এত তাড়াতাড়ি বদলে ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। হ্যাকিং করতে হবে না, বুক ফুলিয়ে খোলা দরজা দিয়ে গট গট করে হেঁটে ঢোকার মত মেইনফ্রেমে ঢুকে যেতে পারব।'

'কোডটা এখনও তোমার মনে আছে?' রানা অবাক।

'হ্যাকাররা সাধারণত একবার কোনও কোড পেলে সেটা আর ভোলে না,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল রায়হান। 'এখন আমার শুধু ইন্টারনেট কানেকশনসহ একটা কম্পিউটার দরকার, তা হলেই বুলডগকে সত্যি সত্যি পাগলা কুত্তা করে দিতে পারি।'

চওড়া হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে ভায়া, সবচেয়ে কাছের সাইবার-ক্যাফেটায় নিয়ে চলো দেখি আমাদের!'

দশ

তেসরা মে। সকাল আটটা।

সূর্য উঠেছে অনেকক্ষণ হলো, তবে জানালা গলে চোখে রোদ পড়ার আগে ঘুম ভাঙল না রানার। গতকালকের ছোটাছুটির ধকল আর উত্তেজনায় ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল ও আর রায়হান, প্লেনে উঠে সিটে পিঠ ঠেকানোর পর কখন যে ঘুমে ঢলে পড়েছে—বলতে পারবে না কেউই। রাতের ফ্লাইট হওয়ায় এক দিক থেকে সুবিধে হয়েছে—শুধু ওরাই নয়, সহযাত্রীরাও সবাই এক ঘুমে রাত কাবার করে দিয়েছে। দীর্ঘ যাত্রাপথের বেশিরভাগ সময় কেটে গেছে এতে, অন্য কারও সঙ্গে আলাপচারিতা বা সখ্য গড়তে হয়নি। হাজার হোক, ভুয়া পরিচয়ে রয়েছে ওরা—পরিচয়দুটো খুব তড়িঘড়ি করে অ্যারেঞ্জ করা। নতুন চরিত্রে অভ্যস্ত হবার জন্য কোনওরকম সময় পায়নি রানা বা রায়হান, লোকজনের সঙ্গে যত বেশি কথা বলবে, ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ততই বেশি।

সিআইএ-র লস অ্যাঞ্জেলেস ব্যুরো থেকে পালানোর পর গতকালকের বাকি সময়টা মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটেছে। রায়হানের অনুমান ঠিক ছিল—সিকিউরিটি প্রটোকল বদলে ফেলতে পারেনি বুলডগের লোকজন, তার আগেই সাইবার ক্যাফেতে বসে দ্রুত একটা ভাইরাস তৈরি করেছে ও, সেটা প্ল্যান্ট

করে দিয়েছে সিআইএ মেইনফ্রেমে। এর ফলে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা ড. ডোনেনকে কোনও রকম ডেটাবেজ থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না বলে আশা করছে ওরা। অবশ্য বুলডগের হাতে যদি নাফিজের সোর্সের মত এমন কোনও লোক থাকে, যে বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের খবর জানে—তা হলে আলাদা কথা। ওটুকু ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে, করার কিছু নেই।

রাত পর্যন্ত পালিয়ে বেড়িয়েছে ওরা, কোথাও পনেরো-বিশ মিনিটের বেশি থাকেনি, ট্যাক্সি বা সিটি সার্ভিসের বাসে ঘুরেছে সারা শহরে। নাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে পে-ফোনের মাধ্যমে। শেষে রাত আটটায় একটা নির্জন পার্কিং লটে ওদের সঙ্গে দেখা করেছে শাখাপ্রধান—জাল পরিচয়পত্র, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট, ব্রাইটন টেকনোলজিসের নিয়োগপত্র, সেই সঙ্গে ছদ্মবেশের সরঞ্জাম তুলে দিয়েছে হাতে। চেহারা পাল্টে মেক্সিকান ওয়ার্কার সেজেছে রানা আর রায়হান, কাগজপত্র নিয়ে ঠিক রাত ন'টায় হাজির হয়েছে ব্রাইটনের প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপে—সেখানে রি-সাপ্লাই নিয়ে যাবার জন্য একটা ডিসি-থ্রি কার্গো এয়ারক্রাফট অপেক্ষা করছিল। কাগজপত্র আর ছদ্মবেশ নিখুঁত ছিল, রানাদের সন্দেহ করেনি কেউ—আসল ওয়ার্কারদের টাকা খাইয়ে আগেই বিদায় করে দিয়েছে নাফিজ, তা ছাড়া ওরা এই প্রথম ব্রাইটনের হয়ে কাজ করতে আসছিল, তাই এয়ারস্ট্রিপে আসল মেক্সিকানদের পূর্ব-পরিচিত কেউ ছিল না। নির্বিঘ্নে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে মাল তোলার কাজ করেছে রানা আর রায়হান, লোডিং শেষ হলে চড়ে বসেছে বিমানে। রিসার্চ এরিয়ায় সমস্ত মালামাল আনলোড করে ফিরে আসার কথা শ্রমিকদলটার।

চোখের পাতায় রোদের অত্যাচারে দৃষ্টি মেলল রানা, পাশে তাকিয়ে দেখল—রায়হান এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সামান্য হাঁ

হয়ে আছে মুখটা, চেহারাটা কেমন যেন বাচ্চা-বাচ্চা দেখাচ্ছে। ওকে না জাগিয়ে টয়লেটে গেল রানা, প্রাতঃকৃত্য আর হাত-মুখ ধোয়া সারল। যখন ফিরে এল, তখন জেগে গেছে তরুণ হ্যাকার, হাতের তালু দিয়ে শরীরের এখানে-সেখানে ডলছে।

'ভালই ঠাণ্ডা লাগছে দেখি,' রানাকে এগোতে দেখে বলল ও।

'হুঁ, আর্কটিক সার্কেলে পৌঁছে গেছি,' বলল রানা। ওভারহেড বিন থেকে ব্যাগ নামিয়ে বাড়তি একটা ইনসুলেটেড জ্যাকেট দিল রায়হানকে, নিজেও পরল। প্লেনে চড়ার সময় ব্রাইটনের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন গিয়ার—তার মধ্যে জ্যাকেট ছাড়াও উলের ক্যাপ, নায়লনের প্যান্ট, গ্লাভস্ আর মুনবুট আছে।

'অন্যেরা জেগে ওঠার আগেই বাথরুম সেরে এসো,' বলল রানা। 'একটু একটু করে ঠাণ্ডা কিন্তু বাড়তেই থাকবে, দেরি করলে অসুবিধেয় পড়বে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রায়হান, ও চলে যেতেই জানালার পাশের সিটটা দখল করল রানা, তাকাল বাইরে।

প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ছুটে চলেছে বিমানটা, ইঞ্জিনের গর্জনে কান ঝালাপালা। এই উচ্চতায় গোলাকার পৃথিবীর বড়সড় একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হবার কথা, কিন্তু বিমানটার নীচে মেঘের স্তরের কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁকফোকর পাওয়া যায়, সেখান দিয়ে তাকিয়ে সাগরের সুনীল পানি দেখতে পেল রানা, এখানে-সেখানে উঁকি দিচ্ছে শুভ্র আইসবার্গের ঝলমলে চূড়া—যেন নীল এক চাঁদোয়ায় খচিত হীরকখণ্ড ওগুলো।

হাতঘড়ি দেখল রানা, মনে মনে হিসেব করে বুঝল, অন্তত দু'ঘণ্টা আগে আলাস্কার উপকূল পেরিয়ে এসেছে ওরা, সামনে আরও এক ঘণ্টার জার্নি। ডিসি-থ্রি'র গতি এমনিতেই কম, তার

boiRboi.net

উপর কার্গোতে ভর্তি থাকায় ভারী হয়ে গেছে ওদের বিমানটা; সে-কারণে স্বাভাবিকের চাইতেও ধীরে যাচ্ছে। তিন হাজার মাইলের দূরত্ব পেরোতে সময় নিচ্ছে এগারো ঘণ্টার মত। এটা একটা জেট ফাইটার হলে কতই না ভাল হতো! অর্ধেকেরও কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যেত গন্তব্যে।

পাশে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা—রায়হান ফিরে এসেছে। সিটে বসতে বসতে বলল, 'বাপরে! পানি তো না, যেন বরফ ছুঁয়ে এলাম।'

হেসে ফেলল রানা। 'আমি তো জানতাম তুমি গরম সহ্য করতে পারো না, ঠাণ্ডা বেশি পছন্দ করো। অন্তত তোমার রুমের এসি-র টেম্পারেচার যেভাবে কমিয়ে রাখো...'

'মাইনাস টেম্পারেচার আর এসি-র পনেরো-ষোলো ডিগ্রি কী এক হলো, মাসুদ ভাই। একটা টেম্পারেচার শরীর ঠাণ্ডা করে, অন্যটা আইসক্রিম বানায়। ভয়ই লাগছে এখন।'

'হুম, মেরু অঞ্চলের সার্ভাইভাল ট্রেনিং নাওনি এখনও—সেটা কথা শুনেই বুঝতে পারছি।'

'এ বছরের শুরুতে নাম এসেছিল, কাজের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছি।' বলেই দাঁত দিয়ে জিভ কামড়াল রায়হান। 'এই রে, কথাটা বলে দিয়ে ভাল করলাম না বোধহয়।'

'ভালই করেছ,' রানার গলায় কপট রাগ। 'তোমার ট্রেনিং যে শেষ হয়নি, সেটা জেনে গেলাম। এবার ফিরে গিয়েই তোমার জন্য স্পেশাল ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'মরে যাবো, গুরু!' হাত জোড় করল রায়হান। 'এত বড় শাস্তি দেবেন না।'

'শাস্তি আর দেখলে কোথায়? এই যে এখন আর্কটিকে যেতে হচ্ছে, ট্রেনিংটা করা থাকলে কত্তো সুবিধে হতো, ভাবো তো!'

boiRboi.net

'অসুবিধেই বা দেখছেন কোথায়? ঠাণ্ডায় কাবু মনে হচ্ছে নাকি আমাকে? সম্পূর্ণ ফিট আমি...' বলতে বলতেই *হ্যাঁচ্চো* করে বিশাল এক হাঁচি দিল তরুণ হ্যাকার। নিজেকে সামলে মাথা তুলতেই রানার কপালে ভ্রূকুটি দেখতে পেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'যেখানে বাঘের ভয়...কপালটাই মন্দ আমার। কী আর করা, দিন মাসুদ ভাই, ভালমত ট্রেনিং দিন। বরফ তো বরফ, চাইলে জ্বলন্ত নরকেও পাঠাতে পারেন।'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। আর কিছু না বলে চোখ রাখল জানালায়। কিছুক্ষণ পরেই দিগন্তের কাছে উদয় হলো ভূখণ্ড। আবছা একটা আকৃতি—ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। আরেকটু কাছাকাছি যেতেই চোখে ধরা পড়ল আইস শেলফটার খুঁটিনাটি।

মন্টেগো আইস শেলফ উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড় নিরেট বরফখণ্ডগুলোর একটা। বিরাশিতম অক্ষাংশের উপরে, আলাস্কার উত্তর উপকূল থেকে দুইশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। সাড়ে ষোলো বর্গমাইল আয়তনের এই দ্বীপটার পুরুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচশো ফুট—বেশিরভাগটাই পানিতে ডুবে আছে। ভাসমান হলেও অবিশ্বাস্য আয়তনের কারণে মন্টেগোর নড়াচড়া খুব কম, নেই বললেই চলে। সাগরের স্রোতের এত শক্তি নেই যে, এত বড় একটা জিনিসকে নড়াবে।

পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে বরফে গড়া উঁচু উঁচু একসারি পাহাড় দেখতে পেল রানা, চুড়োগুলো থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে সূর্যের আলো। অবারিত বরফের প্রান্তর থেকেও প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ, পুরো দ্বীপটাই যেন ঝলমল করছে—একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। মে মাস হওয়ায় দিনের এই চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে নইলে আর্কটিক এলাকা বছরের

boiRboi.net

বেশিরভাগ সময় অন্ধকারে ডুবে থাকে।

'উরিব্বাস!' জানালার দিকে ঝুঁকে বাইরের দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে বলে উঠল রায়হান, জীবনে এই প্রথম আইস শেলফ দেখছে ও। 'কী এক দৃশ্য! অপূর্ব!'

'ল্যান্ড করে নিই খালি,' মুচকি হাসল রানা। 'ঠাণ্ডার কামড়ে সমস্ত উচ্ছ্বাস কর্পূরের মত উবে যাবে তোমার।'

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, উচ্চতা কমে আসছে—ল্যান্ড করবে এখন বিমান। তিন হাজার ফুট পর্যন্ত নামতেই অনেক কাছে চলে এল দ্বীপটা, দূরত্ব কমে আসায় জায়গাটাও দেখা গেল পরিষ্কারভাবে: দিগন্ত আড়াল করে দেয়া পর্বতের সারির গোড়া থেকে সাগর পর্যন্ত এলাকাটা বিশাল উপত্যকার মত—পুরোটা তুষারের ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। আইস শেলফের কিনারাগুলো পাহাড়ের খাড়া ক্লিফের মত, ঝপ করে নেমে গেছে এক-দেড়শো ফুট, সোজা গিয়ে মিলেছে সাগরের হিমশীতল পানিতে। উচ্চতা আরও কমতেই বিশাল এক সাদা রঙের গম্বুজ দেখা গেল বরফের উপরে—একটা ডোম। ওটার ভিতরেই সম্ভবত রিসার্চ চলছে।

বাল্কহেডে বসানো স্পিকার জ্যান্ত হয়ে উঠল, সবাইকে সিটবেল্ট বাঁধতে বলছে পাইলট, কয়েক মিনিটের মধ্যে মাটি ছোঁবে ডিসি-থ্রি।

হারনেসের বাকল আটকাতে আটকাতে রায়হান বলল, 'বরফের উপরেই ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে নাকি?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' পোর্টহোল দিয়ে নীচে দৃষ্টি বোলাল রানা। এতক্ষণে কয়েকটা আইস-ট্র্যাক্টর চোখে পড়ল ওর—ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর সাহায্যে বেশ কিছুটা জায়গার বরফ সমান করে একটা মেক-শিফট এয়ারস্ট্রিপ

তৈরি করা হয়েছে।

নাক নামিয়ে নীচের দিকে ছুটে যাচ্ছে বিমানটা, পাঁচশো ফুটে নামতেই শুরু হলো টার্বিউলেন্সের অত্যাচার—গোটা ফিউজলাজ প্রবল ঝাঁকুনিতে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত পিষে উপদ্রবটা সহ্য করবার চেষ্টা করছে যাত্রীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিউজলাজের আর্তনাদ ছাপিয়ে রেট্র্যাক্টেবল ল্যান্ডিং গিয়ার এনগেজ হবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

প্রবল বাতাস বইছে আইস শেলফের উপর দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অবাধ্য আকাশযানটাকে। এই আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আশ্চর্য কৌশলে ব্যালেন্স ধরে রাখল দুই পাইলট—এসব নতুন কিছু নয়, তিন দিন পর পর এখানে আসতে হয় ওদের। অল্প সময়ের মধ্যেই সারফেসের কাছাকাছি চলে এল বিমানটা, সেই সঙ্গে যেন চোখের পলকে গায়েব হয়ে গেল টার্বিউলেন্সের উৎপাত। নাক উঁচু করে পিছনের দুই চাকার উপর ভর দিয়ে ল্যান্ড করল ডিসি-থ্রি, পোর্টহোল দিয়ে দুপাশে তুষার ছিটকাতে দেখল যাত্রীরা। লাগামহীন ঘোড়ার মত বেশ কিছুদূর ছুটল যান্ত্রিক পাখিটা, তবে ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে...দুশো গজ পেরিয়ে একেবারে থেমেই গেল।

ইঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেছে, ওটা এখন আইড্‌লে। সুস্থির হয়ে সবার আগে সামনের সারির সিট থেকে উঠে দাঁড়াল ওয়ার্কারদের ফোরম্যান। নিজের দলের দশ সদস্যের দিকে ফিরে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল সে, তা থেকে জানা গেল—ফুল আর্কটিক গিয়ার পরে সবাইকে নামতে হবে প্লেন থেকে। আইস-ট্র্যাক্টর আসবে অল্প সময়ের মধ্যে, কার্গো সেকশন থেকে সমস্ত মালামাল আনলোড করে ওগুলোয় তুলতে হবে, আবার রিসার্চ প্রজেক্টের স্টোরেজ সেকশনে গিয়ে নামাতে হবে সব। কাজ

শেষ হবার পর সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে মেস-হলে, সেখানে খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রাম শেষে দু'ঘণ্টা পর আবার উড়াল দেবে বিমানটা। সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হলো—অকারণে কেউ যেন এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা না করে, রিসার্চ প্রজেক্ট একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া।

যার যার গিয়ার দ্রুত পরে নিল সবাই। সাধারণ জামাকাপড় তো আছেই, তার উপর দিয়ে নায়লনের জাম্পসুট পরতে হলো প্রথমে, তারপর থাকল পশমের তৈরি ভারী প্যান্ট আর হুড লাগানো জ্যাকেট। সাধারণ জুতো খুলে উলের মোটা দুই প্রস্থ করে মোজা আর মুনবুটও পরল দলটা, হাতে গলাল মোটা মোটা গ্লাভস। প্লেনের কেবিনের ভিতরে এখনও উত্তাপ আছে, আর্কটিকের পোশাক-আশাকে ঘামতে শুরু করল মানুষগুলো। কিন্তু একটু পরে একজিটের দরজা খুলতেই হিংস্র পশুর মত হানা দিল চরম শীতল বাতাস, মুখের উন্মুক্ত চামড়ায় নির্মম কামড় বসাতেই প্রত্যেক যাত্রী উপলব্ধি করতে পারল এই পোশাকের গুরুত্ব।

ফোরম্যান সবাইকে তাড়া দিচ্ছে নীচে নামার জন্য, সিটের সারির মাঝখানের আইল ধরে অন্যান্য ওয়ার্কারদের পিছু পিছু এগোল রানা ও রায়হান, দরজা গলে ল্যাডার বেয়ে আইস শেলফের বরফে পা রাখল। নতুন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আশপাশে—ভারি। শব্দটা বাড়াতে বাড়াতে দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো দুটো বড়সড় আকারের আইস-ট্র্যাক্টর—চওড়া মাল্টিট্রেডের খাঁজকাটা ট্র্যাকগুলো বরফে কামড় বসিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছে যানদুটোকে। দুটোরই পিছনে কন্টেইনার আকারের বড় বড় ট্রেইলার লাগানো আছে—ওতে করেই কার্গো নেয়া হবে। একেবারে বিমানের লেজের কাছে গিয়ে থামল ট্র্যাক্টরগুলো, ব্যাক

boiRboi.net

গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে ট্রেইলারদুটোকে অ্যালাইন করল বিমানের সঙ্গে।

ডিসি-থ্রি'র পিছনের র‍্যাম্প খুলে গেছে, ওয়ার্কারদের সঙ্গে এগোল রানা আর রায়হান, হাত লাগাল আনলোডিঙের কাজে। কার্গো সেকশনের নেট আর সব ধরনের বাঁধন খুলে ফেলা হলো, হাতে বা কাঁধে করে একের পর এক বাক্স আর কার্টন ট্রেইলারে নিয়ে যেতে শুরু করল সবাই। কঠিন কোনও কাজ নয়, পনেরো মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেল তা। তবে এরপরেই আরও পনেরো মিনিট ব্যয় হলো পোর্টেবল একটা ড্রিলিং মেশিন শিফট করতে—আকারে বেশ বড় ওটা, ওজনও অনেক—রিসার্চ প্রজেক্টের অকযিলারি ইকুইপমেন্ট হিসেবে রিসাপ্লাই ফ্লাইটে এসেছে ওটা। ভারী জিনিসটাকে নামাতে প্রায় সব ওয়ার্কারকেই হাত লাগাতে হলো—র‍্যাম্প ধরে নামাতে, তারপর আবার ট্রেইলারে তুলতে ঘাম বেরিয়ে গেল সবার। এত কষ্ট হবার কথা নয়, আসলে পুরু আর্কটিক ক্লোদিঙের কারণে স্বাভাবিক নড়াচড়া করতে পারছে না কেউ, সেজন্যেই এত ঝামেলা হয়েছে।

অবশেষে, আধঘণ্টা পর যখন শিফটিঙের কাজ শেষ হলো, ওয়ার্কারদের তুলে নেয়া হলো আইস-ট্র্যাক্টরে। সংখ্যায় ওরা দশজন, তা ছাড়া ফোরম্যান আর দুই পাইলটও রয়েছে... প্লেক্সিগ্লাসে মোড়া কেবিনে জায়গা হলো না সবার, অর্ধেকের বেশি লোককে দুই ট্রেইলারে মালামালের সঙ্গে গাদাগাদি করে বসতে হলো। ট্র্যাক্টরের কেবিন বায়ু-নিরোধী, তারওপর হিটারের মাধ্যমে চমৎকারভাবে উত্তপ্ত করা—এমন আরামের পরিবেশটাতে যারা জায়গা পেল না, তাদের মুখ দিয়ে গালাগালের তুবড়ি ছুটল।

ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় গ্রুপের সঙ্গে রইল রানা আর রায়হান—মিথ্যে পরিচয় আর ছদ্মবেশে রয়েছে ওরা, যতটা পারে

বিরূপ পরিবেশে থাকাই ভাল, সঙ্গী-সাথীরা খেজুরে আলাপের সুযোগ পাবে না।

ট্রেইলারের রিয়ার ডোর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ভিতরটায় আবছা অন্ধকার। সামনের দিকে, মানুষ-সমান উঁচুতে সরু এক ফালি প্লেক্সিগ্লাস বসানো—সেখান দিয়ে সামান্য আলো আসছে ভিতরে। মৃদু ঝাঁকি আর ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বোঝা গেল, চলতে শুরু করেছে ট্র্যাক্টরদুটো। উঠে দাঁড়াল রানা ও রায়হান, চোখ রাখল ট্র্যাক্টরের মাথার উপর দিয়ে বাইরে। বাকি দুজন ওয়ার্কার হয়তো আগেও এসেছে এখানে, তাই বাইরে তাকাবার আগ্রহ বোধ করছে না, ঠায় বসে শীতে কাঁপছে; দুলছে ঝাঁকুনিতে; সময় গুনছে রিসার্চ প্রজেক্ট পর্যন্ত ছোট্ট জার্নিটা শেষ হবার অপেক্ষায়।

ছোট একটা টিলা পেরিয়ে এল ট্র্যাক্টরদুটো; প্লেক্সিগ্লাসের কল্যাণে সামনের বিস্ময়কর দৃশ্য দুচোখ ভরে উপভোগ করল রানা ও রায়হান।

বরফে মোড়া বিশাল এক প্রান্তর ছড়িয়ে রয়েছে সামনে, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। একেবারে সমতল নয় জায়গাটা, উঁচু-নিচু খানা-খন্দ রয়েছে প্রচুর, তবে এই দূরত্ব থেকে সেগুলোর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সফেদ রঙের প্রাচুর্য ঢেকে দিয়েছে আইসশেলফের পিঠের সমস্ত খুঁত, মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। মাঝখানে একেবারে বেমানান হয়ে মাথা তুলে রেখেছে রিসার্চ প্রজেক্টের বিশাল গম্বুজ-আকৃতির কমপ্লেক্সটা...যেন ফোস্কা পড়েছে বরফের গায়ে—এখনও দু'মাইল দূরে ওটা।

বৃহদায়তন ডোমটা বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে একটা সায়েন্স ফিকশন মুভিতেই মানাবে বেশি। হঠাৎ দেখায় এস্কিমোদের ঈগলু'র মত লাগে জিনিসটাকে, তবে ভাল করে তাকালে চোখে

ধরা পড়ে পার্থক্যটা। বরফের চাঁই নয়, ওটা আসলে প্লেক্সি-পলিসরবেট নামে এক ধরনের অত্যাধুনিক মাল্টি-স্টেজ ইনফ্লেটেবল পলিমারে তৈরি। একেকটা অংশ ঈগলুর চৌকোণা বরফখণ্ডের মতই, বাতাস ভরে ফুলিয়ে নিতে হয়। শেপগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা নিখুঁতভাবে এয়ারটাইটভাবে জোড়া দেয়ার ব্যবস্থা আছে—সেভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে গম্বুজের মত আকৃতি দেয়া হয়েছে, তারপর গোটা জিনিসটাকে তাঁবু খাটানোর পদ্ধতিতে নানা রকম ওয়ায়্যার ও পিটনের সাহায্যে বসানো হয়েছে বরফের উপর। এর ভিতরেই গড়ে উঠেছে ব্রাইটন টেকনোলজির রিসার্চ ফ্যাসিলিটি—অভ্যন্তরের ডায়ামিটার চারশো গজের মত—আকৃতিটা অবিশ্বাস্য।

টিলার ঢাল বেয়ে নীচে নেমে ধীর গতিতে এগোতে শুরু করেছে আইস-ট্র্যাক্টরদুটো, পিছনে মালপত্রভরা ভারী ট্রেইলার টানছে, তাই স্পিড বাড়াতে পারছে না। কমপ্লেক্সের দিকে সরলরেখায়ও যাচ্ছে না—অবারিত আইস শিটের এখানে-ওখানে লুকিয়ে রয়েছে বাহনগুলোকে আটকে ফেলার জন্য অসংখ্য ফাঁদ, সেগুলোকে ফাঁকি দিতে আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল ধরে যাচ্ছে ওগুলো।

চোখের সামনে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল—ঝিরঝির করে তুষার পড়তে শুরু করেছে, ট্র্যাক্টরদুটোর উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে দুরন্ত বাতাস...*ক্যাবাটিক* উইন্ড বলে একে। ক্যাবাটিক শব্দটা গ্রিক, অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামা। মেরু অঞ্চলের ভারী, ঠাণ্ডা বাতাস পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে উন্মত্ত নদীর প্রবাহের মত নীচে ধেয়ে আসে বলে এমন নাম রাখা হয়েছে।

আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে অবাক হবার কিছু নেই—মেরু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই এমন। এই ভাল তো এই

boiboi.net

খারাপ। ঝকঝকে নির্মল প্রকৃতিকে নিমেষে গ্রাস করতে পারে প্রবল তুষারঝড়—স্থায়িত্ব হতে পারে টানা দু'তিন দিন, আবার চোখের পলকে থেমে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়।

গতি কম হলেও আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা ধরে আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ি দেয়া সম্ভব পথটা, তবে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় দশ মিনিট বেশি লেগে গেল। প্রকৃতির নিদারুণ রসিকতাই বলতে হবে, ছোট্ট কনভয়টা কমপ্লেক্সের একদম কাছাকাছি পৌঁছুতেই ঝড়-টড় সব থেমে গেল, আবারও উজ্জ্বল রোদে হেসে উঠল দিগ্বিদিক। ব্যাপারটা লক্ষ করে তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। অতীতের বাজে কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেছে।

বেশ কয়েকটা প্রবেশপথ আছে ডোমে ঢোকার জন্য, ট্রেইলার সহ আইস-ট্র্যাক্টরদুটো চলে গেল সার্ভিস অ্যাকসেসে। স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যেতেই একটা র‍্যাম্প ধরে ঢুকে পড়ল স্টোরেজ সেকশনে, পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে প্লেক্সিগ্লাসের কেবিন থেকে নেমে এল ড্রাইভার, সেইসঙ্গে অন্যান্য আরোহীরা; ট্রেইলারদুটোর রিয়ার ডোরও খুলে দেয়া হলো।

লাফ দিয়ে মাটিতে নামল রানা আর রায়হান। আধো-অন্ধকার থেকে আবার আলোয় ফিরে আসায় ওদের দুই সঙ্গী দৃষ্টি সইয়ে নিতে চোখ পিট পিট করল বারকয়েক। স্টোরেজ সেকশনটা আসলে বিশাল একটা গুদামঘর, অ্যাকসেস ডোর বরাবর সামনে ফাঁকা রয়েছে বেশ অনেকখানি জায়গা—লোডিং-আনলোডিঙের জন্য। গুদামের বাকি অংশের পুরোটা আট-ন'ফুট উঁচু অসংখ্য র‍্যাকে ভর্তি, তাতে হরেক রকমের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ডোমের ভিতরটা সেন্ট্রাল এসি-র নিয়ন্ত্রণে থাকায় আরামদায়ক একটা তাপমাত্রা বিরাজ করছে, জাম্পসুট ছাড়া

boighar.net

উপরের সব কাপড় খুলে ফেলা গেল। মাথার উপরে বড় বড় টিউবলাইট ঝুলিয়ে ভালমত আলোকিতও করা হয়েছে জায়গাটা।

ফোরম্যান তাড়া দিচ্ছে, আনলোডিঙের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়ার্কাররা। বেশিরভাগ কার্টন আর বাক্সের ঠাঁই হলো ওয়্যার-হাউসের বিভিন্ন র‍্যাকে, খাবারভর্তি প্যাকেজগুলো নিয়ে এক গ্রুপ চলে গেল কুক-হাউসে। সবশেষে এল ভারী ড্রিলিং মেশিনটার পালা। ওয়্যারহাউসে চেইন-পুলিসহ কেইবল্-উইঞ্চ আছে, এ-কারণে মাত্র চারজনেই ওটাকে ট্রেইলার থেকে একটা চাকা-লাগানো ট্রলিতে নামিয়ে আনতে পারল।

'গুড জব,' কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করল ফোরম্যান।

অ্যাপ্রন পরা একজন টেকনিশিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, চোখেমুখে বিরক্ত ভাব ফুটে রয়েছে তার। কাছে এসে বলল, 'এটাকে এখানে রেখে দিলেন কেন? মেইন চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে তো, জানেন না?'

শ্রমিকদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হলো, সবাই বিরক্তিসূচক শব্দ করছে। ট্রলিতে বসানো হলেও ড্রিলিং মেশিনটা হালকা কোনও বস্তু নয়, ঠেলে নিয়ে যেতে জান বেরিয়ে যাবে। ব্যাপারটা জানা আছে ফোরম্যানেরও। সে বলল, 'আমাদের কাজ শুধু স্টোরেজ এরিয়াতে মাল পৌঁছানো পর্যন্ত। ভিতরে নিতে হলে নিজেরা নিয়ে যান।'

'কী আশ্চর্য! নিজেরা নিয়ে যান মানে? আমি লোক কোথায় পাব?'

'কেন, এতবড় প্রজেক্ট চালাচ্ছেন...ওখান থেকে দু'চারটে লোক আনতে পারছেন না?'

'এখানকার সবাই বিজ্ঞানী আর তাঁদের সাপোর্ট স্টাফ, কেউ গতর খাটানো শ্রমিক নয়,' গরম গলায় বলল টেকনিশিয়ান।

boiboi.net

'এসব কাজ করার জন্য আপনাদের আনা হয়েছে।'

আঁতে ঘা লেগেছে ফোরম্যানের, মুহূর্তেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল তার। এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের গায়ে গা লাগিয়ে মুখোমুখি হলো সে। 'কী বললেন? আমরা গতর খাটানো শ্রমিক?'

লড়াই একটা বেধেই যেত, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে এল রানা। বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান! ঝগড়া করার মত কিছু ঘটেনি এখানে।' মেক্সিকান অভিবাসীদের অনুকরণে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ইংরেজি বলছে ও। ফোরম্যানের দিকে ফিরল। 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, স্যর...আমি আর এস্তেবান গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি ট্রলিটা।'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না ফোরম্যান, কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রতিপক্ষের দিকে—চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চায়। টেকনিশিয়ান লোকটাও একইভাবে তাকিয়ে আছে দেখে বুঝল, সুবিধে করতে পারবে না। উল্টো ঘুরে গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে।

'এসো আমার সঙ্গে,' রানাকে বলল টেকনিশিয়ান।

হাতছানি দিয়ে রায়হানকে ডাকল রানা। দুজনে মিলে ভারী ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে পিছু নিল লোকটার।

ইচ্ছে করেই ব্যাপারটায় নাক গলিয়েছে রানা। ওয়্যারহাউসে পা রাখার পর থেকেই ওখান থেকে প্রজেক্টের মূল অংশে যাবার উপায় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল ও—ওখানেই কোথাও ড. ডোনেনের থাকবার কথা। কিন্তু শুধু গুদামের সিকিউরিটি দেখেই দমে যেতে হয়েছে। ওয়ার্কারদের চোখে চোখে রাখবার জন্য আলাদা লোক আছে, ওয়্যারহাউস থেকে বেরুবার দরজায়ও আছে সশস্ত্র গার্ড। প্লেন থেকে নামার আগে ফোরম্যান যা বলেছিল, তা বানোয়াট কিছু ছিল নয়, সত্যিই এখানকার সিকিউরিটি অত্যন্ত কড়া। যাকে-তাকে

এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেয়া হবে না। এ পরিস্থিতিতে ড্রিলিং মেশিনটা একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে—বিনা বাধায় প্রজেক্টের ভিতরে ওদের নিয়ে যাবার একটা অজুহাত খাড়া করে দিয়েছে ওটা।

এরপর বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে খুঁজে বের করার পালা। সত্যিই তিনি আছেন তো এখ

এগারো

'সাহায্য করায় ধন্যবাদ,' হাঁটতে হাঁটতে বলল টেকনিশিয়ান। 'তবে ঝামেলাটা কিন্তু আমার জন্য শুরু হয়নি। রজার...মানে তোমাদের ওই ফোরম্যান...আস্ত খচ্চর একটা। প্রতিবারই এসে একটা না একটা গোলমাল পাকায়। আরে বাবা, দু'একটা ইকুইপমেন্ট ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলে ক্ষতিটা কোথায়?'

'আপনিও অবশ্য খোঁচা মেরে কথা বলেছেন।' ফোরম্যানকে একা দোষারোপ করতে রাজি নয় রানা। 'শ্রমিকরা আপনাদের মত বিদ্বান না হতে পারে, তাই বলে ওদের ছোট করে দেখাটা উচিত নয়।'

'ও! গতর খাটাও বলেছি দেখে দুঃখ পেয়েছ? সরি!'

'শরীর খাটিয়ে কাজ করাটা খারাপ কিছু নয়—শ্রমিকরা এতে গর্ববোধ করে। আসলে আপনার বলার ভঙ্গিটা ভাল ছিল না।'

অন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল টেকনিশিয়ান—এই

boiboi.net

মেক্সিকান ওয়ার্কারের ভিতরে কী যেন একটা আছে...ব্যক্তিত্ব, তাই না? আটপৌরে চেহারার সঙ্গে একেবারেই বিসদৃশ ব্যাপারটা। কথা বলার ভঙ্গিতে অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে এই যুবকের, আর চোখ... সেদিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল সে—মণিদুটো আশ্চর্য গভীর, সেখানে মায়া, মমতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতার ছাপ! একজন সাধারণ শ্রমিকের সামনে নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হতে পারে, তা ওর কল্পনাতেও ছিল না।

রানার কথায় বাস্তবে ফিরে এল লোকটা।

'দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? পথ দেখান।'

আবার হাঁটতে শুরু করল টেকনিশিয়ান। জানতে চাইল, 'নাম কী তোমার?'

'হিউগো। আর ও হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই এস্তেবান।'

'আমি নেভিল ব্রিক,' হাসল লোকটা। 'কদ্দিন ধরে ব্রাইটনে কাজ করছ তোমরা?'

প্রশ্নবাণ শুরু হচ্ছে দেখে শঙ্কিত বোধ করল রানা—হিউগো আর এস্তেবান সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না ওরা। এই মুহূর্তে মিথ্যে আর বানোয়াট কথাবার্তা বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে, তবে পরে লোকটা সেসব তথ্য কোথাও মিলিয়ে দেখতে গেলেই গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে আলাপচারিতার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে রাখতে হবে।

'এই প্রথম এসেছি আমরা,' জবাব দিল রানা, তারপর অপরপক্ষকে দ্বিতীয় কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই ছুঁড়ে দিল একটা প্রশ্ন। 'এখানে কী ধরনের গবেষণা চলছে, মি. ব্রিক?'

'এক্সপেরিমেন্টাল মাইনিং অপারেশন—ন্যানোটেকনোলজির সাহায্যে,' বলল ব্রিক। 'প্রযুক্তিটার নাম শুনেছ?'

'শ্রমিক হতে পারি, তাই বলে অকাট মূর্খ নই আমরা, স্যার,'

boiRboi.net

লোকটার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ টের পেয়ে বিরক্তগলায় বলল রানা। 'বিভিন্ন পদার্থের মলিকিউলার লেভেলে কাজ করার পদ্ধতিকেই তো ন্যানোটেকনোলজি বলে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল ব্রিক। 'তোমরা দেখি অনেক কিছু জানো।'

'আমরা শিক্ষিত মানুষ,' বলল রানা। 'ঠেকায় পড়ে শ্রমিকের চাকরি নিয়েছি।'

'তা-ই তো দেখছি।'

স্টোরেজ এরিয়া থেকে বেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ওরা। ফ্যাসিলিটির আবরণটা প্লেক্সিপলিসরবেটের হলেও ভিতরের সবকিছু পার্টিশান করা হয়েছে কাঠ দিয়ে। মোটামুটি বৃত্ত আকারেই কয়েকটা স্তর তৈরি করা হয়েছে, একেকটা স্তরকে আড়াআড়ি দেয়ালের মাধ্যমে ভাগ করে বানানো হয়েছে বিভিন্ন কামরা—ছোট-বড়, সব আকারেরই আছে। মূল ওয়ার্কিং এরিয়াটা পড়েছে কেন্দ্রে, ওখানেই যাচ্ছে ওরা। এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যেতে নির্দিষ্ট প্যাসেজ আছে, সামনে তেমনই একটা তীক্ষ্ণ বাঁক পড়ল, সেখানে দুজন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়ানো। হাত নেড়ে দুই ওয়ার্কারের ব্যাপারে তাদের আশ্বস্ত করল ব্রিক, তারপর আবার এগোল সামনে। পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়েই এমন প্রহরা আছে, কিছুক্ষণ পর পর সেগুলো পেরোতে হচ্ছে ওদের।

ডোমটা বিশাল, এর কোথায় ড. ডোনেন আছেন, কে জানে! রানা ভেবে দেখল, আলাপচারিতার একটা সুযোগ যখন সৃষ্টি হয়েছে, ব্রিকের কাছ থেকে কথাচ্ছলে ব্যাপারটা জেনে নেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই ও প্রশ্ন করল, 'আইস শেলফে কী ধরনের মাইনিং করা সম্ভব...তাও আবার ন্যানোটেকনোলজির সাহায্যে?'

'বায়ুমণ্ডলের চেয়ে নিরেট বরফ থেকে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন,

boiboi.net

অক্সিজেন...এমনকী ডিউটেরিয়ামও পাওয়া অনেক সহজ, আমরা ন্যানোরোবোটিক্সের মাধ্যমে ওই কাজটাই করবার চেষ্টায় আছি।'

'ন্যানোরোবোটিক্স!'

'হ্যাঁ, মাইক্রোস্কোপিক সাইজের মেশিন ওগুলো—সাধারণ মানুষ, বা যন্ত্রের চেয়ে অনেক দ্রুত আর দক্ষভাবে কাজ সারতে পারে। বরফের মলিকিউলার লেভেলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় ওগুলো—বরফ গলিয়ে সাধারণ পানি বানায়, তারপর সেটাকে দ্বিতীয় একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে ডিউটেরিয়াম অক্সাইড, মানে ভারী পানিতে রূপান্তরিত করে।'

ভারী পানি কী জিনিস, জানা আছে রানার—নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার হয় ওটা। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না, ভারী পানি কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করতে হয়। সারা পৃথিবীর প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন বেশ কম, ফলে জিনিসটার চাহিদা খুব বেশি, দামও অনেক। ব্রাইটন টেকনোলজি তাদের ব্যবসার জন্য ভাল একটা সেক্টরই বেছেছে। তবে ওরা যে পদ্ধতিতে উৎপাদনের কথা বলছে, সেটা আগে কখনও শোনেনি ও। তাই একটু বিস্ময় নিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ন্যানোটেকনোলজির সাহায্যে ডিউটেরিয়াম অক্সাইড মাইনিঙে সফল হয়েছেন?'

'পুরোপুরি সফল হলে কি আর এতবড় রিসার্চ প্রজেক্ট খুলে বসে আছি?' হাসল ব্রিক। 'গবেষণা চলছে, বুঝলে? ছোটখাট অগ্রগতি দুয়েকটা হয়েছে বটে, তবে পুরো প্রসেসটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি প্রয়োগ করতে এখনও অনেক দেরি।'

'কী ধরনের অগ্রগতি হয়েছে?'

'মাইক্রোস্কোপিক রোবট বা ন্যানোবট তৈরি করা হয়েছে, তবে ওগুলোকে এখনও পুরোপুরি কর্মক্ষম করা সম্ভব হয়নি। আপাতত ওগুলোর এফিশিয়েন্সি বাড়াবার চেষ্টা চলছে...'

boiRboi.net

বক বক করে যাচ্ছে নেভিল ব্রিক, এই ফাঁকে ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখে নিল রানা—প্যাসেজের মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র গার্ড আছে, কেউ কেউ টহলও দিচ্ছে; এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে ক্লোজ সার্কিট টিভি ক্যামেরা দেখতে পেল ও। প্যাসেজের দুপাশে কিছুক্ষণ পর পর দরজা দেখা যাচ্ছে—ওগুলো নানা ধরনের ল্যাব আর ওয়ার্কশপের প্রবেশপথ—সবগুলোতেই ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক ফিট করা আছে, অ্যাকসেস কোড ছাড়া ঢোকা যাবে না। ন্যানোটেকনোলজি সংক্রান্ত আবিষ্কার যাতে চুরি হয়ে না যায়, সেজন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করেছে ব্রাইটন। ব্রিকের কথায় আবার মনোযোগ ফেরাল ও।

'...কম্পিউটারাইজড় অপারেশনটা ডেভেলপ করেছেন অত্যন্ত প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী—ড. স্ট্যানলি ডোনেন,' গল্প করার মেজাজে রয়েছে ব্রিক, গড়গড় করে প্রজেক্ট সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে যাচ্ছে সে। 'ইতোমধ্যে ন্যানোবটের এফিশিয়েন্সি শুরুর অবস্থা থেকে দুইশো পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।'

'তাই নাকি?' বলল রানা। 'ভারি গুণী লোক তো! তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ব্রিক। 'ভদ্রলোক ভীষণ কাজপাগল, দরকার ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করেন না। এই যে...এই করিডর ধরে একটু সামনে গেলেই তাঁর অফিস আর ল্যাবরেটরি।' আঙুল তুলে ডানদিকের একটা প্যাসেজ দেখাল ব্রিক। 'গিয়ে লাভ নেই, দরজাই খুলবেন না হয়তো।'

রানা আর রায়হান দাঁড়িয়ে পড়েছে, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে প্যাসেজটার দিকে—লক্ষ্যের এত কাছাকাছি পৌঁছে অন্য কোথাও যেতে মন চাইছে না।

'থেমে গেলে কেন? তাড়াতাড়ি চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে,'

boiRboi.net

তাগাদা দিল ব্রিক।

আবারও ট্রলিটা ঠেলে টেকনিশিয়ানের পিছু নিল রানা আর রায়হান। একটু পরেই বড় একটা অ্যাকসেস ডোর পেরিয়ে ওয়ার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে গেল তিনজনে। ডোমের কেন্দ্রস্থল এটা—বিশাল একটা বৃত্তাকার চত্বরের মত। নানা ধরনের ইউনিফর্ম পরে বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা কাজে ব্যস্ত ওখানে। যন্ত্রচালিত উইঞ্চ, মোটর, ড্রিলসহ হাজারো যন্ত্রপাতি আর মানুষের কোলাহলে কান ঝালাপালা।

প্রবেশপথের পাশেই একটা বড় টেবিলে রাখা আছে অনেকগুলো হার্ডহ্যাট, সেখান থেকে দুটো তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ব্রিক, নিজেও পরল একটা। 'এগুলো মাথায় দাও।'

হার্ডহ্যাট পরে লোকটাকে অনুসরণ করল রানা ও রায়হান, ট্রলিটা নিয়ে গেল ওয়ার্কিং এরিয়ার একটা পাশে, অন্যান্য আরও ইকুইপমেন্ট আছে ওখানে।

'এই যে...এখানে রাখো।...হ্যাঁ, হয়েছে।' সন্তোষ ফুটল ব্রিকের চেহারায়। 'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের।'

'না, না, ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রায়হান। 'আমাদের কাজই তো এটা।'

'তাতে কী? আর তো কেউ এল না। ওরা সবাই গেছে খাওয়া-দাওয়া করতে, অথচ তোমরা কষ্ট করে এই ভারী জিনিসটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে এলে...কৃতজ্ঞতা না জানালে অন্যায় হবে।'

'ইটস্ ওকে,' হাত তুলে টেকনিশিয়ানকে থামাল রানা। 'আমরা কি যেতে পারি এখন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলল ব্রিক। 'এদিকে অনেক কাজ, এগিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না বলে দুঃখিত। নিজেরা ফিরতে পারবে?'

'পারব। সবখানে সাইনবোর্ড আছে দেখেছি, মেস-হল খুঁজে

BoiRboi.net

পেতে অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে, তা হলে বিদায়। আশা করি ভবিষ্যতে কোনও রি-সাপ্লাই ফ্লাইটে এলে আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই,' বলে দ্রুত পা চালাল রানা ও রায়হান। হার্ড-হ্যাটদুটো আগের জায়গায় রেখে বেরিয়ে এল ওয়ার্কিং এরিয়া থেকে।

'এবার কী, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল রায়হান।

'প্রশ্ন করছ যে? ড. ডোনেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, ভুলে গেছ?'

'তা ভুলিনি। কিন্তু সবখানে সিকিউরিটি আছে, দেখতে পাচ্ছি। স্যরের ল্যাবে যাবার পথে কেউ আটকালে কী জবাব দেব?'

'যাতে না আটকায়, সে-ব্যবস্থা নিতে হবে। আসার পথে একটা ড্রেসিং রুমের দরজা দেখেছি, ওখানে চলো।'

কপাল ভাল ওদের, ড্রেসিং রুমটা শূন্য। ক্লজিটে অ্যাপ্রনসহ ট্রাউজার আর টেকনিশিয়ানদের রাবার বুটও পাওয়া গেল। দ্রুত পোশাক পাল্টে প্রজেক্টের স্টাফ সাজল ওরা, মাথায় দিল জকি ক্যাপ—ট্রলি নিয়ে আসবার পথে অনেককেই দেখতে পেয়েছে এই পোশাকে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা চালাল দুই বিসিআই এজেন্ট, মাথা নিচু করে ক্যাপের কার্নিশে মুখ ঢেকে রেখেছে। একটু পরেই পৌঁছে গেল নেভিল ব্রিকের দেখিয়ে দেয়া করিডরটার মুখে। আসবার পথে দু'একজন ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে বটে, তবে এই মুহূর্তে কেউ নেই আশপাশে। দ্বিধা না করে প্যাসেজে ঢুকে পড়ল রানা আর রায়হান, হাঁটতে হাঁটতে দুপাশের দরজাগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছে—ড. ডোনেনের ল্যাবের সামনে নিশ্চয়ই তাঁর নামফলক থাকবে।

দেখতে দেখতে প্রায় ত্রিশ গজ দীর্ঘ করিডরটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা, এখন পর্যন্ত কোনও দরজায় কোনও ধরনের ল্যাব বা ড. ডোনেনের নাম চোখে পড়েনি। সামনে নিরেট দেয়াল, এগোবার পথ নেই। থেমে দাঁড়াতে হলো।

'ব্যাপারটা কী?' বোকা বোকা গলায় বলল রায়হান। 'স্যারের তো চিহ্নও দেখছি না। এদিকে এমনকী মানুষজনেরও সাড়াশব্দ নেই। ব্রিক ব্যাটা ভুল করল না তো!'

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে রানার মাথায়, ও নিজেও কম অবাক হয়নি। পরমুহূর্তে একটা সম্ভাবনা মাথায় আসতেই সচকিত হয়ে উঠল। তাই তো, না চাইতেই ব্রিক লোকটা নিজ থেকে এই করিডরটা দেখিয়ে দিল কেন? এমন একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়ায় ওদেরকে এসকর্ট ছাড়া মেস-হলে একা ফিরতে বলল কেন? তা ছাড়া ড্রেসিং রুমটা খালি ছিল, এ পর্যন্ত আসতেও কেউ বাধা দেয়নি...ব্যাপারগুলো অস্বাভাবিক নয়? স্টোরেজ সেকশনে, এমনকী ওয়ার্কিং এরিয়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত করিডরের বাঁকে বাঁকে সিকিউরিটি ছিল, অথচ এখানে ড. ডোনেনের মত গুরুত্বপূর্ণ একজন বিজ্ঞানীর ল্যাবের কাছে কেউ নেই কেন?

প্রশ্নগুলোর জবাব একটাই, আর সেটা বুঝতে পেরে তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন। নিজেকে চড় কষাতে ইচ্ছে হচ্ছে, স্রেফ আনাড়ির মত কাজ করে বসেছে ও। বিরক্ত গলায় বলল, 'ব্রিক ভুল করেনি, রায়হান। ইচ্ছে করেই দেখিয়ে দিয়েছে এই করিডরটা।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা একটা ফাঁদ...আর তাতে গাধার মত পা দিয়ে বসেছি আমরা।'

রানার কথাটাকে সত্যি প্রমাণের জন্যই যেন কানে ভেসে এল মেঝেতে বুটের ভারি পদশব্দ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দৃষ্টিসীমায়

boiRboi.net

উদয় হলো, ছ'জন সিকিউরিটি গার্ড—সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, তাক করে রেখেছে দুই অনুপ্রবেশকারীর দিকে।

'ওয়েল, ওয়েল, আমার ধারণাই তা হলে ঠিক?' পিছন থেকে গার্ডদের ঠেলে সামনে বেরিয়ে এল নেভিল ব্রিক। 'আমাদের সুশিক্ষিত দুই শ্রমিক আসলে পরিচয় গোপন করছে? শুরুতেই সন্দেহ হয়েছে আমার—তোমরা সাধারণ কেউ নও। আমাকে এতই বোকা পেয়েছ? এখন তো ঠিকই ধরা পড়ে গেলে...কী, ঠিক বলেছি না?'

সংকীর্ণ এই করিডরটা থেকে পালাবার পথ নেই, অদৃষ্টকে মেনে নিল দুই বাঙালি যুবক। ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলে আনল দু'হাত।

বারো

লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র। সকাল ন'টা।

সারারাত অফিসে কাটিয়েছে ডগলাস বুলক, বাড়ি ফেরেনি। ফিরতে দেয়নি কাউকেই। রাতটা কেটেছে নির্ঘুম অবস্থায়। মাথায় আগুন জ্বলছে তার, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সেই আগুনের উত্তাপ। রায়হানের ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক—সত্যিই মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা হয়েছে লোকটার।

নিষ্ফল রাগে চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে বুলডগ, যখন টের পেয়েছে সর্বনাশটা। প্রথমে মনে হচ্ছিল যান্ত্রিক ত্রুটি, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ভাইরাসটা সনাক্ত করতে পেরেছে এজেন্ট

নিউটন। ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। সিআইএ ডেটাবেজ কাজ করছিল না বলে এফবিআই ডেটাবেজ ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল—রায়হানের ভাইরাসটা ঢুকে পড়েছে ওখানেও। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড—স্বাভাবিক কাজকর্ম সবই করা যাচ্ছে, শুধু ড. স্ট্যানলি ডোনেন সংক্রান্ত যে-কোনও তথ্য খুঁজতে গেলেই হ্যাং হয়ে যাচ্ছে দেশজোড়া গোটা নেটওয়ার্ক। পুরো সিস্টেমটা বন্ধ করে আবার রি-স্টার্ট করলে তবেই নতুন করে কাজ করা যায়। বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংলির হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে ফোন—স্বয়ং ডিরেক্টর গালাগাল করে চোদ্দোগুষ্টি উদ্ধার করেছেন বুলডগের, ধমক দিয়ে বলে দিয়েছেন—ভাইরাসটা না সরানো পর্যন্ত যেন সে আর ডেটাবেজ ব্যবহারের চেষ্টা না করে।

কে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে এবং কীভাবে ছড়িয়েছে, তা জানতে বাকি নেই কারও। মাসুদ রানার হ্যাকার সঙ্গীর হাতে গোটা নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি প্রটোকল তুলে দিয়েছে বুলডগ, ওদের দুজনকে আটকে রাখতে পারেনি, এমনকী ওরা পালিয়ে যাবার পর দ্রুত প্রটোকলটা বদলে ফেলারও ব্যবস্থা নেয়নি, এমন অযোগ্যতার ক্ষমা হয় না। গালাগাল খাবে না তো খাবেটা কী? কিন্তু এসব যুক্তি মাথায় ঢুকছে না বুলডগের, সে শুধু একটা কথাই ভাবছে—আরও একবার মাসুদ রানার কারণে সবার কাছে অপদস্থ হতে হলো তাকে। এত বছরের ক্যারিয়ারে যেখানে কেউ কোনওদিন বাঁকা চোখে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি, সেখানে ওই বাঙালি ছোকরার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে শুধু অপমান আর অসম্মান জুটছে কপালে। ব্যাপারটা ভাবলেই রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে বুলডগ, সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চারপাশ থেকে, চেতনায় ভাসছে শুধু রানাকে নিজ হাতে খুন করার জিঘাংসা।

তবে সেটা শুধু কল্পনাই, বাস্তবে প্রাণের শত্রুকে কাছে না পেয়ে

boiRboi.net

অফিসের সবার ওপর ঝাল মেটাচ্ছে ব্যুরো চিফ—যে-ই তার সামনে পড়ুক, গালিগালাজ না খেয়ে ফিরতে পারছে না। শুরুর দিকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় রিপোর্ট দিতে, সেইসঙ্গে এটা-ওটা প্রয়োজনে চিফের কাছে আসা-যাওয়া করছিল এজেন্টরা; পরে গালি খেতে খেতে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে তারা, একেবারে অনন্যোপায় না হলে কিছুতেই আসছে না।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এজেন্ট নিউটনের। আই.টি. এক্সপার্ট সে, রায়হানকে সিকিউরিটি প্রটোকল দেয়ার ব্যাপারেও সমর্থন জানিয়েছিল...এ কারণে বুলডগের রাগ সবচেয়ে বেশি তার উপরে। সামনে পড়তে হচ্ছে না, ইন্টারকমে খানিক পর পরই তাকে বাক্যবাণে উত্তম-মধ্যম দেয়া হচ্ছে। নাওয়া-খাওয়া-ঘুম...কোনও কিছুরই সুযোগ দেয়া হয়নি বেচারাকে। গতকাল থেকে সে কম্পিউটারের সামনে, অবিরাম রায়হানের ছড়িয়ে দেয়া ভাইরাসটাকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজটা সহজ নয় মোটেই, একজন জন্মগত জিনিয়াসের প্রোগ্রামিঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে নিজের সমস্ত মেধা ব্যয় করতে হচ্ছে নিউটনকে।

কম্পিউটারের সাহায্য নিতে না পারায় হাতের কাছে যত এজেন্ট ছিল, তাদের সবাইকে মাঠে নামিয়েছে বুলডগ, সেই সঙ্গে নেয়া হচ্ছে পুলিশ এবং এফবিআইয়ের সাহায্য। যত রকম ইনফরমার আর সোর্স আছে, তাদেরকেও কাজে নামানো হয়েছে। এত কিছুর পরও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন ড. ডোনেন, খোঁজ পাওয়া যায়নি রানা বা তার হ্যাকার সাগরেদেরও। বিজ্ঞানীকে যে পাওয়া যায়নি, তার পিছনে রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখাপ্রধান নাফিজের কূটকৌশলের যে বিরাট ভূমিকা আছে, সেটা জানে না বুলডগ।

যারা ড. ডোনেনের অল্প-স্বল্প হদিসও জানে, নিজস্ব সোর্সের

মাধ্যমে তাদের তালিকা জোগাড় করেছে নাফিজ। বুলডগ তার নিজস্ব লোকজনকে মাঠে নামাবার আগেই এসব মানুষকে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন সেফহাউসে লুকিয়ে ফেলেছে ও—কেউ কেউ স্বেচ্ছায় গেছে, আর যারা যেতে চায়নি, তাদের জোর করে তুলে আনা হয়েছে। পুরো পৃথিবীকে বাঁচাবার মিশনে নেমেছে বিসিআই, এখন আর কারও ব্যক্তিগত মতামত শোনার অবস্থা নেই। তবে তুলে আনা এসব মানুষগুলোকে কোনও অসম্মান করা হয়নি, খাতিরযত্নের মধ্যে বহাল তবিয়তেই আছেন তাঁরা... রানারা ড. ডোনেনের কাছে পৌঁছে গেলে ওঁদের আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পাবেন।

রাতভর কুরে কুরে খাওয়া অবিরাম টেনশনের হাত থেকে নিজেকে রেহাই দিতে সূর্য ওঠার পর নিজের অফিসের সোফায় শুয়ে চোখ বুজেছিল বুলডগ, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও জানে না। ন'টা বাজতেই দরজায় টোকার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল।

পাল্লা ফাঁক করে এজেন্ট নিউটন উঁকি দিচ্ছে। 'আসতে পারি, স্যর?'

'এসে তো পড়েইছ! আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠল বুলডগ, তার মেজাজ এখনও আগের মতই চড়া।

কী বলবে বুঝতে না পেরে থতমত খাওয়া চেহারা নিয়ে চুপ করে রইল নিউটন।

'গাধার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' ধমক লাগাল বুলডগ। 'ঢোকো ভিতরে।'

'ইয়েস, স্যর,' বলে ঢুকে পড়ল নিউটন, পিছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

সোফা থেকে উঠে ডেস্কের অন্যপাশে নিজের চেয়ারে বসল বুলডগ। কাঁচা ঘুম ভাঙায় মাথা ধরেছে খুব—ইন্টারকমে

boiRboi.net

সেক্রেটারিকে কফি দিয়ে যেতে বলল। তারপর তাকাল আইটি এক্সপার্টের দিকে। না কামানো গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে জিজ্ঞেস করল, 'খবর আছে কোনও? নাকি নিজের চাঁদবদন দেখাতে এসেছ?'

'সুখবরই নিয়ে এসেছি, স্যর। ভাইরাসটা দূর করা গেছে—সারারাত ল্যাংলির এক্সপার্টদের সাহায্য নিয়ে কাজ করেছি আমি, সফল হয়েছি।'

নিউটনের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথার সত্যতা। এক রাতেই বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে তার—চামড়ায় পড়েছে ভাঁজ, দু'চোখের নীচে কালি, মণিদুটো ঘুমের অভাবে টকটকে লাল হয়ে আছে। উস্কোখুস্কো মাথার চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির মাঝখানেও চেহারায় আনন্দিত একটা ভাব ফুটে রয়েছে—সম্ভবত সাফল্যের কারণেই। এক ধমকে বেচারার ওই খুশিটুকুও কেড়ে নিল বুলডগ।

'দাঁত কেলাচ্ছ কেন? ভাইরাস সরিয়ে দুনিয়া উদ্ধার করে ফেলেছ নাকি? অকর্মার ধাড়ি কোথাকার...ডোনেনের বাচ্চার খোঁজ পেয়েছ কি না সেটা বলো!'

বিষম খেল নিউটন। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'জ্... জী, স্যর। সেটাও সম্ভব হয়েছে।'

'তা হলে আসল কথা না বলে নিজের গুণকীর্তন করছ কেন?' হুঙ্কার ছাড়ল বুলডগ। 'কোথায় লোকটা?'

'ব্রাইটন নামে একটা কোম্পানির মেইনফ্রেমে হানা দিতে হয়েছে আমাদেরকে...বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ওদের হয়ে একটা গোপন গবেষণার কাজ করছেন, সেজন্যেই এত লুকোচুরি। এই মুহূর্তে মন্টেগো আইস শেলফে ওদের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে আছেন তিনি।'

'মন্টেগো আইস শেলফটা আবার কোথায়?'

boiboi.net

'আর্কটিকে...আলাস্কা থেকে দুশো মাইল উত্তর-পুবে।'

'হোয়াট! লোকটা অ্যামেরিকার মাটিতেই নেই?'

'জী না, স্যর।'

ঝামেলা কয়েক গুণ বেড়ে গেল—পরিষ্কার বুঝতে পারছে বুলডগ। ড. ডোনেন দেশের ভিতরে...এমনকী ইয়োরোপে থাকলেও কোনও অসুবিধে ছিল না, ওখানকার স্থানীয় সিআইএ এজেন্টদের পাঠিয়ে খুব অল্প সময়েই তুলে আনা যেত। গতকাল থেকে শুধু এই একটা বিষয় ভেবেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল সে—লোকটার খোঁজ পেতে একটু কষ্ট হলেও তাকে বাগে পেতে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু এখন সেই সান্ত্বনাটুকুও উবে গেছে। সভ্যজগৎ ছেড়ে ওই হতভাগা বিজ্ঞানীটা কিনা ঠাঁই নিয়েছে মেরু অঞ্চলে... এক টুকরো ভাসমান বরফের উপরে! ওখানে তার নাগাল পাওয়া যাবে কেমন করে?

সমস্যা শুধু এই একটা নয়, হারামজাদা মাসুদ রানার ভয়ও মন থেকে তাড়াতে পারছে না বুলডগ। সমস্ত লোক লাগিয়ে কাজ হয়নি, বাঙালি ছোকরার টিকিটিরও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যেমন ত্যাঁদোড় লোক, বাজি ধরে বলা যায়—ডোনেনের খোঁজ বহু আগেই পেয়ে গেছে সে, আইস শেলফের দিকে রওনা হয়ে গেছে...বলা যায় না, হয়তো পৌঁছেও গেছে। যদিও সব ধরনের বাস-ট্রেন স্টেশন আর এয়ারপোর্টে ফেউ বসানো হয়েছিল, তারপরেও রানার মত ওস্তাদ স্পাইয়ের জন্য ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া কোনও ব্যাপারই নয়। আতঙ্কিত বোধ করল বুলডগ—ড. ডোনেন একবার বিসিআইয়ের হাতে চলে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ভেবে-চিন্তে একটাই আশার আলো দেখতে পাচ্ছে বুলডগ। সন্দেহ নেই যে, রানা তার উপরমহলের মাধ্যমে সবখানে ইউনো-ভাইরাসের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে; তারপরও দুনিয়ার

কোনও দেশই বিদেশি একটা ইন্টেলিজেন্সের দেয়া ওয়ার্নিং শুনে নিজেদের কম্পিউটারাইজড্ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবে না—স্বস্তি বলতে এটাই। মানেটা হলো, রানা আর ওর হ্যাকার চ্যালাটাকে আটকাতে পারলে...সেই সঙ্গে যদি বিজ্ঞানীটাকেও হাত করা যায়, তা হলে ভাইরাসটাকে ঠেকাবার আর কেউ থাকে না।

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, বুঝতে পারল বুলডগ। পরিস্থিতি এখনও আয়ত্তের বাইরে যায়নি, চেষ্টা করলে সামাল দেয়া সম্ভব। তিন টার্গেট—মাসুদ রানা, রায়হান রশিদ আর ড. স্ট্যানলি ডোনেনকে কোথায় পাওয়া যাবে—জানা আছে তার। সমস্যা দূরত্ব এবং লোকবল নিয়ে। তিন হাজার মাইল দূরের ওই আইস শেলফে এই মুহূর্তে লোক পাঠানো যাবে কীভাবে? নিজেই বা স্বল্পতম সময়ে ওখানে পৌঁছুবে কেমন করে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুদ্ধি পেয়ে গেল ধুরন্ধর সিআইএ কর্মকর্তা। করণীয় ঠিক করতে এক মুহূর্তও লাগল না।

'নিউটন, এক্ষুণি খোঁজ নাও—আইস শেলফটার এলাকায় আমাদের নেভি বা কোস্ট গার্ডের কোনও শিপ আছে কি না। কুইক!'

ছুটে বেরিয়ে গেল এজেন্ট নিউটন, ফিরে এল একটু পরেই। বুলডগ তখনও সেক্রেটারির দিয়ে যাওয়া কফিটা শেষ করতে পারেনি।

'আছে, স্যর!' উত্তেজিত গলায় রিপোর্ট দিল আই.টি. বিশেষজ্ঞ। 'কোস্ট গার্ডের একটা কাটার—*নিউবার্গ*...মন্টেগো থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে টহল দিচ্ছে ওরা। অর্ডার দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে পারবে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট!' এই প্রথম হাসি ফুটল বুলডগের ঠোঁটে। নিউটনকে বিদায় করে দিয়ে টেনে নিল টেলিফোনটা, যোগাযোগ

করল সিআইএ ডিরেক্টরের সঙ্গে।

এখনও অফিসে পৌঁছাননি ডিরেক্টর, রাস্তায়...গাড়িতে আছেন। ফোন পেয়ে খুব একটা খুশি শোনাল না তার গলা। নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যালো?'

'ডগলাস বুলক, স্যর।'

'হ্যাঁ...কী ব্যাপার?'

গুছিয়ে পুরো পরিস্থিতিটা খুলে বলল বুলডগ—ড. স্ট্যানলি ডোনেন কোথায় আছেন, সেই সঙ্গে রানা আর রায়হানের কারণে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে—সব।

'কী করতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করলেন ডিরেক্টর।

'কাছাকাছি কোস্টগার্ডের একটা শিপ আছে। আমি চাই, ওরা গিয়ে বিজ্ঞানী ব্যাটাকে তুলে আনুক। রানাকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে ওকেও অ্যারেস্ট করুক। এ ছাড়া এয়ারফোর্সের একটা এফ-১৪ ফাইটারও দরকার, যাতে আমি চারঘণ্টার মধ্যে মন্টেগোতে পৌঁছুতে পারি।'

'তোমার যা ক্ষমতা এবং পজিশন, তাতে এই কাজগুলো তুমি নিজেই করতে পারো। আমাকে বলছ কেন?'

'আপনার ক্লিয়[illegible]।'

'ক্লিয়ারেন্স-ট্রিয়া প্রমাণ দিয়ে[illegible]ারব না,' পরিষ্কার বলে দিলেন ডিরেক্টর। 'দেখো ডগলাস, তুমি[illegible]পুরনো লোক, আশা করি সবকিছু ভেঙে বলে দিতে হবে না? প্রাইভেট একটা কোম্পানির রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে জোর করে ঢুকে স্বনামধন্য একজন বিজ্ঞানীকে তুলে আনতে চাইছ, সেই সঙ্গে চাইছ বিদেশি দুজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে আটক করতে...অ্যামেরিকার সীমানার বাইরে! এসবের পিছনে মূল উদ্দেশ্য হলো একটা ভাইরাসের আঘাতে গোটা পৃথিবীর কম্পিউটার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া...ব্যাপারটা কতটা

গুরুতর, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই? সফল হলে আমরা তোমার পিছে আছি, কিন্তু যদি ব্যর্থ হও—এতবড় কেলেঙ্কারির বোঝা টানা সম্ভব নয় আমাদের দেশের পক্ষে। কেন অনুমোদন দেব না, বুঝতে পারছ তো? যা করার একা তোমাকেই করতে হবে, ব্যর্থ হলে যাতে আমরা বলতে পারি—তুমি সব নিজ থেকে করেছ, আমরা কিচ্ছু জানতাম না। পারমিশন চেয়ো না, এজেন্সির রিসোর্স ব্যবহার করো যত খুশি, আমি বাধা দেব না। তবে যতক্ষণ না সাকসেসফুল হচ্ছ, কোনও স্বীকৃতি পাবে না। ঠিক আছে?'

'বুঝতে পারছি, স্যর।'

'চোখ-কান বন্ধ করে রাখলেও তোমার সাফল্য কামনা করছি আমি, ডগলাস। খুব বড় একটা সুযোগ আমাদের সামনে; দেখো, গড়বড় যেন না হয়। বিশেষ করে ওই রানা ছেলেটা কিন্তু খুব ডেনজারাস।'

'আপনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন, স্যর,' দৃঢ় গলায় বলল বুলডগ। 'মাসুদ রানা কেন, দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই এবার আমাকে ব্যর্থ করে।'

'তা-ই যেন হয়। শুভকামনা রইল।' বলে লাইন কেটে দিলেন ডিরেক্টর।

boiRboi.net

তেরো

মন্টেগো আইস শেলফ।

ব্রাইটন টেকনোলজির বিশালাকৃতি ডোম থেকে এক মাইল

দূরে পাহাড়ের দুইশ' ফুট উঁচু ঢালে বসে আছে তিন জনের আততায়ী দলটা। সাদা রঙের ক্যামোফ্লাজ পোশাক তাদের পরনে, সঙ্গে যেসব ইকুইপমেন্ট আর অস্ত্র আছে, সেগুলোও ক্যামোফ্লাজ করা। তুষারশুভ্র এই জগতে হঠাৎ দেখায় ওদের আলাদা করা যায় না। অস্তিত্ব গোপন করার ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব শুধু পোশাক আর ইকুইপমেন্টের রঙের নয়, মানুষ তিনজনকেও দিতে হবে। কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে নিজেদের অদৃশ্য করে ফেলতে হয়, তা ওদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না।

সাধারণ কোনও ভাড়াটে খুনী নয় ওরা, দুনিয়ার সবচেয়ে কঠোর ট্রেনিং পাওয়া কমাণ্ডো বাহিনী—অ্যামেরিকান আর্মির ডেল্টা ফোর্সের প্রাক্তন সদস্য তিনজনেই। চাইলে আজও দেশসেবা করে যেতে পারত, তবে দেশের চাইতে নিজেকে বেশি গুরুত্ব দেয় ওরা, চায় অঢেল অর্থ আর ক্ষমতার মালিক হতে। সেজন্যেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে মানুষ খুনের পেশা বেছে নিয়েছে।

তারমানে এই নয় যে, দক্ষতায় একবিন্দু মরচে ধরেছে ওদের। ডেল্টা ফোর্সকে ট্রেনিং দেয়াই হয় মানুষ মারার অব্যর্থ যন্ত্র হবার জন্য। অবিশ্বাস্য দ্রুততা এবং নিপুণ কৌশলে শত্রু নিধন করতে তাদের তুলনা নেই। কথাটার সত্যতা গত ছ'টা টার্গেটকে পৃথিবী থেকে সরাবার সময় প্রমাণ দিয়েছে এরা। ছ'জন মানুষকে নিখুঁত প্ল্যানিঙের মাধ্যমে এমনভাবে সরিয়েছে, যাতে কোথাও সামান্যতম আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু সাত নম্বর টার্গেটে এসে অসহায় বোধ করছে তিন খুনী। ডুইট গার্ডনারের বেলায় ঝুঁকিপূর্ণ একটা কোর্স অভ অ্যাকশনের মাধ্যমে কাজটা সারা সম্ভব হলেও এখানে এমনকী সেরকম কোনও সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে না. দুর্ঘটনা ঘটানো তো অনেক পরের কথা। হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়, ডেডলাইন থেকে

boiRboi.net

পাক্কা দুটো দিন বেশি পেরিয়ে গেলেও কার্যোদ্ধার হয়নি। আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে প্যারাশুটে করে রাতের অন্ধকারে আইস শেলফে নেমে এসেছে ওরা, সেই থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেকনাইস্যান্স চালানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই—খাবারদাবার যা আছে, তাতে আর একটা দিন হয়তো চালানো যাবে কষ্ট করে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে আবহাওয়াটা। আর্কটিক পরিবেশে ভাল একটা আশ্রয় ছাড়া রাত কাটানোটা অভিশাপের মত, এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয় অস্তিত্ব ফাঁস হবার ভয়ে আরোপিত হাজারটা বিধিনিষেধ, তখন পুরো ব্যাপারটা নরকবাসের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। সঙ্গে থাকা ছোট্ট তাঁবুটা রাত না হলে খাটানো যায় না, ধোঁয়া আড়াল করার জন্য আগুন জ্বালতে হয় কদাচিৎ—তা-ও ছোট্ট করে; এ ছাড়াও পাহাড়ের ঢালে পজিশন নেয়ায় সারাক্ষণ সইতে হচ্ছে ক্যাবাটিক উইন্ডের অত্যাচার—এই কষ্টকে দুনিয়ার আর কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

শুধু ট্রেনিঙের জোরে টিকে আছে টিমটা, তারপরেও সাতদিন পেরিয়ে যাওয়ায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ওরা ভেঙে পড়তে পারে যে কোনও মুহূর্তে। এত কষ্ট করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না খুনীদের নেতা কঠিন চেহারার যুবকের; বিশেষ করে তিন দিনের মাথাতেই যখন সে বুঝতে পেরেছে যে, এখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে টার্গেটকে মারা সম্ভব নয়, তখুনি বিকল্প কায়দায় কাজটা সারতে চেয়েছিল...কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র—সবই আছে খুনীদের কাছে। রিসার্চ প্রজেক্টের একশো লোক বা ত্রিশজন সিকিউরিটি পার্সোনেল কোনও সমস্যাই নয়, সরাসরি হামলা চালিয়ে টার্গেটকে খতম করে দিয়ে আসতে পারে ওরা...এতসব মানুষকে মোকাবেলা করেও! কিন্তু

ওদের নিয়োগকর্তা...যাকে রেডিও কমিউনিকেশনে ওরা *আলফা-যিরো* বলে ডাকে...সে অত্যন্ত সতর্ক মানুষ, নিতান্ত বাধ্য না হলে চরম পদ্ধতি ব্যবহার করতে রাজি নয়। আর সেটারই মাশুল গুনতে হচ্ছে রেডিও ল্যাঙ্গুয়েজে *আলফা টিম* নাম পাওয়া এই দলটাকে, সব ধরনের সাপ্লাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের এখানে বসিয়ে রাখছে আলফা-যিরো; আদেশ দিয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করতে।

ছোট্ট একটা চাতালের মত জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির উপর নজর রাখছে খুনীদের নেতা আর তার সহকারী—এদের কোডনেম হচ্ছে *আলফা-ওয়ান* আর *টু*। তৃতীয় সদস্য, মানে *আলফা-থ্রি* বসে আছে কয়েক গজ পিছনে, কানে হেডফোন লাগিয়ে। আকাশের দিকে মুখ করে এক ফুট ডায়ামিটারের একটা পোর্টেবল স্যাটেলাইট ডিশ বসানো হয়েছে ওখানটায়—ওটার সাহায্যে নিজেদের কমিউনিকেশন চালানোর পাশাপাশি ফ্যাসিলিটির সঙ্গে বহির্বিশ্বের সব ধরনের যোগাযোগ মনিটর করছে ওরা।

হঠাৎ একটা রেডিও কমিউনিকেশন শুরু হওয়ায় হেডফোনটা ভাল করে কানের উপর চেপে ধরল আলফা-থ্রি। আর দশটা সাধারণ কমিউনিকেশনের মত নয় এটা, দু'পক্ষের উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুনতে শুনতে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল তার, চোয়াল ঝুলে পড়ল। ঝট করে হেডফোন নামিয়ে চেঁচাল সে, 'আলফা-ওয়ান! আলফা-ওয়ান!!'

'কী হয়েছে?' বিনকিউলার নামিয়ে সঙ্গীর দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল দলনেতা।

'বিশাল সমস্যা...সব কেঁচে যেতে বসেছে।'

'মানে!'

boiRboi.net

'ইউ. এস. কোস্ট গার্ডের একটা জাহাজ থেকে ফ্যাসিলিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে—দু'ঘণ্টার মধ্যে আসছে ওটা এখানে, ড. স্ট্যানলি ডোনেনকে তুলে নিয়ে যাবে। কী নাকি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি...ভদ্রলোককে দরকার, রেডি থাকতে বলেছে।'

'হোয়াট!'

'ফ্যাসিলিটির ওরা প্রতিবাদ করছে, কিন্তু কথা শুনতে রাজি নয় কোস্টগার্ড। বলছে, বাধা দিলে শক্তি ব্যবহার করা হবে।'

'গড ড্যাম ইট!' তড়াক করে উঠে বসল আলফা-ওয়ান। 'যিরোর সঙ্গে যোগাযোগ করো—এখুনি!'

কমিউনিকেশন সেটের নব ঘোরাতে শুরু করল তৃতীয় খুনী, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল আলফা-যিরোর। 'ইয়েস?'

হেডপিসটা মাথায় দিল কঠিন চেহারার যুবক। 'দিস ইজ আলফা-ওয়ান।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'বিরাট বিপদ দেখা দিয়েছে...টার্গেটকে পিকআপ করতে দু'ঘণ্টার মধ্যে ইউ.এস. কোস্টগার্ডের একটা শিপ আসছে এখানে।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আলফা-যিরো।

'কানে ভুল শুনছ না, ঠিকই বলছি আমি।'

'সান অভ আ বিচ...'

'গালাগালটা কাকে দিচ্ছ, জানতে পারি? নিজেকে দাও...এসব তোমার দোষেই ঘটছে কি না! আগেই বলেছিলাম টার্গেটকে শেষ করে দিই, ডেডলাইন পেরুনোর দুদিন পরও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে এমন তো হবেই!'

'মুখ সামলে কথা বলো!' খেঁকিয়ে উঠল আলফা-যিরো। 'ভুলে যেয়ো না, আমি কে! পুরো নকশাটা আমি সাজিয়েছি...একা আমি!

boighar.net

এখন পর্যন্ত যতদূর এগোনো গেছে...প্ল্যানটা সফল হবার মত একটা পরিস্থিতি যে সৃষ্টি হয়েছে...সব আমার কারণে। আমার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার মত স্পর্ধা তোমার হলো কী করে?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হার মানার ভঙ্গিতে বলল আলফা-ওয়ান। 'আমারই ভুল হয়েছে। এখন কী করব, তা-ই বলো।'

'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে যখন, সরাসরি অ্যাকশনে যাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। দু'ঘণ্টা মাত্র সময়...এর ভিতরে কাজটা সারতে পারবে?'

'কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। মূল সমস্যাটা অন্যখানে। কাজ শেষ করবার পর আমাদের পালানোর কী হবে? ধরা পড়ে যাই, তা নিশ্চয়ই চাও না?'

'পালানো নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। মন্টেগোর কাছাকাছি একটা গ্লেশিয়ারে তোমাদের জন্য হেলিকপ্টার রেখেছি আমি—পাইলটসহ। সিগনাল দিলে বিশ মিনিটের মধ্যে এসে তোমাদের পিকআপ করে নিয়ে যেতে পারবে। গ্লেশিয়ারটায় ক্যামোফ্লাজ নেট আছে, ফিরে গিয়ে গা-ঢাকাও দিতে পারবে। কেউ তোমাদের খুঁজে পাবে না।'

'গুড। তা হলে কাজে নামছি আমরা।'

'গো অ্যাহেড। খবরদার, ডোনেন যেন অ্যামেরিকানদের হাতে কিছুতেই না পড়ে!'

'পড়বে না,' কথা দিল আলফা-ওয়ান। 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না—ওরা লোকটার পিছে লাগল কেন? ইউনোদের কেউ চেনে না বলে জানতাম।'

'এসব নিয়ে পরেও ভাবা যাবে,' বলল আলফা-যিরো। 'আগে ওর মুখ বন্ধ করাটা জরুরি।'

'ধরে নাও, মুখ বন্ধই হয়ে গেছে।' হেলিকপ্টারকে সিগনাল

দেয়ার কোড আর ফ্রিকোয়েন্সি জেনে নিয়ে রেডিও লিঙ্কটা বিচ্ছিন্ন করে দিল আলফা-ওয়ান।

পুরো আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে ভাল করে তল্লাশি করা হয়েছে রানা আর রায়হানকে, তারপর হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি ইনচার্জের অফিসে। এই মুহূর্তে দুটো চেয়ারে বসে আছে ওরা, অস্ত্র তাক করে পাহারা দিচ্ছে তিনজন গার্ড। মুখ যেন পাথরে খোদাই করা লোকগুলোর, কোনও অভিব্যক্তি ফুটছে না। কথাও বলছে না কেউ, অস্বস্তিকর নীরবতায় কেটে গেছে আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট। শেষ পর্যন্ত উসখুস করতে করতে রায়হান বলল, 'একটু পানি হবে? আমার খুব পিপাসা পেয়েছে।'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না প্রহরীদের মধ্যে, আগের মতই অনড় রইল তারা, জবাবও দিল না।

'ভীষণ অভদ্র তো!' গজগজ করল রায়হান। 'এক গ্লাস পানি দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'বাদ দাও,' রানা বলল। 'অর্ডার ছাড়া কিচ্ছু করবে না ওরা, খামোকা রাগ করে কোনও লাভ নেই। সিনিয়র কেউ আসুক, তার কাছে যত খুশি পানি আর খাবারদাবার চেয়ো।'

ওর কথাতেই যেন খুলে গেল দরজাটা। ইউনিফর্ম পরা নতুন একজন মানুষকে ঢুকতে দেখা গেল—বয়স্ক, হাবভাবে নেতৃত্বের ছাপ। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোনও ঝামেলা করেনি তো?'

মাথা নাড়ল এক প্রহরী। 'পানি খেতে চাইছিল।'

'দাও পানি। সঙ্গে বিস্কুট-টিস্কুটও দাও। একটু পর তো মার-ই খাবে...তার আগে পেটে দানা-পানি কিছু পড়ুক। পেটে খেলে পিঠে সয়—এটা জানো তো?'

boiRboi.net

মাথা ঝাঁকাল প্রহরী, বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

'মারবেন নাকি?' আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল রায়হান।

'সেটা নির্ভর করছে আপনারা নিজ থেকে মুখ খোলেন কি না, তার উপর,' টেবিলের অপরপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল লোকটা। 'তবে আমার অভিজ্ঞতায় বলে, প্যাঁদানি না দেয়া পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ এজেন্টরা মুখ খোলে না।'

'সেটাই ভাবছেন আপনি?' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনার ধারণা, আমরা অন্য কোম্পানির হয়ে স্পাইং করতে এসেছি এখানে?'

'ধারণা নয়, স্থির বিশ্বাস।' নিশ্চিত একটা ভাব লোকটার বলার ভঙ্গিতে। 'অবশ্য...স্যাবোটাজ করতেও এসে থাকতে পারেন। কোন্‌টা আপনাদের আসল উদ্দেশ্য—তা খুব শীঘ্রি জেনে নিতে যাচ্ছি আমি।'

'আপনি ভুল করছেন, মিস্টার...'

'ট্রেভর ব্লিকম্যান—আমি এই ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি চিফ।' পালা করে দুই বন্দির চেহারা দেখল ব্লিকম্যান। 'আপনাদের নামদুটো জানতে পারি? নাকি ওগুলোও প্যাঁদানি না খাওয়া পর্যন্ত বলবেন না?'

'আমি মাসুদ রানা। আর ও হচ্ছে রায়হান রশিদ।'

'মাসুদ রানা?' ব্লিকম্যানের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'হ্যাঁ। আমরা কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্ট নই, মি. ব্লিকম্যান। এখানে এসেছি ড. স্ট্যানলি ডোনেনের খোঁজে—সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণে। আমি আসলে একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্মের...'

হাত তুলে ওকে থামাল ব্লিকম্যান। 'জাস্ট আ মিনিট, রানা এজেন্সির কথা বলছেন তো? ত্রিশ বছর ধরে সিকিউরিটি সেক্টরে কাজ করছি, ওদের সম্পর্কে ভালই আইডিয়া আছে আমার। সমস্যা

হচ্ছে, এজেন্সিটার ডিরেক্টরের ছবি দেখেছি আমি, আপনার সঙ্গে তার চেহারার কোনও মিল নেই।'

টান দিয়ে গোঁফ আর আলগা দাঁতের পাটিটা খুলে ফেলল রানা। 'এবার মেলে?'

'মাই গড!' বিস্মিত গলায় বলল ব্লিকম্যান। 'আপনি দেখছি সত্যিই মি. রানা!'

'এবার আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে?'

হাসি ফুটল ধুরন্ধর সিকিউরিটি চিফের ঠোঁটে। 'মোটেই না, মি. রানা। ছদ্মবেশ খুলে আপনি বরং আমার সন্দেহটাকে আরও পাকাপোক্ত করে দিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্টের চেয়ে কয়েক গুণ খতরনাক লোক আপনি, স্যর। নিশ্চয়ই কোনও কুমতলব আছে, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ফ্যাসিলিটিতে ঢুকেছেন সেজন্যেই।'

'একথা কেন ভাবছেন?'

'উদ্দেশ্য যদি ভাল কিছুই হতো, ব্রাইটনের হেড অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে পারতেন না?'

'পারমিশন নেয়ার মত পরিস্থিতি বা সময়—কোনওটাই ছিল না আমাদের হাতে।'

'তাই নাকি? কী এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, জানতে পারি?'

থমকে গেল রানা। আস্তে আস্তে বলল, 'সেটা খুব গোপনীয় একটা বিষয়—আপনাকে বলা যাবে না।'

হেসে উঠল ব্লিকম্যান। 'এই তো ধরা পড়ে গেলেন, মি. রানা! সৎ কোনও উদ্দেশ্য থাকলে আমাকে বলতে দ্বিধা কেন?'

'খামোকা সন্দেহ করছেন আপনি, মি. ব্লিকম্যান,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলে লাভটা কী আমার? আমি একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালাই, আপনাদের এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটি নিয়ে আমার কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে?'

boiRboi.net

'আমাকে বোকা ভাববেন না, মি. রানা,' গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল সিকিউরিটি চিফের। 'আপনার ওই ফার্মের কীর্তিকলাপ ভাল করেই জানা আছে আমার—বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে ওটা। প্রবাসী বাঙালিদের মালিকানাধীন বেশ কয়েকটা কোম্পানি আমাদের কম্পিটিটর, ওদেরই কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে ভাড়া করেছে এখান থেকে ফর্মুলা আর ডেটা চুরি করার জন্য।'

'চুরি করার নীতিতে চলে না রানা এজেন্সি, আমিও ঘৃণা করি এ-ধরনের কাজ। এখানে আমরা এসেছি স্রেফ ড. ডোনেনের সঙ্গে দেখা করতে, আর কিছু নয়।'

'আমাদের প্রজেক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটার সঙ্গে নিশ্চয়ই শুধু কুশল বিনিময় করতে আসেননি? কী দরকার তাঁকে?'

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে।'

'আমাকেই জানতে হবে, মি. রানা...সবার আগে!' রাগী গলায় বলল ব্লিকম্যান। 'আমি জানতে চাই, ভদ্রলোক হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলেন কেন? আপনি এসেছেন...আসছে ইউ.এস. কোস্টগার্ডের একটা শিপও। কেন...কী প্রয়োজন তাঁকে?'

'কোস্টগার্ড!' রানার ভুরু কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ, রীতিমত হুমকি দেয়া হয়েছে আমাকে—ডক্টরকে ভালয় ভালয় ওদের হাতে তুলে না দিলে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কেন? কী করেছেন তিনি?'

রানা আর রায়হান দুজনই চমকে গেছে খবরটা শুনে। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একটা শব্দই উচ্চারণ করল ওরা—'বুলডগ!'

'কী?' কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে ভ্রূকুটি করল সিকিউরিটি চিফ।

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস, মি. ব্লিকম্যান। হাতে একদম সময় নেই, কোস্টগার্ড এসে পড়লে

boiRboi.net

সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমাদেরকে এক্ষুণি ড. ডোনেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ইম্পসিবল, মি. রানা, তা সম্ভব নয়। ড. স্ট্যানলি ডোনেন আমাদের প্রজেক্টের একজন কী-পার্সোনেল। তাঁর মাথায় গিজগিজ করছে রিসার্চ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য। আপনারা তো দূরের কথা, কোস্টগার্ডের হাতেও ভদ্রলোককে তুলে দেব না আমরা। হেড অফিসে যোগাযোগ করা হয়েছে, ব্রাইটনের ডিরেক্টররা ওয়াশিংটনের কোস্টগার্ড হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলে এর একটা বিহিত বের করছেন।'

হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, এই লোককে বোঝাতে যাওয়া বৃথা—বুলডগেরই আরেক সংস্করণ যেন সে।

পানির গ্লাস আর বিস্কুট নিয়ে ফিরে এসেছে প্রথম গার্ড। সে যখন ঢুকছে, তখন দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে হইচই শোনা গেল, কে যেন ভিতরে আসতে চাইছে, দরজার বাইরে দাঁড়ানো সেন্ট্রিরা বাধা দিচ্ছে তাকে।

'ঢুকতে দাও আমাকে!' চিৎকার শোনা গেল।

'হোয়াট দ্য হেল...' উঠে দাঁড়াল ব্লিকম্যান, দরজার পাল্লা খুলে মুখোমুখি হলো উত্তেজিত মানুষটার। 'ড. ডোনেন! আপনি এখানে কী করছেন?'

'সরে দাঁড়াও, ট্রেভর। আমাকে ভিতরে যেতে দাও।'

'এখানে আসাটা একদম উচিত হয়নি আপনার।'

ধাক্কা দিয়ে সিকিউরিটি চিফকে সরিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী। 'সরো! উচিত-অনুচিত আমি বুঝব।'

একরকম জোর করেই রুমে ঢুকে পড়লেন প্রৌঢ় মানুষটা। দেহটা ছোটখাট, ঠোঁটের উপরে সুন্দর করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা গোঁফ। নাকের উপরে বসানো আছে মাঝারি পাওয়ারের চশমা—

BoiRboi.net

লেন্সের মাঝ দিয়ে দু'চোখে উঁকি দিচ্ছে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার ঝিলিক।

'আপনার অনেক কাজ,' অভিযোগের সুরে বলল ব্লিকম্যান। 'সেসব ফেলে সামান্য দুজন কয়েদিকে দেখতে আসাটা ঠিক না। এদের নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য আমরা আছি।'

'হুঁহ্, কাজ-টাজ সব লাটে উঠেছে,' বললেন ডোনেন। 'কোস্টগার্ডের শিপ আসছে আমাকে নিতে, জানো না? তোমার সাধ্য নেই ওদের বাধা দাও।'

'আমাদের এত ছোট করে দেখাটাও ঠিক না, ডক্টর।'

'ওসব ডায়ালগ মেরো না, তোমাদের দৌড় আমার জানা আছে।'

বিরক্তি ফুটল সিকিউরিটি চিফের চেহারায়। 'এত খেপেছেন কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'যাবার আগে এদের চেহারাটা দেখতে চাই আমি।' দুই বন্দির দিকে ফিরলেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী। 'জানতে চাই, কারা এরা? কেন আমার মরণ চায়?'

'মরণ!'

'হ্যাঁ, ট্রেভর,' থমথমে গলায় বললেন ড. স্ট্যানলি ডোনেন। 'এই দুজন আমাকে খুন করতে এসেছে!'

boiRboi.net

চোদ্দো

প্রৌঢ় বিজ্ঞানীর কথা শুনে চমকে উঠল রানা আর রায়হান। কী বলছেন ভদ্রলোক! ওরা তাঁকে খুন করতে এসেছে—এমন ধারণা

করার কারণটা কী?

'আপনি শিয়োর?' জিজ্ঞেস করল ব্লিকম্যান, তার কপালে ইতোমধ্যে ভাঁজ পড়ে গেছে।

'মোর দ্যান শিয়োর,' দৃঢ়গলায় বললেন ডোনেন, রানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের পরিচয় কী? কে তোমাদের পাঠিয়েছে এখানে?' বলার ভঙ্গিতে উত্তেজনা ফুটল।

'আমাদের কেউ পাঠায়নি, ডক্টর,' শান্তভাবে জবাব দিল রানা। 'আমরা আপনাকে খুন করতেও আসিনি।'

'মিথ্যে কথা বলে লাভ হবে না,' ডোনেন মাথা নাড়লেন। 'আমি জানি, তোমরা ভাড়াটে খুনী ছাড়া আর কিছু নও।'

'আপনার ধারণা ভুল।'

'স্যর, আমাকে চিনতে পারছেন না?' রায়হানের গলায় ব্যাকুলতা। 'আমি রায়হান।'

'কোন্ রায়হান?'

'রায়হান রশিদ...আপনার ছাত্র!' হঠাৎ ছদ্মবেশের কথা মনে পড়ল তরুণ হ্যাকারের—রাবারের তৈরি একটা নকল নাক আর পরচুলা পরেছে ও। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল সেগুলো। 'এবার চিনতে পারছেন?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল বিজ্ঞানীর। 'ও মাই গড...রায়হানই তো!' নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেলেন দু'পা। 'কতদিন পর দেখা...কিন্তু তুমি এখানে কী করছ, মাই বয়?'

ভদ্রলোক ওকে চিনতে পেরেছেন দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রায়হান। বলল, 'আপনার কাছেই এসেছি স্যর...খুব জরুরি একটা বিষয় নিয়ে।'

ভুরু কোঁচকাল ব্লিকম্যান। 'আপনি একে চেনেন, ডক্টর?'

'হ্যাঁ, আমার পুরনো ছাত্র। অনেকদিন দেখা নেই।' রায়হানের

boiRboi.net

দিকে ফিরলেন ডোনেন। 'হঠাৎ করে কী হয়েছিল তোমার, তা আজও জানতে পারিনি। স্কলারশিপ সারেন্ডার করে দেশে ফিরে গিয়েছিলে কেন?'

'ইয়ে...ওটা এক লম্বা গল্প,' ইতস্তত করে বলল রায়হান। 'পরে কখনও শোনাব আপনাকে। কিন্তু এখন অন্য একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। সেটা আপনার ওই...মানে...বিশেষ কোডটা নিয়ে।'

চেহারায় মেঘ জমল ডোনেনের। চোখের ইশারায় রানাকে দেখালেন। 'এটা কে?'

'আমার বস...এক অর্থে বড় ভাইও বলতে পারেন—মি. মাসুদ রানা।'

'নাইস টু মিট ইউ, ডক্টর,' হাসিমুখে বলল রানা। 'দুঃখিত, মি. ব্লিকম্যান এত চমৎকারভাবে তশরিফ রাখতে দিয়েছেন যে, আপনার সঙ্গে হাতটা মেলাতে পারছি না।' হাতকড়াটা দেখাল ও।

সিকিউরিটি চিফের দিকে তাকালেন ডোনেন। 'এদের হাতকড়া খুলে দাও, ট্রেভর।'

ব্লিকম্যানের চেহারায় বিস্ময় ফুটল। 'হলোটা কী আপনার! যারা আপনাকে খুন করতে এসেছে, তাদেরই হাতকড়া খুলে দিতে বলছেন?'

'ভুল হয়েছে আমার। রায়হান আর যা-ই করুক, আমাকে খুন করতে চাইতে পারে না। ও আমার ছেলের মত।'

'ওই ছোকরার কথা বলতে পারি না, তবে এই মাসুদ রানাকে আপনি চেনেন না, ডক্টর। ওর মত ডেনজারাস লোক পৃথিবীতে খুব কম আছে। সত্যি সত্যি আপনাকে খুন করতে এসে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। তা যদি না-ও হয়, নির্ঘাত স্যাবোটাজ করতে এসেছে।'

boiRboi.net

'কী, মি. রানা, সত্যিই স্যাবোটাজ করতে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তেমন কিছু করতে চাইলে তো যখন ওয়ার্কিং এরিয়াতে গেলাম, তখনই করতে পারতাম।'

'শুনলে তো?' ব্লিকম্যানকে বললেন ডোনেন। 'ছাড়ো ওদের এবার। এই দুজনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

গজগজ করে উঠল সিকিউরিটি চিফ, তবে মেনে নিল কথাটা। আদেশ পেয়ে এক প্রহরী এগিয়ে এসে দুই বন্দির হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিল। মুক্তি পেয়ে দুই কবজি ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল রানা আর রায়হান।

'এবার বলুন, হয়েছেটা কী?' জানতে চাইলেন ডোনেন।

আড়চোখে ব্লিকম্যানকে দেখল রানা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'শুনলেনই তো, আপনার সেই কোডটা সংক্রান্ত ব্যাপার। একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই আপনাকে প্রয়োজন।'

ভুরু কুঁচকে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকালেন ডোনেন। 'কী কী বলেছ তুমি মি. রানাকে?'

'ইয়ে...' আমতা আমতা করল রায়হান। 'আমি যা জানি, তার সবটাই।'

'গড ড্যাম ইট, রায়হান!' রেগে গেলেন বিজ্ঞানী। 'মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম না তোমাকে?'

'হ্যাঁ...কিন্তু...'

'আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। শুধু এটা বলো—ইউ. এস. কোস্টগার্ড কি এ-কারণেই আমাকে নিয়ে যেতে আসছে?'

মনে মনে বিজ্ঞানীর বুদ্ধির তারিফ করতে বাধ্য হলো রানা। একই সময়ে অ্যামেরিকান জাহাজ আর ওদের দুজনের উপস্থিতির মধ্যে যোগসূত্রটা ধরে ফেলেছেন ভদ্রলোক।

boiRboi.net

আচমকা আক্রমণে ঘাবড়ে গেছে রায়হান। ফ্যাল ফ্যাল করে রানার দিকে তাকাল সাহায্যের আশায়, কিন্তু ও কিছু বলছে না দেখে মৃদু স্বরে দিল উত্তরটা, 'হ্যাঁ, স্যর। ঠিকই ধরেছেন।'

'কোস্টগার্ড আমার ব্যাপারে জানল কী করে?'

এবার মুখ খুলল রানা। 'আসলে ডক্টর...কোস্টগার্ড না, আপনাকে হাতে পেতে চাইছে সিআইএ। আমার ধারণা, ওরাই শিপটাকে অর্ডার দিয়েছে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য।'

'চমৎকার!' বিদ্রূপ ঝরল ডোনেনের কণ্ঠে। 'কোস্টগার্ড হলে ব্যাপারটা ঠিক জমছিল না। তা...এই যে আমার পিছনে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি লেগে গেল, সেটা নিশ্চয়ই গুণধর রায়হান রশিদ পেটে কথা রাখতে পারেনি বলে?'

উত্তর দেয়ার আগে একটু দ্বিধা করল রায়হান। অভিযোগটা মিথ্যে নয় একেবারে—ইউনোদের সম্পর্কে ওর কাছ থেকে রানা, আর রানার কাছ থেকে বুলডগ জেনেছে। ওভাবে চিন্তা করলে দোষটা ওরই। তাই কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'ইয়ে...এক অর্থে ধরতে গেলে...হ্যাঁ, আমিই ফাঁস করেছি আপনার নাম।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. ডোনেন। 'আমি খুব হতাশ হয়েছি, রায়হান। তোমাকে আমি নিজের ছেলের মত ভাবতাম, বিশ্বাস করে নিজের গোপন কথাটা জানিয়েছিলাম, আর তুমিই কি না...'

'পুরো ঘটনাটা না জেনে ওকে দোষারোপ করাটা উচিত হচ্ছে না আপনার,' মন্তব্য করল রানা।

'বলুন তা হলে, কী এমন ঘটেছে যে ও আমাকে এত বড় একটা বিপদে ফেলতে পারল।'

'সবার সামনে শুনবেন?' ব্লিকম্যান আর গার্ডদের দিকে ইশারা

boiRboi.net

করল রানা। 'একান্তে কথা বললে ভাল হয় না?'

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'জাস্ট আ মিনিট, স্যর,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ব্লিকম্যান। 'দুজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আমি এই ফ্যাসিলিটির এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

'ওদেরকে ফ্যাসিলিটির ট্যুর করাতে নিয়ে যাচ্ছি না আমি, বিরক্ত গলায় বললেন ডোনেন। 'যাচ্ছি আমার লিভিং কোয়ার্টারে। পথ ছাড়ো।'

'আমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যাচ্ছে না,' হুমকির সুর সিকিউরিটি চিফের গলায়। 'আপনাদের কথাবার্তা খুব রহস্যজনক ঠেকছে আমার কাছে। কী নিয়ে এত ফিসফাস করছেন, বলুন তো।'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তোমার মাথাব্যথা কীসের?'

'মাথাব্যথাটা আমারই, স্যর। কারণ এখানকার সিকিউরিটি নিয়ে আমাকে জবাবদিহি করতে হয়। আপনারা তিনজন গোপনে কী নিয়ে শলা-পরামর্শ করবেন, সেটা জানার অধিকার আছে আমার।'

'বললাম না, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত?' ডোনেন রেগে যাচ্ছেন। 'আমি কোনও গোপন শলা-পরামর্শ করতে যাচ্ছি না।'

'সেটাই শিয়োর হতে হবে আমাকে। হাজার হোক, এই প্রজেক্টের সমস্ত গোপন তথ্য জানেন আপনি, সেগুলো যে এদের কাছে পাচার করে দেবেন না, তার গ্যারান্টি কী?'

'আমাকে এত নীচ ভাবো তুমি?' ডোনেন ফুঁসে উঠলেন। 'টাকার লোভে আমি তথ্য বিক্রি করে দেব?'

'আমার ভাবাভাবিতে কিছু যায়-আসে না,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল ব্লিকম্যান। 'সরি স্যর, গোপন কোনও আলোচনার অনুমতি দেব না আমি। কথা বলতে হয় আমার সামনে বলুন।'

boiRboi.net

'ক্...কী...ব্...বললে...' রাগে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীর, চেহারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

তাড়াতাড়ি নাক গলাল রানা। বলল, 'একটু থামুন, ডক্টর। মি. ব্লিকম্যান কোনও অন্যায্য কথা বলছেন না। সিকিউরিটি চিফ হিসেবে অবশ্যই আমাদের সব কথা শুনতে চাইতে পারেন উনি।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল রায়হান, কী বলছে মাসুদ ভাই? বাইরের একটা লোককে ইউনোকোডের কথা জানতে দেবে? ড. ডোনেনও হতবাক।

সিকিউরিটি চিফের মুখে হাসি ফুটেছে সমর্থন পেয়ে। বলল, 'যাক, অন্তত একজন আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছে।'

'নিশ্চয়ই,' রানা বলল। 'তবে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত সিক্রেট। আপনি থাকুন, কিন্তু ওদেরকে...' আঙুল তুলে তিন প্রহরীকে দেখাল রানা, '...বেরিয়ে যেতে হবে।'

দ্বিধা ফুটল ব্লিকম্যানের চেহারায়। প্রস্তাবটা মেনে নিতে ইতস্তত করছে।

'চিন্তা করছেন কেন?' রানা বলল। 'একেবারে তো চলে যেতে বলছি না। দরজার বাইরে থাকবে, গড়বড় দেখলে আপনি এক ডাকেই ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, বলে দিন যাতে আড়ি না পাতে।'

যুক্তিটা মেনে নিল সিকিউরিটি চিফ। মাথা ঝাঁকিয়ে প্রহরীদের বেরিয়ে যেতে ইশারা করল।

উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল রানা, তারপর পাশ থেকে দুটো চেয়ার এনে ওর আর রায়হানেরটার মুখোমুখি বসাল। ডোনেন আর ব্লিকম্যানকে বলল, 'এখানে এসে বসুন। গলা চড়িয়ে কথা বলা যাবে না, ব্যাপারটা খুব সিক্রেট কি না।'

বিজ্ঞানী বসলেন একটা চেয়ারে, সিকিউরিটি চিফও ডেস্কের

boiRboi.net

ওপাশ থেকে খুশি খুশি ভঙ্গিতে উঠে এল। রানাকে পাশ কাটিয়ে চেয়ারের দিকে এগোচ্ছে লোকটা, এমন সময় আচমকা ছোবল দিল রানা—এক হাতে পিছন থেকে চেপে ধরল ব্লিকম্যানের মুখ, অন্য হাতের দু'আঙুলে ঘাড়ের কাছে নার্ভ সেন্টারে চাপ দিচ্ছে। শব্দ করতে পারল না বেচারা, চাপ বাড়তেই দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল—নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল ব্লিকম্যান।

সাবধানে অজ্ঞান দেহটা অ্যাটাচড্ বাথরুমে নিয়ে গেল রানা, ওখানে শুইয়ে রেখে ফিরে এল। রুমের ভিতরে একটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আছে, সেটার দিকে রায়হান আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে অভয় দিল। সারাক্ষণ ট্রান্সমিট করছে না ক্যামেরাটা। যখন ছবি তোলে, তখন একটা লাল বাতি জ্বলে ওটায়—এখন জ্বলছে না। রানা খেয়াল করে দেখেছে, প্রতিবার ট্রান্সমিশনের মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের একটা গ্যাপ আছে। ওটার সঙ্গে টাইমিং মিলিয়েই সিকিউরিটি চিফকে বেহুঁশ করেছে ও। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল রায়হানকে।

তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারে বসে পড়ল রানা। আবারও ট্রান্সমিশনের সময় হয়েছে। রায়হান বলল, 'ক্যামেরায় যারা চোখ রাখছে, তারা এখন মি. ব্লিকম্যানকে না দেখে সন্দেহ করবে না?'

'লোকটার যে এখানে আমাদের সঙ্গে বসে আলাপ করার কথা, সেটা তো জানে না ওরা, তাই না? তা ছাড়া ড. ডোনেন আছেন আমাদের পাশে, তাঁকে প্রাইভেসি দিতে চিফ চলে গেছেন—এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক।'

রানার কাণ্ডকারখানা দেখে চোয়াল ঝুলে পড়েছে ড. ডোনেনের। ও বলল, 'কী হলো, ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

'ট্রেভর দেখছি ভুল বলেনি, আপনি সত্যি একটা ডেনজারাস লোক, মি. রানা,' বললেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী।

boiRboi.net

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী করব বলুন, এমন নাছোড়বান্দা লোককে বুঝ দেয়ার অন্য কোনও কায়দা জানা নেই আমার।'

'তাই বলে এখানকার সিকিউরিটি চিফকে তারই অফিসে আক্রমণ করবেন? লোকটা জেগে ওঠার পর আপনার কী হাল করবে, ভেবে দেখেছেন?'

'ততক্ষণ আমরা এখানে থাকছি না,' রানা বলল। 'আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

'আমাকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন, বলুন তো?'

'বিশাল একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে, ডক্টর। আপনাকে সেটা সমাধান করতে হবে।'

'কীসের ক্রাইসিস?'

'একটা কম্পিউটার-ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পৃথিবীতে—প্রচণ্ড শক্তিশালী। আপনি ছাড়া আর কেউ ওটাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'ভাইরাস!' ড. ডোনেনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার সময় নেই এখন। চলুন আমাদের সঙ্গে, নিজ চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

'সেটা সিম্পলি ইম্পসিবল, মি. রানা,' বললেন ডোনেন। 'ব্লিকম্যানকে বোকা বানিয়ে অজ্ঞান করেছেন মানে এই নয় যে, আমাকেও বের করে নিয়ে যেতে পারবেন। বিজ্ঞানী আর স্টাফদের উপর বিশেষভাবে নজর রাখে সিকিউরিটির লোকেরা, তা ছাড়া এই ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জেলখানার মত। যদি কোনওভাবে ডোম থেকে বের হতেও পারেন, লাভটা কী? সাগরের মাঝখানে একটা বরফের তৈরি দ্বীপে আছি আমরা, যাবোটা কোথায়?'

'সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে, আমরা সব আয়োজন করে এসেছি। ডোম থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাদুই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে

boiRboi.net

পারলেই হয়। আমার এজেন্সির অপারেটররা এয়ারলিফট করে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'তার আগেই কোস্টগার্ডের শিপটা এসে যাবে। শুধু ব্লিকম্যানের লোকেরা নয়, ওরাও আমাদের খুঁজতে শুরু করবে।'

'জানি, শিপটার কারণে আমাদের সমস্যাটা দ্বিগুণ জটিল হয়ে যাচ্ছে। তবে এরচেয়ে কঠিন আর প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার মত ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।'

'সবচেয়ে বড় বাধাটার কথাই তো বলিনি এখনও,' শান্ত গলায় বললেন ড. ডোনেন। 'সেটা হচ্ছি আমি। আমি নিজেই এখান থেকে যেতে চাই না।'

'প্লিজ, স্যর, অমন কথা বলবেন না,' রায়হান অনুরোধ করল। 'কত বড় একটা বিপদ দেখা দিয়েছে, তা আপনি জানেন না। আপনাকে আমাদের খুব দরকার।'

'হতে পারে,' বললেন ডোনেন। 'কিন্তু ইউনোকোড সংক্রান্ত যে-কোনও সমস্যা আমি এখানে বসেই সমাধান করে দিতে পারি। আমার কাছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট অ্যাকসেস, সফটওয়্যার—সব আছে। তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে কেন?'

'ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না, স্যর। কোস্টগার্ডের জাহাজটা এসে পড়লে সমস্যা সমাধানের কোনও সুযোগই দেয়া হবে না আপনাকে, সোজা ধরে নিয়ে যাবে।'

'আসুক,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন ডোনেন। 'যদি যেতেই হয়, তা হলে তোমাদের চাইতে ওদের সঙ্গে যাওয়াটাই আমি বেশি প্রেফার করব। অন্তত একটা সরকারি বাহিনীর হাতে অনেক বেশি নিরাপদ থাকব, পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচবে।'

'আপনি এখনও ভাবছেন, কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে?' কথাটার অর্থ অনুধাবন করতে পেরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এমনটা মনে হবার কারণ কী?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে রানার দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকালেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী। ঘোর লাগা গলায় বললেন, 'কারণ ইউনো-রা সবাই মারা যাচ্ছে, মি. রানা। আপনারা সম্ভবত পৃথিবীর শেষ ইউনোর সঙ্গে কথা বলছেন।'

পনেরো

পাহাড়ের চাতাল থেকে ঢাল বেয়ে সারফেসে নেমে এসেছে আততায়ীদের দুজন—আলফা-ওয়ান আর টু। তৃতীয়জন রয়ে গেছে উপরে, ব্যাকআপ হিসেবে। এই মুহূর্তে একটা বরফের ঢিবির আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ওরা দুজন। একটা অ্যামবুশ করতে যাচ্ছে ওরা, অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য।

ব্রাইটনের রিসার্চ ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা বাহিনী আর অন্যান্য লোকজন মিলে একশোর বেশি লোকের বিপক্ষে দুজন মাত্র খুনী আসলে কিছুই না—সঙ্গে যতই অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট থাকুক না কেন। তারপরও পিছু হটছে না আলফা ওয়ান আর টু—কারণ ওদের বিশ্বাস, প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের চমকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারবে ওরা। একটা সফল আক্রমণের প্রধান শর্তই হচ্ছে এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইয। শত্রুকে চমকে দিতে পারলে পুরো কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না, তাই

তাকে ঘায়েল করা যায় অনায়াসে। এই পদ্ধতিটাই কাজে লাগাতে যাচ্ছে ওরা।

রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে ঢোকাটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা—কড়া পাহারা রয়েছে প্রতিটা এন্ট্রি পয়েন্টে, চোখ এড়িয়ে ঢোকা এক কথায় অসম্ভব। তবে এই সমস্যার সমাধান চারদিন আগেই বের করে রেখেছে আলফা ওয়ান।

প্রতিদিন সকালে পুরো ফ্যাসিলিটির চব্বিশ ঘণ্টার আবর্জনা নিয়ে বেরিয়ে আসে একটা আইস-ট্র্যাক্টর। দু'মাইল পাড়ি দিয়ে আইস শেলফের কিনারায় যায় ওটা, সমস্ত ময়লা সাগরে ডাম্প করে। আজও গেছে, ফেরার পথে ওটাকে আটকাবে ওরা, আরোহীর ছদ্মবেশে ডোমে ঢুকবে। আবর্জনা ডাম্প করার কাজটা এতই রুটিন প্রকৃতির হয়ে পড়েছে যে, ঢোকা বা বেরুনোর সময় ট্র্যাক্টরটাকে মোটেই চেক করে না সিকিউরিটির লোকজন—এটা দারুণ একটা সুবিধে হয়ে দাঁড়াবে ওদের জন্য।

ঘড়ি দেখল আলফা-ওয়ান, প্রায় দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে আলফা-যিরোর কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স পাবার পর থেকে। মনে মনে উদ্বিগ্ন বোধ করল—টাইম-টেবলে পিছিয়ে পড়ছে, আজ বড্ড দেরি করছে ট্র্যাক্টরটা ফিরে আসতে। এদিকে অ্যামেরিকান শিপটারও আসার সময় হয়ে যাচ্ছে, ওরা পৌঁছে গেলে আর সম্ভব হবে না অপারেশন চালানো। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল সে, এর মধ্যে ট্র্যাক্টরটা এলে ভাল, নইলে ডোমের অ্যাকসেস পয়েন্টে সরাসরি হামলা চালিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত যদি তা-ই করতে হয়, সফল হবার সম্ভাবনা কী পরিমাণ কমে যাবে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলফা-ওয়ান। হতচ্ছাড়া ট্র্যাক্টরটা গেল কোথায়? ওটা পেলে কী সুন্দরভাবে ঢুকে যাওয়া যেত ডোমে! কোনও দুশ্চিন্তাই করতে হত না।

boiRboi.net

কোমরের কাছে ঝোলানো ওয়াকি-টকি খড় খড় করে উঠল, ওদের তৃতীয় সঙ্গী ডাকাডাকি করছে উপর থেকে।

'আলফা-ওয়ান, দিস ইজ আলফা-থ্রি। রিপ্লাই।'

সেটটা মুখের কাছে তুলল কঠিন চেহারার যুবক। 'আলফা-ওয়ান স্পিকিং। বলো।'

'আসছে...আসছে ওটা!' আলফা-থ্রি উত্তেজিত।

'আণ্ডারস্টুড। তুমি পজিশন মেইনটেন করো। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কানে ভেসে এল আইস-ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনের ভারি গর্জন। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো ওটা, শামুক গতিতে এগোচ্ছে। ময়লা ফেলে দিয়ে আসায় ওটার পিছনে লাগানো ছাদবিহীন ক্যারিয়ারটা খালি, তারপরও এত আস্তে আসছে কেন—কে জানে!

ওয়াকি-টকিটা আবার মুখের কাছে তুলল আলফা-ওয়ান। 'আলফা-থ্রি, আমরা মুভ করছি। হেলিকপ্টারটাকে এখুনি সিগনাল দিয়ে দাও, চলে আসুক। কাজ শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।'

'ওটার আসতে তো বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না,' বলল আলফা-থ্রি। 'এর মধ্যে মিশন কমপ্লিট করতে পারবে?'

'আশা করি পারব। বাই চান্স যদি দু-চার মিনিট দেরি হয়, কপ্টারটাকে বোলো আশপাশে চক্কর দিতে।'

'বুঝতে পেরেছি। ওভার অ্যান্ড আউট।'

ওয়াকি-টকিটা নামিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল কঠিন চেহারার যুবক, মাথাটা একটু নুইয়ে ইশারা দিল। ঝটপট উঠে পড়ল দুজনে, আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে লম্বা কদমে এগিয়ে একদম ট্র্যাক্টরটার ট্র্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

boiboi.net

আচমকা দুজন মানুষকে উদয় হতে দেখে চমকে উঠল ট্র্যাক্টরের ড্রাইভার আর তার সহযোগী। তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে বাহনটাকে দাঁড় করাল তারা, দুই আগন্তুকের মাত্র কয়েক গজ তফাতে থমকে গেল কাঁটা বসানো ট্র্যাক।

শান্তভাবে হেঁটে ট্র্যাক্টরের দুপাশ দিয়ে এগোল আলফা ওয়ান আর টু, ড্রাইভারস্ কেবিনের দুই জানালা বরাবর গিয়ে থামল।

জনমানবহীন এই আইস শেলফে বহিরাগত মানুষ দেখে অবাক হয়ে গেছে ড্রাইভার। জানালার কাঁচ নামিয়ে কঠিন চেহারার যুবককে দেখল এক পলক, তারপর প্রশ্ন করল, 'কে তোমরা? এখানে কোত্থেকে এলে?'

জবাব না দিয়ে একটু হাসল যুবক, পরমুহূর্তেই চোখ ধাঁধানো দ্রুততায় শরীরের আড়াল থেকে বের করে আনল সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। গুলি করল।

'দুপ!' করে মৃদু শব্দ হলো, ড্রাইভারের বিস্ফারিত দু'চোখের মাঝখানে কপালে একটা তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল বুলেটটা। প্রায় একই সময়ে আলফা-টু-ও গুলি করেছে। সিটের ওপর এলিয়ে পড়ল দুটো নিষ্প্রাণ দেহ।

যান্ত্রিক দ্রুততায় পরের কাজগুলো সারল দুই খুনী—প্রথমে লাশদুটো নামিয়ে আনল ট্র্যাক্টর থেকে, শরীরের কাপড়চোপড় খুলে মৃতদেহগুলো ফেলে দিল একটা ফাটলের মধ্যে, কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই ওগুলো তুষারে ঢেকে যাবে। এরপর পোশাকগুলো গায়ে চড়িয়ে নিজেরাই ড্রাইভার আর সহকারী সাজল ওরা, ট্র্যাক্টরে উঠে বসে চোখ-মুখ ঢেকে ফেলল স্নো-মাস্ক আর গগলস্ দিয়ে, এখন আর চেহারা দেখা যাচ্ছে না ওদের। ফ্যাসিলিটির দিকে আবার রওনা হয়ে গেল ভারি যানটা—পুরো ঘটনাটা ঘটতে পাঁচ মিনিটও লাগেনি।

boiRboi.net

দশ মিনিটের ভিতর ডোমের গ্যারাজ এন্ট্র্যান্সে পৌঁছে গেল ট্র্যাক্টর, হর্ন বাজাতেই গুড়গুড় করে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা, গ্যারাজে ঢুকে পড়ল বাহনটা। ওটাকে পার্ক করে নেমে এল দুই খুনী, গ্যারাজ থেকে ডোমের মূল অংশে যাবার দরজায় দুই প্রহরী আছে, তবে তাদের বিনা বাধায় পেরিয়ে গেল। মৃত দুই স্টাফের আইডি ঝুলছে খুনীদের বুকে—তা দেখেই সন্তুষ্ট প্রহরীরা। মাস্ক আর গগলস্ দেখে সন্দেহ করল না কিছু; ঠাণ্ডা থেকে কেবলমাত্র এসেছে ড্রাইভার আর তার সহকারী, তাই হয়তো খুলছে না ভেবে চুপ করে রইল।

মূল প্যাসেজে পৌঁছে পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করল আলফা-ওয়ান—ফ্যাসিলিটির ব্লু-প্রিন্ট ওটা, আইস শেলফে আসার আগে ব্রাইটনের মেইনফ্রেম কম্পিউটার থেকে হ্যাকিঙের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। ম্যাপ দেখে গন্তব্য ঠিক করল সে, সঙ্গীকে নিয়ে রওনা হলো সেদিকে। গ্যারাজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ডোমের অপারেশন সেন্টার। সিকিউরিটি লুকআউট থেকে শুরু করে পানি, ইলেকট্রিসিটি, এয়ার সাপ্লাই, টেম্পারেচার—সব নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওখান থেকে, পুরো ফ্যাসিলিটির প্রাণকেন্দ্র এই মাঝারি আকারের কামরাটা। ওখানেই যাচ্ছে দুই খুনী। সামান্য দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে গিয়ে মাত্র একবার নিরাপত্তারক্ষীদের মুখোমুখি হলো ওরা। যেন মাস্ক আর গগলস্ খুলে ফেলছে, এমন ভাব করতে করতে লোকগুলোকে পেরিয়ে এল দুজনে।

কাজে লাগল ধোঁকাটা, চেহারা দেখার চেষ্টা না করে শুধু আড়চোখে আই.ডি. দেখে সন্তুষ্ট থাকল গার্ডেরা। আসলে বহিরাগত কারও প্রবেশের সুযোগ নেই ফ্যাসিলিটিতে, রি-সাপ্লাই প্লেনে যে-দু'জন এসেছিল, তারা ধরা পড়ে গেছে—এ-কারণেই সামান্য ঢিলেঢালা ভাব প্রহরীদের মধ্যে।

শেষ মোড়টায় পৌঁছে থামল দুই খুনী. উঁকি দিয়ে দেখে নিল অপারেশন সেন্টারের প্রবেশপথ। করিডরটা নির্জন, তবে দরজার সামনে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গার্ড। এরা কোনও ছাড় দেবে বলে মনে হয় না, পুরো ফ্যাসিলিটিতে এদের দায়িত্বটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—প্রাণকেন্দ্রটাকে পাহারা দেয়া। সামান্য একজন ভেহিকল ড্রাইভার আর তার সহকারী কেন অপারেশন সেন্টারে ঢুকতে চাইছে, তা নিঃসন্দেহে জানতে চাইবে।

কী করবে ঠিক করে ফেলল দুই চতুর খুনী। মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল, দৃঢ় পায়ে হাঁটছে দরজার দিকে। পায়ের শব্দে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল দুই গার্ড, চেহারা ঢাকা দুই আগন্তুককে দেখে সন্দেহ ঘনাল তাদের চোখে, কিন্তু লোকদুটো নির্দ্বিধায় এগোচ্ছে দেখে বোকাও বনে গেল। অস্ত্রে হাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকল তারা, নবাগতরা কাছাকাছি এলে চ্যালেঞ্জ করবে।

কিন্তু বেচারাদের সেই সুযোগ দিল না আলফা টিমের দুই দক্ষ সদস্য। দশ ফুট দূরে থাকতেই জ্যাকেটের আড়াল থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলদুটো বেরিয়ে এল ওদের হাতে, হাঁটার ছন্দ বিন্দুমাত্র নষ্ট না করে দুপ দুপ শব্দে দুটো গুলি ছুঁড়ল। প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না গার্ডেরা. লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে লাশদুটোকে পাশ কাটাল খুনীরা, হাতলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল অপারেশন সেন্টারের দরজা, ঢুকে গেল রুমটাতে। ভিতরে নানা ধরনের কনসোলের সামনে বসে কাজ করছে মোট ছ'জন স্টাফ, সবার পিঠ দরজার দিকে। পিস্তল তো হাতেই ছিল, চৌকাঠ পেরিয়েই তিনটে করে গুলি করল আলফা ওয়ান আর টু—আশ্চর্য দক্ষতা এবং অসাধারণ রিফ্লেক্স নিয়ে। কথা বলতে হয়নি, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে যার যার টার্গেট বেছে নিয়েছে ওরা; গুলি করার পর দেখা গেল. কেউ কারও ভাগে হাত

দেয়নি। পুরো কাজটাই তারা করেছে রোবটের মত; মোড় ঘোরার পর যে পদক্ষেপে হাঁটছিল, তাতে ছন্দপতন ঘটেনি একটুও।

আর্তনাদেরও সময় পায়নি, মাথার পিছনে গুলি খেয়ে কনসোলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছয় স্টাফ। লাশগুলোর দিকে তাকাল না খুনীরা, প্রথমে করিডর থেকে দুই গার্ডের লাশ টান দিয়ে ভিতরে নিয়ে এল, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা। এবার সিকিউরিটি কনসোলের দিকে নজর দিল তারা।

ইউনিফর্ম পরা দুজন মানুষ কাজ করছিল ওখানটায়, এখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। টান দিয়ে মৃতদেহদুটো চেয়ার থেকে মেঝেতে ফেলল দুই খুনী, নিজেরা বসল সে-জায়গায়।

কনসোলের ঠিক সামনে দেয়ালে তিন সারিতে বসানো আছে ন'টা আট-ইঞ্চি টিভি স্ক্রিন। নির্দিষ্ট একটা ছন্দে পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়ে বসানো ষাটটা ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে ট্রান্সমিট হওয়া দৃশ্য দেখাচ্ছে ওগুলো। চেয়ারে হেলান দিল আলফা-ওয়ান, মাস্ক সরিয়ে বলল, 'চলো দেখা যাক, আমাদের ডক্টর সাহেব এই মুহূর্তে কোথায় আছেন।'

ড. ডোনেনের কথাটা ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে রানার কাছে। ভুরু কুঁচকে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী বলতে চাইছেন আপনি, ডক্টর? শেষ ইউনোর সঙ্গে কথা বলছি মানে?'

'শেষ মানে শেষ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজ্ঞানী। 'গত তিন মাসে আমাদের ছ'জন মারা গেছে, সপ্তমজনও আছে কি না, তা বলতে পারছি না। সম্ভবত আমিই সবশেষে বাকি আছি।'

'জাস্ট আ মিনিট, হিসেব মিলল না তো। সাত আর আপনি এক...মানে আটজন। বাকি দুজন কোথায়?'

'ওরা বহু আগেই মারা গেছে, দুর্ঘটনায়। তবে ক'দিন হলো

মনে হচ্ছে, ওরাও খুন হয়ে থাকতে পারে।'

'কী যে বলছেন, তার কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিরক্ত হলো রানা। 'পরিষ্কার করে বলুন না!'

'তা হলে আপনাকে পুরো গল্পটা শুনতে হবে।'

'গল্প-টল্প শোনার উপায় নেই আমাদের, তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে। একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইসিসে পড়েছে গোটা বিশ্ব...'

'আমার মনে হয়, স্যারের সব কথা শুনে নেয়াই ভাল, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল রায়হান। 'এখান থেকে বের হবার পর তো দৌড়ের উপর থাকতে হবে, কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তারচেয়ে এখনই যদি সব জেনে নিই, হয়তো পুরো ব্যাপারটার পিছনে কে লুকিয়ে আছে—তার একটা সূত্র পাওয়া যাবে।'

প্রস্তাবটার ভালমন্দ ভেবে দেখল রানা—ব্লিকম্যান অজ্ঞান থাকবে বেশ কিছুক্ষণ, তার ডাক না পেলে গার্ডরাও রুমে ঢুকবে না। তারমানে শান্তিতে কথা বলবার জন্য বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। এই ফাঁকে কোস্টগার্ডের শিপটা চলে এলেও ভালই হয়। ব্লিকম্যান তো বললই, ওরা কিছুতেই ডোনেনকে হাতছাড়া করবে না; সেক্ষেত্রে কোস্টগার্ড আর ফ্যাসিলিটির লোকজনের মধ্যে একটা গণ্ডগোল অনিবার্য। হৈ-হট্টগোলটা ওদের পালানোর সময় ভাল কাভার হতে পারে। এই মুহূর্তে রুম ছেড়ে বেরুনো যাবে না বলে অ্যান্টিভাইরাস তৈরির কাজটা শুরু করতে পারবেন না বিজ্ঞানী ভদ্রলোক, ওটা এখান থেকে পালানোর পর সুবিধেজনক একটা জায়গায় করতে হবে ওঁকে। কাজেই সময়টা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কাটানো যেতে পারে। তা হলে হয়তো এটাও জানা যাবে, ভয়ঙ্কর ভাইরাসটা ইউনোদের মধ্যে কে ছড়িয়েছে।

সিকিউরিটি চিফের রুমে সময়টুকু কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলল রানা। প্রৌঢ় বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, স্যর। বলুন আপনার গল্প, তবে সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করলেন ডোনেন, 'পুরো ব্যাপারটার সূত্রপাত ইংল্যাণ্ডে...অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানেই কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি, ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৭৯ সালে। সে-আমলে একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলাম আমি, তার উপর গেছি আরেক মহাদেশ থেকে; স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে তেমন কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না। তবে এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকলে যা হয়, আস্তে আস্তে দু-একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে শুরু করল, ওরাই হয়ে উঠল আমার বন্ধু। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের মধ্যে সহপাঠী কেউ ছিল না বললেই চলে, বেশিরভাগই হয় সিনিয়র, নয় জুনিয়র। তা হলে বন্ধুত্ব হলো কী করে? এর পিছনে কারণটা হলো একটা কমন বিষয়ের উপর আমাদের সবার সীমাহীন আগ্রহ—জিনিসটা কম্পিউটার। সমবয়েসী অন্যান্যদের মত গান-বাজনা, ফ্যাশন, চলচ্চিত্র বা রাজনীতি—এসব নিয়ে কোনও আগ্রহই ছিল না আমাদের, ধ্যান-জ্ঞান সব পড়ে থাকত কম্পিউটার নিয়ে। কম্পিউটারই ছিল আমাদের হবি, প্যাশন—সবকিছু। আজকাল যদিও এমন কম্পিউটার-আসক্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়, তারপরও সে-আমলে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই ছিল। কারণ তখন ওটা কাঠখোট্টা একটা হিসাবের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না, আজকালকার মত বিনোদনের বস্তু তো নয়ই।'

'তা হলে আপনারা সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ে করতেন কী?'

'যন্ত্রটা নিয়ে গবেষণা করতাম আমরা, কীভাবে ওটার উন্নতি করা যায়, তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম। অবস্থা দেখে ভার্সিটির সবাই আমাদের *"নিরস পণ্ডিতের দল"* বলে খেপাত।'

'হুঁ, দশজনই ছিলেন তখন?'

boighar.net

'সবসময় না। আমাদের গ্রুপটার বন্ধুদের সংখ্যা বিভিন্ন সময় বেড়েছে-কমেছে। তবে দশজনে এসে একসময় স্থির হয়ে গেল ওটা...অবশ্য নিজ থেকে হয়নি, আমরাই স্থির করে দিলাম। পরে নতুন যারা যোগ দিতে চেয়েছে, তাদের আর দলে নিইনি।'

'কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'কারণ ওঁরা তখন ইউনোকোড আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ওটার কথা কাউকে জানতে দিতে চাইছিলেন না,' বুঝতে পেরে বলে উঠল রায়হান। 'ঠিক বলেছি, স্যর?'

হাসলেন ডোনেন। 'হ্যাঁ। তবে ওটা অনেক পরের ঘটনা। শুরুতে আমরা অমন ধরনের কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলাম না, আমাদের চেষ্টা ছিল তখনকার প্রচলিত সিস্টেমটাকেই আরও কার্যক্ষম করে তুলবার। যে যার মত গবেষণা করতাম আমরা, এক্সপেরিমেন্ট চালাতাম, পরে একত্র হয়ে ফলাফলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করতাম, একে অন্যের ভুল ধরিয়ে দিতাম—এভাবেই চলছিল দিনকাল।

'দশজন ছিলাম আমরা—সাতজন ছেলে, তিনজন মেয়ে। ব্রিটিশ ছিল পাঁচজন, এর মধ্যে মাইকেল আর ডেবি ওয়ালডেন ছিল হাইস্কুল-সুইটহার্ট...ভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় থাকতেই বিয়ে করে ওরা, একটা মেয়েও হয়েছিল। বাকি তিন ব্রিটিশ হলো ট্রিসিয়া মিলনার, হার্বার্ট গ্র্যান্ট আর ডুইট গার্ডনার। এ ছাড়া কুর্ট মাসডেন ছিল আইরিশ, আর ভ্যাল মর্টিমারের বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে। অ্যামেরিকান ছিলাম আমরা তিনজন—আমি, লুই পামার আর গ্রুপের সবচেয়ে কমবয়েসী সদস্যা—এলিসা ভ্যান বুরেন। ও আবার আধা-ডাচ, বাবা হল্যাণ্ডের মানুষ ছিল কি না। আমাদের চার বছরের জুনিয়র ছিল মেয়েটা।'

'চার বছর! আপনাদের গ্রুপে ঢুকল কী করে?'

boighar.net

'কম্পিউটার সায়েন্সেই পড়ত, মেধাবীও ছিল...আর ছিল কুর্টের গার্লফ্রেন্ড,' বললেন ডোনেন। 'ওভাবেই আমাদের একজন হয়ে যায় ও। ওদের সম্পর্কটা অবশ্য বেশিদিন টেকেনি, তারপরও আমাদের ছেড়ে যায়নি এলিসা, গ্রুপে রয়ে গেছে, বন্ধুর মত থেকেছে কুর্টের সঙ্গে। তাতে আমরাও খুশি হয়েছিলাম। ওরা দুজনই ছিল একটু পাগলাটে আর উড়নচণ্ডী স্বভাবের, আমাদের রসকষহীন গ্রুপটায় ওরাই ছিল আনন্দের উৎস—আমাদের প্রাণশক্তি।'

'হুম,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'সবার পরিচয় জানা গেল। এবার ইউনোকোডের ইতিহাস বলুন।'

'ওটা অনেক পরের ঘটনা। সালটা সম্ভবত '৮৮ কি '৮৯ হবে। আমাদের লেখাপড়া প্রায় শেষ তখন, ডক্টরেট করছি, এমন সময় একদিন উত্তেজিত অবস্থায় মিটিঙে হাজির হলো মাইকেল আর ডেবি। সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক একটা কোড নাকি আবিষ্কার করে বসেছে ওরা, ওটা দিয়ে বাইনারি কোডকে রিপ্লেস করা যাবে। সিঙ্গুলার কোডের কথা শুনে আমরা বেশ অবাক হলাম, কারণ বিষয়টা স্রেফ আইডিয়া নয়, আমাদের দেখাবার মত একটা নমুনাও নিয়ে এসেছে ওরা। এমন একটা কোডের ধারণা কবে ওদের মাথায় এল, বা কবে থেকে কাজ করে জিনিসটাকে ডেমোনস্ট্রেশনের মত পর্যায়ে নিয়ে এল, তা আমাদের বলেইনি। অবস্থা দেখে মনে হলো, ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন রাখছিল ওরা। সেজন্যে কেউ কেউ খুব রাগ করল, তবে সেটা বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। সিঙ্গুলার কোডের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে সব ভুলে গেলাম আমরা: জিনিসটা তখন খুব কাঁচা অবস্থায় ছিল, ওটাকে ডেভেলপ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাস চারেকের মধ্যে মোটামুটি একটা ওয়ার্কিং কণ্ডিশনে নিয়ে আসা গেল কোডটাকে, এবার এক্সপেরিমেন্টের পালা। সিঙ্গুলার কোড দিয়ে নিজেরা একটা

সফটওয়্যার তৈরি করলাম আমরা, সেটা ভার্সিটির কম্পিউটার ল্যাবে চালিয়ে দেখলাম।

'ফলাফলটা হলো ভয়াবহ—ভার্সিটির গোটা সিস্টেম ক্র্যাশ করল কয়েক মিনিটের মধ্যে। নিজেদের অজান্তেই একটা ভাইরাস তৈরি করে বসেছিলাম আমরা—সিঙ্গুলার কোডের প্রোগ্রামটা এতই শক্তিশালী ছিল যে, বাইনারি কোডের সবকিছুকে ওভাররাইড করে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। নিশ্চিত হবার জন্য আরও দু'জায়গায় পরীক্ষা চালালাম আমরা, প্রতিবারই একই কাণ্ড ঘটল।

'ঘটনাগুলোর পর কোডটার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আঁচ করতে পারলাম আমরা। চেষ্টা করে দেখা গেল, ওটা দিয়ে বাইনারি কোডের যে-কোনও সিকিউরিটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে। এসব দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম, অনেকগুলো সমস্যা এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। যতক্ষণ না কোডটাকে সবখানে চালু করতে পারছি, ততক্ষণ এটা বাইনারি সিস্টেমের বিরুদ্ধে স্রেফ একটা অস্ত্র ছাড়া আর কিছু না। অথচ অল্প সময়ে জিনিসটা চালুও করা সম্ভব নয়...' রায়হানের কাছে ইউনোকোড সংক্রান্ত যে-সব অসুবিধের কথা শুনেছিল রানা, সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন ডোনেন। শেষে বললেন, 'এ-কারণে কোডটার কথা গোপন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। সবাই মিলে শপথ করলাম, যতদিন সমস্ত সমস্যার সমাধান করে কোডটাকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপনের মত একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে না পারছি, ততদিন কাউকে ওটার কথা বলব না, শেখাব না। প্রতিজ্ঞাটা আজও রক্ষা করে চলেছি আমরা।'

'কিন্তু ওটার কথা তো পুরোপুরি চাপা দিতে পারেননি আপনারা,' রানা বলল। 'গুজব বলুন, বা মিথ হিসেবে বলুন, লোকে ওটার কথা জেনেছে। *ইউনোকোড* নাম দিয়েছে, আপনাদের

ইউনো বলছে...এমনকী সবমিলিয়ে যে দশজন ইউনো আছে, তা-ও জানে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো?'

'ভার্সিটির সিস্টেম ক্র্যাশ করার পর একটা তদন্ত হয়েছিল,' ব্যাখ্যা করলেন ড. ডোনেন। 'ইউনোকোডের সামান্য ট্রেস পাওয়া গিয়েছিল ওই নষ্ট হয়ে যাওয়া কম্পিউটারগুলোর হার্ডডিস্কে। ডিপার্টমেন্টের পণ্ডিতেরা যদিও ওটাকে কোনও কোড হিসেবে মানেননি, তবে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারটা আলাদা। বেশ কয়েকজন ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ আগ্রহী হয়ে পড়ে, মিথটারও সূচনা ওদের মাধ্যমেই হয়। তদন্তে আমরা ধরা পড়িনি বটে, তবে এটুকু বের হয়ে এসেছিল যে, দশজন ইউজার মিলে সিস্টেমটা ক্র্যাশ করিয়েছে। ওখান থেকেই দশজন ইউনোর কাহিনিটা ছড়ায়।'

'আচ্ছা! ঠিক আছে, গল্পটা শেষ করুন এবার। ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্ট আর ইউনোকোড গোপন করার শপথ নেয়ার পর কী ঘটল?'

'লেখাপড়া শেষ করলাম আমরা, তারপর জীবিকার টানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হলো সবাইকে। চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা—বিভিন্ন পেশায় ব্যস্ত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা। অবশ্য ইউনোকোড সংক্রান্ত গবেষণাটা বন্ধ করলাম না কেউই, যার যার মত গবেষণা চালিয়ে গেলাম, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ করিনি। ততদিনে ইন্টারনেট চালু হয়ে গেছে, রুটিন করে সাইবারস্পেসে মিলিত হতাম আমরা, মিটিং করতাম। কে কী অগ্রগতি করল, তা নিয়ে আলোচনা চলত। ভালই চলছিল সবকিছু, হঠাৎ নব্বুই সালের মাঝামাঝি ঘটল মর্মান্তিক ঘটনাটা। মাইকেল আর ডেবি—সিঙ্গুলার কোডের উদ্ভাবক, আমাদের প্রিয় দুই বন্ধু...সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল। ইউ.কে-র কিংসউড ইলেকট্রনিক্সে কাজ করত ওরা, এক বিকেলে অফিস শেষে বাড়ি

ফিরছিল, পাহাড়ি রাস্তায় ব্রেক ফেল করে নীচে পড়ে যায় গাড়িটা—দুজনেই মারা যায়।'

'ব্রেক ফেল?'

'অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনে আর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরাও খুব একটা অবিশ্বাস করিনি। মাইকেল খুব জোরে গাড়ি চালাত।'

'একটু আগে কী যেন বলছিলেন আপনি...দুর্ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে মানেন না। এই অ্যাকসিডেন্টটার কথাই বলছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. ডোনেন।

'কিন্তু এত বছর পর এমনটা মনে হবার কারণটা কী, স্যর?' জিজ্ঞেস করল রায়হান। 'আপনি ছাড়া বাকিরাও মারা গেছে বললেন, সেটা কীভাবে?'

'বলছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী। 'মাইকেল আর ডেবির মৃত্যুতে খুবই মুষড়ে পড়ি আমরা। একে তো ওরা আমাদের খুব প্রিয় দুজন মানুষ ছিল, তার ওপর ওরা মারা যাওয়ায় লোকবল কমে গেল আমাদের। যে বিশাল কাজে আমরা হাত দিয়েছি, তাতে দশজনই কম হয়ে যায়, ওরা না থাকায় আরও সমস্যায় পড়ে গেলাম আমরা। কোডের আবিষ্কর্তা হওয়ায় মাইকেল আর ডেবিই ওটার খুঁটিনাটি সবচেয়ে বেশি জানত, ইউনোকোডের গ্রামার বানাতে পারত সবচেয়ে সহজে, এমনকী বাইনারি থেকে ইউনোর ট্রান্সফারের ব্যাপারেও চমৎকার কয়েকটা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছিল। ওদের অভাবে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গেলাম বাকিরা, আজ পর্যন্ত যে কাজটা শেষ করতে পারিনি, তা ওরা না থাকাতেই।

'যা হোক, আমরা অবশ্য হাল ছাড়িনি কখনও। কাজ চালিয়ে গেছি, নিয়মিত যোগাযোগও রেখেছি বাকিরা। মাঝখানের অনেকগুলো বছর চুপচাপ কেটে গেছে। ঝামেলার শুরুটা হয়েছে

তিন মাস আগে...ফেব্রুয়ারিতে। প্রথমে লুই নিউ ইয়র্কে ছিনতাইকারীর হাতে খুন হলো, কয়েকদিন পর মারা গেল কুর্ট—হার্ট অ্যাটাক করেছিল, অপারেশন সাকসেসফুল ছিল, কিন্তু রিকভার করেনি। দুই বন্ধুর মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেলাম আমরা, কিন্তু তখনও সন্দেহ করিনি কিছু। মার্চের শুরুতে ইন্টারনেটে একটা মিটিং ছিল আমাদের, ওটায় গর-হাজির থাকল হার্বার্ট। একটু পাগলাটে টাইপের সে, মাঝে মাঝেই কিছু না বলে ডুব দেয়, তাই বিশেষ পাত্তা দিলাম না কেউ। মাসশেষের দ্বিতীয় মিটিঙেও থাকল না ও, একই সঙ্গে দেখলাম ট্রিসিয়াও গায়েব। এবার টনক নড়ল আমাদের, খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল—হার্বার্ট একটা বোট অ্যাকসিডেন্টে আর ট্রিসিয়া নিজ বাড়িতে গ্যাস বিস্ফোরণে মারা গেছে। সাধারণ দুর্ঘটনা ভেবে পত্রিকাঅলারা মাথা ঘামায়নি, তাই কাগজেও আসেনি কিছু। কিন্তু কী ঘটছে বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না আমার। পর পর চারজন ইউনোর মৃত্যু কাকতালীয় হতে পারে না কিছুতেই, কেউ নিশ্চয়ই আমাদের টার্গেট করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা আমি বাকি তিনজনকে জানালাম—ডুইট বিশ্বাস করল, এলিসা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনওটাই করল না, তবে সাবধান থাকবে বলে কথা দিল; আর ভ্যাল তো রীতিমত হেসেই উড়িয়ে দিল। ফলাফলটা হাতেনাতেই পেয়েছে বেচারা—এপ্রিলের শুরুতে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ওকেও মরতে হয়েছে। আরেকটা দুর্ঘটনা...চিন্তা করা যায়?'

নিশ্চুপ রইল রানা আর রায়হান—ভদ্রলোকের সঙ্গে ওরাও একমত, নির্দিষ্ট পাঁচজন মানুষ পর পর দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে না।

একটু অপেক্ষা করে আবার খেই ধরলেন ডোনেন। 'এনিওয়ে, ওটা পরের ঘটনা। হার্বার্ট আর ট্রিসিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়েই পুরো

boiRboi.net

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলাম আমি। কেন আমাদের খুন করা হচ্ছে, এটা বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারছিলাম, পাক্কা প্রফেশনাল খুনী পাঠানো হয়েছে আমাদের পিছে—যারা শুধু খুন করে না, খুনটাকে দুর্ঘটনার চেহারা দিতেও ওস্তাদ। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা...চার-চারজন মানুষ মরে গেল, অথচ কেউ কিছু সন্দেহও করতে পারল না! বাকিদের বাঁচার জন্য পুলিশের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলা যেত, কিন্তু সেক্ষেত্রে খুনীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর লোকজন ইউনোকোড হাতে পাবার জন্য আমাদের কবজা করতে চাইত—সেটা আরও ভয়াবহ। কাজেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বিকল্প ভাবতে হলো আমাকে। চিন্তা করে দেখলাম, প্রত্যেকটা খুন দুর্ঘটনার আদলে ঘটানো হচ্ছে। তাই আমাকে চিরাচরিত জীবনযাত্রা পাল্টে ফেলতে হবে, চলে যেতে হবে এমন কোথাও, যেখানে খুনীরা আমাকে নাগালে পাবে না...দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারবে না। ব্রাইটন টেকনোলজি অনেকদিন থেকেই ঘুরছিল আমাকে ওদের রিসার্চ প্রজেক্টে নেয়ার জন্য। দু'বছরের চুক্তি...পুরো সময়টা বরফের রাজ্যে থাকতে হবে পরিচিত লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, এসব ভেবেই রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে এই অফারটাই আমার জীবন বাঁচাবে বলে মনে হলো। নির্জন আইস শেলফ, কড়া নিরাপত্তা—চাইলেও বাইরের কারও পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়। চমৎকার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, তাই না? ব্রাইটনকে আমি শর্ত দিলাম, প্রজেক্টে আমার যোগ দেয়ার খবর গোপন রাখতে হবে; ওরা রাজি হলো। ব্যস, তারপর আর কী, ভার্সিটিতে ইস্তফা দিয়ে আমি এখানে চলে এলাম। অবশ্য এখানে এসেও মন থেকে ভয় দূর করতে পারছিলাম না, খুনীরা ছদ্মবেশে আমার কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করতে পারে বলে মনে হচ্ছিল, তাই সিকিউরিটিকে বলে

রেখেছিলাম—অপরিচিত কেউ আমাকে খুঁজলে যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয়। আমার কথাতেই সবসময়ের জন্য একটা ফাঁদের প্ল্যান করে রাখে ওরা, সেটাতে আপনারা আটকা পড়েছেন।'

'মাইকেল আর ডেবি অ্যাকসিডেন্ট করেনি ভাবছেন কেন, সেটা কিন্তু বললেন না,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'ওয়েল, মি. রানা, ছ'জন যেখানে দুর্ঘটনার মত করে খুন হয়েছে, সেখানে ওদেরটা স্বাভাবিক মৃত্যু ভাবি কী করে, বলুন? হোক না সেটা আঠারো বছর আগে!'

'ছ'জন? আপনি তো এখন পর্যন্ত শুধু পাঁচজনের কথা বলেছেন। আরেকটা কে খুন হয়েছে?'

'ডুইট গার্ডনার। গত মাসের মাঝামাঝি ও-ও গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে।'

'আর এলিসা ভ্যান বুরেন?'

'মরেছে কি বেঁচে আছে—ঠিক বলতে পারব না। ভ্যাল আর ডুইটের খবর আমি পেয়েছি এখানে আসবার পর, ইন্টারনেটে... পত্রিকার অনলাইন এডিশন পড়ে। এলিসার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি কিছু। তবে তাতে খুশি হবার কিছু দেখছি না, হার্বার্ট আর ট্রিসিয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এলিসাও হয়তো এমনভাবে মরেছে যে, সাংবাদিকরা সেটাকে খবর বলে মনেই করেনি।'

'শিয়োর হতে পারলে ভাল হত। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না?'

ডোনেন মাথা নাড়লেন। 'না। পালিয়ে আসার সময় ওদেরকে গা-ঢাকা দিতে আর অনির্দিষ্টকালের জন্য যোগাযোগ বন্ধ রাখতে বলে এসেছিলাম আমি।'

'হুম!' আনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হচ্ছে রহস্যটার সঙ্গে আমরা যে ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছি, তার সম্পর্ক আছে।'

boiboi.net

'কী এক ভাইরাসের কথা বলছিলেন. ওটার সঙ্গে?' জানতে চাইলেন ডোনেন।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ভাইরাসের সঙ্গে ইউনোদের খুন হবার সম্পর্ক কী?' ভুরু কোঁচকালেন ডোনেন।

'ওটা ইউনোকোডের তৈরি, স্যর,' রায়হান বলল। 'আগামী তিনদিনের মধ্যে ভাইরাসটা দুনিয়ার সব কম্পিউটার ধ্বংস করে দেবে।'

'হোয়াট!' চমকে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'কী বলছ তুমি?'

'শুনতে ভুল হয়নি আপনার,' রানা বলল। 'শুধুমাত্র ইউনোকোডের তৈরি. অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে ওটাকে প্রতিহত করা সম্ভব। আমার ধারণা, এই অ্যান্টিভাইরাস যাতে তৈরি না হয়, সেজন্যেই ইউনোদের একে একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল বিজ্ঞানীর। 'শুধু অ্যান্টিভাইরাস কেন... ভাইরাসটাও তো একজন ইউনো ছাড়া কারও পক্ষে বানানো সম্ভব নয়।'

'"*জীবিত*" ইউনো,' শুধরে দিল রানা।

ঝট করে ওর দিকে তাকালেন ডোনেন। 'আপনি কি বলতে চাইছেন...'

'দুঃখিত স্যর, কিন্তু নিজের মুখেই তো বলেছেন—আপনি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।'

'না-আ!' তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করলেন ডোনেন। 'আমি কেন শুধু শুধু একটা ভাইরাস ছড়াতে যাব? আর প্রিয় বন্ধুদের একে একে খুন করব...আমাকে কি মানুষ, না পিশাচ ভাবছেন আপনি?'

'মাসুদ ভাই. আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি—স্যর এ-ধরনের কিছু করতে পারেন না,' রায়হান তার প্রিয় শিক্ষকের পক্ষ নিল।

boiboi.net

'সেক্ষেত্রে বাকি থাকছেন শুধু এলিসা ভ্যান বুরেন,' বলল রানা। 'যদি ধরে নিই, তিনি বেঁচে আছেন আরকী!'

'এলিসা?' ডোনেন মাথা নাড়লেন। 'ও-ই বা ভাইরাস বানাবে কেন? মি. রানা, প্রায় বিশ বছর ধরে মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমরা। ইউনোকোডকে যদি অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করতে চাইতাম কেউ, শুরুতেই করতে পারতাম না?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই, ডক্টর,' রানা কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিন্তু আপনারাই স্বীকার করছেন, একজন ইউনো ছাড়া আর কারও পক্ষে ভাইরাসটা বানানো সম্ভব নয়। দশজনের মধ্যে আটজনের মারা যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত আপনি. এখন যদি এলিসা ভ্যান বুরেন বা আপনার মধ্যে কেউ কাজটা না করে থাকেন, তা হলে করল-টা কে?'

'সবাই যদি মারা না গিয়ে থাকে, মাসুদ ভাই?' বলে উঠল রায়হান।

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মানে?'

'এতগুলো দুর্ঘটনা...এর মধ্যে যে-কোনও একটা তো ভুয়াও হতে পারে। হয়তো নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরাতে মারা যাবার মিথ্যে নাটক সাজিয়েছে কেউ।'

চুপ হয়ে গেল রানা—সম্ভাবনাটা সত্যিই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিলেন ড. ডোনেন, হঠাৎ ঝট করে সোজা হলেন তিনি—চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'আমাদের কেউই এ-কাজ করেনি, মি. রানা। একটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি আমি। অনেকদিন আগের কথা তো...মনেই ছিল না।'

'কী কথা?'

boiRboi.net

'আমাদের দশজনের বাইরে আরও একজন ইউনো আছে—এগারো নম্বর ইউনো!'

চমকে গেল রানা আর রায়হান। 'কী বলছেন আপনি? এগারো নম্বর ইউনো মানে? কে এই এগারো নম্বর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী। 'কী আর বলব... ওটাই সবচেয়ে বড় রহস্য।'

ষোলো

বিমূঢ় হয়ে গেছে রানা আর রায়হান, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, তাকিয়ে আছে ড. ডোনেনের দিকে, যাতে নিজ থেকেই রহস্যটা খোলাসা করেন তিনি।

'আই অ্যাম সরি, ইয়াং মেন,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'একাদশ ইউনো সম্পর্কে কিচ্ছু বলতে পারব না। জানিই না কিছু, বলব কেমন করে?'

'কিছুই যদি না জানেন,' রানা বলল, 'তা হলে এগারো নম্বর একজন যে আছে, সেটাই বা বলছেন কেমন করে?'

'আছে, মি. রানা। আমাদের দশজনের বাইরে আরেকজন যে আছে, এ-ব্যাপারে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও আর কাউকে সেটা বিশ্বাস করাতে পারিনি।'

'কেউ বিশ্বাস করেনি যখন, আপনিই বা করছেন কেন?'

'কারণ আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'

'সেই প্রমাণ বাকিদের দেখাননি?'

boiRboi.net

'ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাতে পারিনি, মি. রানা। আমি যখন দেখেছি, তখন প্রমাণ ছিল। কিন্তু বাকিদের দেখাতে গেলাম যখন, তখন প্রমাণ গায়েব হয়ে গেছে।'

বিরক্ত হলো রানা। 'কথাবার্তা পরিষ্কার করে বলুন, ডক্টর। প্রমাণটা কী, আর সেটা গায়েবই বা হলো কীভাবে?'

'টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে কষ্ট হবে আপনার, তাই সহজ করে বলি,' ডোনেন বললেন। 'আজ থেকে চার বছর আগে, সাইবারস্পেসে আমাদের মিটিঙে বাইরের একজন ইউযারের উপস্থিতির প্রমাণ পাই আমি—সে ইউনোকোড ব্যবহার করছিল।'

'ব্যাপারটা আর কেউ টের পায়নি?' রায়হান জানতে চাইল।

'না,' মাথা নাড়লেন ডোনেন। 'আমিও পেতাম না, নেহায়েত মিটিং শেষে আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনের সিকিউরিটি চেকআপ করতে গিয়ে ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলি। ডিজিটাল লগে আমাদের আটজনের বাইরে নয় নম্বর একটা এন্ট্রি ছিল।'

'সেটা বাকিদের দেখাননি?'

'দেখাতে গিয়েছিলাম, তার আগেই সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলে লোকটা।'

'হুম! তারপর?'

'পরের মিটিঙের সময় ইউনোকোডে একটা ট্রেসার ওয়ার্ম তৈরি করি আমি, রহস্যময় মানুষটার লোকেশন বের করবার জন্য। ওয়ার্মটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় লোকটা।'

'ইউনোকোড দিয়ে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ডোনেন।

'এরপরও বাকি ইউনোরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি?'

'না। ওদের ধারণা, ওয়ার্মটা নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল...সম্ভবত আমার প্রোগ্রামিঙে গলদ থাকার কারণেই।'

boiRboi.net

‘কিন্তু এত অবিশ্বাসের কারণ কী ছিল?’ রানা ভুরু কোঁচকাল।

‘ওটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, ওদের জায়গায় নিজে থাকলে আমিও বিশ্বাস করতাম না,’ বললেন ডোনেন। ‘এগারো নম্বর একজন ইউনো থাকাটা তো আসলেই অসম্ভব, তাই না? কোডটার স্রষ্টা, ডেভেলপার—সবকিছু আমরা। আমাদের কাছ থেকে শেখা ছাড়া তো কারও পক্ষে ইউনো হওয়া সম্ভব নয়। অথচ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম আমরা, কাউকে কোডটা শেখাইনি। তা হলে নতুন একজন উদয় হবে কোথেকে?’

‘তা তো ঠিকই,’ রায়হান বলল। ‘তারপরও তর্কের খাতিরে যদি লোকটাকে সেকেণ্ড-জেনারেশন ইউনো বলে ধরে নিই, তা হলেও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে, স্যর। তার পক্ষে কীভাবে মূল ইউনোদের টেক্কা দেয়া সম্ভব? আপনার বানানো ট্রেসার ওয়ার্ম ধ্বংস করে দিল, ডিজিটাল লগ থেকে ডেটা মুছে দিল...অথচ আপনি ইউনোকোডের একজন স্রষ্টা হয়েও লোকটার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কাউকে দেখাতে পারলেন না!’

‘ব্যাপারটাকে বিরাট রহস্য বলছি কি আর এমনি এমনিই?’ তিক্ত হাসি হাসলেন ড. ডোনেন। ‘এগারো নম্বর একজন ইউনো যে আছে, শুধু তা-ই নয়: আমার বিশ্বাস, সে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনো!’

boiRboi.net

অপারেশন সেন্টারের দেয়ালে বসানো ক্লোজ-সার্কিট টিভি ক্যামেরার মনিটরগুলোয় আঠার মত সেঁটে আছে দুই আততায়ীর দৃষ্টি। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল আলফা-ওয়ান—কোনার একটা স্ক্রিনে তিনজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে, আলাপে মগ্ন। বয়স্ক মানুষটার চেহারা ভাল করে দেখল সে, তারপরই উত্তেজিত গলায় বলল, ‘পেয়েছি! ওই তো ব্যাটা!’

মাথা ঘুরিয়ে আলফা-টু-ও দেখল ছবিটা। বলল, 'ঠিক বলেছ। ওটাই আমাদের টার্গেট।'

স্ক্রিনের কোনার লেখাটা পড়ল আলফা-ওয়ান। 'নাইন-ডি। কোথায় ওটা, তাড়াতাড়ি বের করো।'

কনসোলের পাশ থেকে একটা নির্দেশিকা তুলে পাতা উল্টাল দ্বিতীয় খুনী। 'ওটা ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি চিফের অফিস।'

'ল্যাব-ট্যাব বাদ দিয়ে ব্যাটা ওখানে করছেটা কী?' বিড়বিড় করল আলফা-ওয়ান, ম্যাপ তুলে অফিসটার লোকেশন দেখে নিল। তারপর ফিরল সঙ্গীর দিকে। 'ফেয-টু শুরু করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল আলফা-টু। পোশাকের তলায় বিশেষভাবে তৈরি একটা হ্যাভারস্যাক আছে তার, কাপড়ের উপর থেকে বোঝা যায় না। ওটা থেকে দুটো গ্যাস-মাস্ক বের করল সে—একটা দিল নেতাকে, অন্যটা নিজে রাখল। এরপর বের করল তিনটে সরু টিউব—একেকটা একফুট লম্বা, দেখতে কম্প্রেসড় এয়ার রাখার মিনি সিলিন্ডারের মত। মাথার ঠিক উপরে সিলিঙে এয়ার সার্কুলেশনের জন্য লাগানো ছাকনি দেখা যাচ্ছে, চেয়ারে দাঁড়িয়ে ওটার নাগাল পেল আলফা-টু, পকেট থেকে ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে খুলে ফেলল ছাকনিটা।

'তিনটা টিউবে কাজ হবে তো?' জানতে চাইল আলফা-ওয়ান, সে পাওয়ার-কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'অবশ্যই,' জবাব দিল আলফা-টু। 'ডোমের ভিতরকার এয়ার ভলিউম হিসেব করা আছে—প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই এনেছি।'

'গুড।'

'তুমি আবার ইমার্জেন্সি লাইটিং অফলাইন করার কথা ভুলে যেয়ো না।'

'ভুলিনি,' হাসল আলফা-ওয়ান। পাওয়ার কনসোলের কয়েকটা

boiRboi.net

বাটন চাপল সে। তারপর বলল, 'তুমি রেডি?'

'পুরোপুরি।' মুখে গ্যাস-মাস্ক পরল আলফা-টু।

আলফা-ওয়ানও পরল মাস্ক, মাউথপিসটা সামান্য ফাঁকা করে বলল, 'অন মাই মার্ক...থ্রি, টু, ওয়ান—এখন!'

এক ঝটকায় টিউব তিনটের মুখ খুলে ফেলল দ্বিতীয় খুনী—হিসহিস শব্দে হালকা সবুজ রঙের গ্যাস বেরুতে শুরু করল ওগুলো থেকে, টিউবগুলো ভেন্টিলেশন ডাক্টের ভিতর ছুঁড়ে দিল সে। শাফটের বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে মিশে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যাসটা পুরো ডোমে ছড়িয়ে যাবে। নেতার দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল তুলল আলফা-টু।

মাথা ঝাঁকাল আলফা-ওয়ান, তারপর কনসোলের একটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেল গোটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, ইমার্জেন্সি লাইটগুলোও জ্বলছে না।

জ্যাকেটের তলায় লুকানো দুটো উজি সাবমেশিনগান হাতে নিল খুনীরা, হ্যাভারস্যাক থেকে বের করা নাইট-ভিশন গগলস্ লাগাল চোখে।

শান্ত গলায় আলফা-ওয়ান বলল, 'টাইম মার্ক করো। ঠিক তিন মিনিট পর বেরুব আমরা।'

সতেরো

boiRboi.net

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে সিকিউরিটি চিফের অফিসে। ড. ডোনেনের অবিশ্বাস্য গল্পটা শুনে স্থবির হয়ে আছে বাংলাদেশ

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুই এজেন্ট, আর কম্পিউটার-বিজ্ঞানী চুপ করে আছেন ওদেরকে পুরো ব্যাপারটা হজম করার সময় দিতে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে মুখ খুলল রানা। 'যা বললেন... তাতে সন্দেহের অবকাশ কতটুকু, ডক্টর?'

'একদমই নেই, মি. রানা,' জবাব দিলেন ডোনেন। 'কেউ মানুক আর না মানুক, আমাদের দশজনের বাইরে আরও একজন ইউনো আছে, এটা একটা তিক্ত সত্য। কিন্তু কে সে, কীভাবেই বা সৃষ্টি হলো—তা কেউ বলতে পারে না।'

'আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না, স্যর,' অকপটে বলল রায়হান। 'আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? যে-ঘটনাটার কথা বললেন, সেটা ছাড়া আর কখনও এই ইউনোর চিহ্ন দেখেছেন কোথাও?'

'না,' মাথা নাড়লেন ডোনেন। 'তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। লোকটা আমাদের চেয়ে দক্ষ, ওই ঘটনার পর থেকে হয়তো আরও সতর্ক হয়ে গেছে। কোথাও তার চিহ্ন দেখা না গেলে অবাক হবার কিছু নেই। হতে পারে আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুদিন মাথা ঘামিয়েছি আমি, কোনও সমাধান না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম...একসময় মন থেকে মুছেও গিয়েছিল ওটার কথা। আজ তোমরা আবার ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করায় মনে পড়ল।'

'কিন্তু...কিন্তু যেখানে আপনাদের দশজনের বাইরে কারও ইউনো কোড জানারই কথা নয়, সেখানে আপনাদের চেয়ে দক্ষ একজন আসে কোত্থেকে?'

'সেটা জানতে পারলে তো রহস্যটা আর রহস্য থাকত না। তবে তোমরা যে-ভাইরাসের কথা বলছ, সেটা এই ইউনো ছাড়া আর কেউ ছড়িয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তার সে-ধরনের

boiRboi.net

দক্ষতা আছে।'

'ডক্টর, কে হতে পারে এই রহস্যময় ইউনো—আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডোনেন। 'দুঃখিত, এ-ব্যাপারে আমার একদমই আইডিয়া নেই। যদি কোনও সূত্র থাকত, তা হলে তো চার বছর আগেই তাকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারতাম।'

'তখনকার আর এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তখন সে আপনার বন্ধুদের খুন করেনি, সারা পৃথিবীর জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেয়নি... কিন্তু এখন দিচ্ছে। লোকটাকে খুঁজে বের করা কতটা জরুরি, তা আশা করি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি, মি. রানা। আমিও চাই আমার বন্ধুদের খুনীকে ধরতে. কিন্তু বললামই তো—আমার কাছে কোনও সূত্র নেই।'

'আছে, স্যর। থাকতেই হবে—হোক সেটা সচেতন বা অবচেতন মনে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'কোডটার স্রষ্টা আপনারা, এটা তো ঠিক। কাজেই এগারো নম্বর হোক, কিংবা এক হাজার নম্বর হোক, যে-কোনও ব্যবহারকারীকে ওটা আপনাদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। আমি শিওর, এই ইউনো-র সঙ্গে আপনাদের দশজনের কারও না কারও লিঙ্ক আছে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেন ডোনেন। 'কোডটা বাইরের কারও হাতে পড়তে না দেবার ব্যাপারে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা. সেটা কেউ ভঙ্গ করেনি—এই গ্যারান্টি দিতে পারি আমি।'

'এ-ধরনের গ্যারান্টি দেয়া উচিত হচ্ছে না আপনার,' রানা বিদ্রূপ করল। 'আপনি নিজেই মানেননি প্রতিজ্ঞাটা—রায়হানকে ইউনোকোড শিখিয়েছেন।'

'গড ড্যাম ইট, মি. রানা!' রেগে গেলেন বিজ্ঞানী। 'যা জানেন না, তা নিয়ে কথা বলতে আসবেন না। রায়হানেরটা শেখা বলে না.

ও শুধু কয়েকটা সংখ্যা আর বর্ণ চেনে, আর কিছু না। ওটুকু বিদ্যে দিয়ে কারও পক্ষে ইউনোকোডে ভাইরাস তৈরি করা সম্ভব না। ধরুন আপনাকে আমি চিনা ভাষায় ঠিক ওভাবে কয়েকটা সংখ্যা আর দু-চারটে অক্ষর চিনিয়ে দিলাম, তারমানে কি এ-ই যে, আপনি চাইনিজে গড় গড় করে গোটা একটা গল্প-উপন্যাস বা কবিতা লিখে ফেলবেন?'

যুক্তিটা মেনে নিয়ে হার স্বীকার করল রানা। বলল, 'দুঃখিত, স্যর। আমি আসলে আপনাকে অপমান করবার জন্য কথাটা বলিনি। আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনার মত অন্য কোনও ইউনোও তো বাইরের কাউকে কোডটা শিখিয়ে থাকতে পারেন। তাঁর শেখানোটা হয়তো এত অল্পে সীমাবদ্ধ ছিল না।'

শান্ত হয়ে এসেছেন ড. ডোনেন। বললেন, 'তেমন কিছু ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না, মি. রানা। রায়হানের ব্যাপারটা আলাদা। ও কেমন ছোঁকছোঁকে স্বভাবের, তা হয়তো জানেন না...'

তিন বছর আগের ডাবল আর অপারেশনের কথা মনে পড়ল রানার। বলল, 'জী, খুব ভাল করেই জানি।'

রায়হানও লজ্জার হাসি হাসল।

'এনিওয়ে,' ডোনেন বললেন, 'একদিন আমি অফিসে বসে ইউনোকোড নিয়ে কাজ করছিলাম, এমন সময় উঁকি দিয়ে সব দেখে ফেলে ও। তারপর থেকে যে কীভাবে আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করল, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। ওকে স্নেহ করতাম খুব, রাগ করতে পারছিলাম না তাই। শেষ পর্যন্ত চাপাচাপির হাত থেকে বাঁচার জন্য মৌলিক দুয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দিয়েছি। আমার বন্ধুরাও যদি কাউকে ওটুকু শিখিয়ে থাকে তো অসুবিধে নেই। বললাম তো, ওটুকু জ্ঞান নিয়ে ইউনো হওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। তারপরও চার বছর আগের সেই ঘটনার পর বাকি

সাতজনের সবার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিলাম আমি. ওরা হলপ করে বলেছে—কাউকেই কোডটা শেখায়নি ওরা। আমি ওদের কথা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু দুজনের সঙ্গে কথা হয়নি আপনার,' রানা বলল। 'মাইকেল আর ডেবি ওয়ালডেন...যারা মারা গেছে। আপনার সন্দেহই যদি ঠিক হয়, যদি ওঁরা খুনই হয়ে থাকেন, তা হলে ধরে নিতে হয়—সমস্যাটার সূত্রপাত আজ থেকে আঠারো বছর আগেই হয়েছে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না—ওয়ালডেন দম্পতি ওই রহস্যময় লোকটাকে ইউনোকোড শিখিয়েছেন, আর সেটা যাতে ফাঁস না হয়, সে-কারণেই তাঁদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'সম্ভাবনাটা একেবারে নাকচ করার মত নয়, তা আমি স্বীকার করি,' ডোনেন বললেন। 'তবে আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। মাইকেল আর ডেবিই ইউনোকোডের খারাপ দিকগুলো সবার আগে ডিটেক্ট করতে সমর্থ হয়...ওদেরই আইডিয়া ছিল পুরো ব্যাপারটা পৃথিবীর কাছ থেকে গোপন রাখবার। এসব নিয়ে যে-রকম সিরিয়াস দেখেছিলাম দুজনকে, তাতে মনে হয় না, কাউকে কোডটা শেখাবে ওরা।'

'থাক, এ নিয়ে আপাতত ভেবে লাভ নেই,' রানা শ্রাগ করল। 'প্রথমে আমাদেরকে সামনের বিপর্যয়টা ঠেকাতে হবে। ইউনো-ভাইরাসটার কপি আমাদের কাছে আছে, ডক্টর। আপনি ওটার প্রতিষেধক বানাতে পারবেন?'

'পারা তো উচিত, তবে না দেখা পর্যন্ত কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। আমাদের হাতে কতটা সময় আছে?'

'তিনদিনের মত।'

'হুম। সময় তো মোটামুটি আছে, সাহায্য করতে পারি। তবে একটাই শর্ত আমার—আমাকে এখানে থেকেই কাজ করতে দিতে

boiRboi.net

হবে। অন্য কোথাও গিয়ে হিউম্যান-টার্গেটে পরিণত হবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'এখানে আপনি চাইলেও থাকতে পারবেন না, ডক্টর। সিআইএ যে-কোনও মূল্যে আপনাকে পাকড়াও করবে। ওরা ভাইরাসটাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়, তাতে বাকি দুনিয়া রসাতলে গেলেও ওদের কিছু যায় আসে না। আপনি যে-অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করবেন, সেটা অ্যামেরিকা ছাড়া আর কারও হাতে পৌঁছুতে দেবে না ওরা। বলুন, আপনি কি তা-ই চান?'

চিন্তায় পড়ে গেলেন ডোনেন। 'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে গেলে আমার নিরাপত্তার কী হবে?'

'সে-ভারটা নাহয় মাসুদ ভাইয়ের উপর ছেড়ে দিন, স্যর,' রায়হান বলল। 'এসব ব্যাপারে ওঁর ভাল অভিজ্ঞতা আছে।'

'তা-ই?' মনে হলো কনভিন্স হয়েছেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী। 'তা হলে তো এলিসারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ও যদি বেঁচে থাকে, খুনীরা ওর নাগাল পেতে চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই।'

'ওঁর জন্যও সব ধরনের চেষ্টা করব আমরা,' রানা কথা দিল। 'ভদ্রমহিলা থাকেন কোথায়, বলতে পারেন?'

জবাব দেয়ার সুযোগ পেলেন না ড. ডোনেন, তার আগেই ঝট করে নিভে গেল সমস্ত বাতি, নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেল রুমটা। পুরো ডোম জুড়েই একই অবস্থা বোধহয়—দরজার বাইরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল, গালাগাল করছে কেউ।

অন্ধকারে রায়হানের গলা শোনা গেল। 'হলোটা কী?'

'কমপ্লিট পাওয়ার ফেইলিওর মনে হচ্ছে,' বললেন ডোনেন। 'ইমার্জেন্সি লাইটগুলোও জ্বলছে না দেখি!'

গালে বাতাসের স্পর্শ অনুভব করল রানা। বলল, 'পাওয়ার ফেইলিওর না। এয়ার সার্কুলেশন হচ্ছে...তারমানে সেন্ট্রাল

boighar.net

এ.সি.-টা চলছে এখনও।'

'কী বলছেন আপনি!' ড. ডোনেন বিস্মিত। 'এসি চললে বাতি জ্বলবে না কেন?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন...' বলতে বলতে থমকে গেল রানা—নাকে একটা পরিচিত মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে—এয়ার ডাক্ট থেকে আসছে। গন্ধটা কীসের, মনে করতে পারল না প্রথমে, কিন্তু মাথাটা হালকা চক্কর দিয়ে উঠতেই ধরে ফেলল ব্যাপারটা। 'শিট! এটা একটা কমাণ্ডো অ্যাটাক!'

ড. ডোনেনেরও মাথা ঘুরছে, ওই অবস্থাতেই হতভম্ব গলায় বললেন, 'কমাণ্ডো অ্যাটাক মানে! কী বলছেন এসব?'

'এগুলো কমাণ্ডো অ্যাসল্টের ক্লাসিক সিম্পটম, ডক্টর। সবকিছু অন্ধকার করে দেয়া, তারপর নক-আউট গ্যাস ছড়ানো—হোস্টেজ সিচুয়েশনে এভাবেই চূড়ান্ত আক্রমণ চালায় স্পেশাল ফোর্স।'

'হোস্টেজ সিচুয়েশনে নেই আমরা, তা ছাড়া ফ্যাসিলিটিতে স্পেশাল ফোর্সই বা আসবে কোত্থেকে?'

জবাব দিল না রানা, ঝট করে খুলে গেছে দরজা, টর্চলাইট হাতে ভিতরে ঢুকেছে অস্ত্রধারী তিন গার্ড, টলতে টলতে তাদের চিফকে খুঁজছে। দুর্বল গলায় ওদের একজন বলল, 'স্যর, কী যেন হয়েছে...' ব্লিকম্যানকে দেখতে না পেয়ে পরমুহূর্তেই চোখে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। বন্দিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যর কোথায়?'

দেরি করল না রানা এক সেকেন্ডও, চেঁচিয়ে উঠল, 'রায়হান!'

আক্রমণ চালাল দুই বিসিআই এজেন্ট। আনআর্মড কমব্যাটে দক্ষ দুজনেই, সাধারণ সিকিউরিটি গার্ডরা কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারল না। প্রথমজনের অস্ত্রধরা হাতদুটো খপ করে চেপে ধরে নীচে নামিয়ে দিল রানা, নিজের কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত

boiRboi.net

করল লোকটার নাক-মুখে, একই সঙ্গে একটা লাথি ছুঁড়ে দ্বিতীয় গার্ডকেও বেসামাল করে দিয়েছে। থ্যাচ্ করে বিশ্রী শব্দ হলো, প্রথম গার্ডের নাক আর ঠোঁট থেঁতলে গেছে—আর্তনাদ করে বসে পড়ল বেচারা। লোকটার থুতনির নীচে মাপা ওজনে হাঁটু চালাল রানা—দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ হলো, লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়জনের দিকে এবার মনোযোগ দিল ও, লাথি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেছে সে, উন্মুক্ত ঘাড়ে কারাতে চপ বসাতেই লুটিয়ে পড়ল এ-ও। রায়হানের দিকে তাকাল রানা—তৃতীয় গার্ডকে ইতিমধ্যেই কুপোকাত করেছে তরুণ হ্যাকার। পুরো আক্রমণটায় সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড!

'গুড জব!' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

ড. ডোনেনের মাথা ধরেছে খুব, চেয়ারে বসে দুলছেন ভীষণভাবে, রানা আর রায়হানও প্যায়ে শক্তি পাচ্ছে না।

'পরিষ্কার বাতাস দরকার আমাদের,' বলল রানা। 'ডক্টর, ফ্যাসিলিটিতে কোনও ব্রিদিং অ্যাপারেটাস আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'ফায়ার-ফাইটিং স্টোরে।'

'কতদূরে ওটা?'

'দু'তিন মিনিটের পথ।'

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল রানা, নকআউট গ্যাসটা সম্পর্কে জানা আছে ওর—এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে সুস্থ-সবল একজন মানুষকে অজ্ঞান করে ফেলে। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি, তারমানে ফায়ার-ফাইটিং স্টোরে পৌঁছুবার আগেই সংজ্ঞা হারাবে ওরা। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। পকেট থেকে নিজের রুমালটা বের করে নিল ও, রায়হান আর ড. ডোনেনের কাছ থেকে নিয়ে নিল ওদেরগুলোও। টেবিলে এখনও পড়ে আছে ওদের জন্য আনা

পানির গ্লাসদুটো—সেখান থেকে ভিজিয়ে নিল রুমালগুলো, তারপর ওগুলো দিয়ে বেঁধে ফেলল নাকমুখ।

উদ্দেশ্য সফল হয়েছে রানার—ভেজা রুমাল ফিল্টার হিসেবে কাজ করছে, গ্যাসমেশা বাতাস এখন সরাসরি নাগাল পাচ্ছে না ফুসফুসের। চেতনা থাকার মেয়াদ বাড়ল একটু।

'দৌড়াতে হবে আমাদের, জ্ঞান থাকতেই ওই স্টোরে পৌঁছুতে হবে,' বলল রানা। 'ডক্টর, পারবেন আপনি?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডোনেন। 'চেষ্টা করব, চলুন।'

অজ্ঞান গার্ডদের কোমর থেকে দুটো নাইন-মিলিমিটার পিস্তল আর স্পেয়ার ক্লিপ জোগাড় করল রানা—একটা নিজে রাখল, অন্যটা দিল রায়হানকে। রাইফেল পড়ে থাকলেও তাতে হাত দিল না, ডোমের ভিতরের শর্ট রেঞ্জে পিস্তলই বেশি কার্যকর হবে। ফ্লোরে গার্ডদের টর্চলাইটও গড়াচ্ছে, সেগুলোও তুলে নিল ওরা।

'চলো,' রানা বলল।

দরজা খুলে রুম থেকে বেরুল তিনজনে, তারপর ড. ডোনেনের দেখানো পথ ধরে ছুটতে শুরু করল। গ্যাসটা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে, করিডর আর দরজা-খোলা রুমগুলোর ভিতরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রজেক্টের প্রচুর স্টাফকে। মোড় ঘোরার সময় দুজন সিকিউরিটি গার্ডের সামনে পড়ে গেল ওরা—তবে লোকদুটো জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তে পৌঁছে গেছে, ওদেরকে বাধা দেয়ার অবস্থায় নেই।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে রানারা, করিডরে পড়ে থাকা সংজ্ঞাহীন মানবদেহগুলোকে লাফিয়ে লাফিয়ে পেরুচ্ছে। নাক-মুখে ভেজা রুমাল থাকলেও একেবারে বন্ধ হয়নি শ্বাস নেয়ার সঙ্গে গ্যাস টানা, মাথা দপদপ করছে রানা আর রায়হানের—টর্চের আলোয় আলোকিত সামনের প্যাসেজটাকে মনে হচ্ছে নৃত্য জুড়েছে এপাশ-

boiRboi.net

ওপাশ করে। ড. ডোনেনের অবস্থা আরও খারাপ, প্রাণশক্তিতে ভরা দুই যুবকের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না একদমই, হাত ধরে তাঁকে দুপাশ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানা ও রায়হান।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে ছুটছে, তারপর হঠাৎই সামনে দেখতে পেল ওরা দরজাটা। বন্ধ পাল্লার ওপর টকটকে লাল রঙে লেখা:

"ফায়ার ফাইটিং স্টোর"

এগিয়ে গিয়ে হাতল ঘোরাল রানা, খুলল না দরজা—ওটা তালা দেয়া। দু'পা পিছিয়ে পিস্তল তাক করল ও, কাজটা সহজ হলো না মোটেই—হাত কাঁপছে ভীষণ, চোখের সামনে সারা দুনিয়া টলমল করছে।

দাঁতে দাঁত পিষে নিজেকে স্থির রাখল রানা, গুলি করে উড়িয়ে দিল হাতলটা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তিনজনে। রায়হানের শরীরে ভর দিয়ে এলিয়ে পড়েছেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী, ও কাতর গলায় বলল, 'হারি আপ, মাসুদ ভাই! স্যর অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।'

তাড়াতাড়ি পাশের র‍্যাক থেকে একটা এয়ার বটল্ নামাল রানা, মাস্কটা ড. ডোনেনের মুখে পরিয়ে ভালভ খুলে দিল। বিজ্ঞানীকে সাবধানে মেঝেতে বসিয়ে আরও দুটো সিলিণ্ডার নামাল ওরা—নিজেদের জন্য।

হিসহিস শব্দে নল বেয়ে বেরুচ্ছে বিশুদ্ধ বাতাস, সেটার স্পর্শ পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ বোধ করতে শুরু করল রানা আর রায়হান। মাথার দপদপানি আর ফুসফুসের জ্বালাপোড়া মিলিয়ে যাচ্ছে। ড. ডোনেনকেও চোখ মেলতে দেখা গেল।

'নড়বেন না,' মাস্ক সরিয়ে বলল রানা। 'সুস্থ হয়ে নিন পুরোপুরি।'

boighar.net

'থ্যাঙ্ক গড যে আপনি সঙ্গে ছিলেন,' দুর্বল গলায় বললেন বিজ্ঞানী। 'নইলে কী যে হত! বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হত।'

'হুঁশটা আর ফিরতও না। সোজা পরপারে পাড়ি জমিয়ে ফেলতেন।'

'কী!'

'হ্যাঁ, ডক্টর। এই আক্রমণটা আপনাকে খতম করবার জন্য চালানো হচ্ছে। ইউনোদের পিছনে প্রফেশনাল লোক লেলিয়ে দেয়া হয়েছে বলছিলেন না? কড়া সিকিউরিটির একটা ফ্যাসিলিটিতে এরচেয়ে প্রফেশনাল অ্যাটাক আর হতে পারে না।'

'কিন্তু আপনি না বললেন, এটা স্পেশাল ফোর্সের টেকনিক? ওরা আমাদের কেন খুন করতে চাইবে?'

'টেকনিকটা স্পেশাল ফোর্সের, লোকগুলোকেও হতে হবে—এমন কোনও কথা নেই। স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন সদস্য হবার সম্ভাবনাই বেশি—টাকা খরচ করলে এ-ধরনের ভাড়াটে সৈনিক ম্যানেজ করা কঠিন কিছু নয়।'

'হায় যিশু! এরা কতটা ডেনজারাস?'

জবাবটা রায়হান দিল। 'সবচেয়ে খারাপ টাইপের, স্যর। পৃথিবীতে এদের চেয়ে দক্ষ কিলিং মেশিন আর নেই।' রানার দিকে তাকাল তরুণ হ্যাকার। 'ওরা সহজে হাল ছাড়বে না, মাসুদ ভাই।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'সমস্যা হলো, লোকগুলো কোথায় আর কতজন—এটা জানার কোনও উপায় নেই।'

'বড় কোনও টিম হবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে চুপিসারে ঢুকে আচমকা হামলা চালাতে পারত না।'

'ঠিক বলেছ,' রানা একমত হলো। 'ওরা যদি সংখ্যায় কম হয়, তা হলে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ করে হলেও ফ্যাসিলিটি

boiRboi.net

থেকে বেরিয়ে যাবার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'কী বলছেন আপনি!' আতঙ্কের সুরে বললেন ডোনেন। 'পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কিলিং মেশিনদের সঙ্গে যুদ্ধে নামবেন? পাগল হয়ে যাননি তো? এরচেয়ে লুকিয়ে থাকাটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

'ইয়ে...স্যর...' ইতস্তত করে বলল রায়হান। 'আপনি সম্ভবত বুঝতে পারেননি—দুনিয়াতে এই কিলিং মেশিনদের সঙ্গেও টক্কর দেয়ার মত লোক আছে।'

ভুরু কোঁচকালেন বিজ্ঞানী। 'কারা?'

'আজ্ঞে, আমরা।' চওড়া হাসি হাসল রানা।

আঠারো

তিন মিনিট পর বের হবার কথা থাকলেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আরও দু'মিনিট দেরি করল দুই খুনী—সুপরিসর ডোমটার সবখানে গ্যাসটা পৌঁছুতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে, এই ভেবে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সজ্ঞান কারও চোখে পড়ে যেতে চায় না ওরা, তারচেয়ে একটু দেরি হলে ক্ষতি নেই।

হাতঘড়িতে পাঁচ মিনিট পুরো হতেই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল আলফা-ওয়ান, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল অপারেশন সেন্টার থেকে। গ্যাস-মাস্ক থাকায় বিষাক্ত বায়ুটা কোনও ক্ষতি করতে পারছে না ওদের, অন্ধকারেও সবুজ রঙের প্রলেপে ঢাকা অবস্থায় সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নাইট-

boiRboi.net

ভিশন গগলসের কল্যাণে। দ্রুত পা চালাল দুই খুনী—গ্যাসের প্রভাবে আধঘণ্টার মত অজ্ঞান থাকবে এখানকার প্রতিটা মানুষ, তার ভিতরেই কাজ সেরে আইস শেলফ থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে ওদের।

সঙ্গে ডোমের ব্লু-প্রিন্ট আছে, সিকিউরিটি চিফের অফিস পর্যন্ত পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না, খোলা দরজা দিয়ে খুশিমনে ভিতরে ঢুকল খুনীরা। কিন্তু ওখানকার দৃশ্য দেখে খুশিটা পরিণত হলো বিস্ময়ে। মেঝে আর অ্যাটাচড় বাথরুম মিলে চারটে দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেগুলো তিন সিকিউরিটি গার্ড আর তাদের বসের...অথচ আসল মানুষটাই নেই।

'হোয়াট দ্য হেল!' বলে উঠল আলফা-টু। 'গেল কোথায় বিজ্ঞানীর বাচ্চা? ক্যামেরায় অন্য যে-দুজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম, ওরাও তো দেখছি নেই।'

'নিশ্চয়ই এখান থেকে বেরিয়ে গেছে,' আন্দাজ করল আলফা-ওয়ান। 'তবে বেশিদূর যেতে পারবে না, করিডরের কোথাও পড়ে আছে হয়তো। চলো দেখি।'

রুম থেকে বেরিয়ে করিডরের অজ্ঞান দেহগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল দুই খুনী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের বিস্ময় কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

'নেই ওরা এখানে!' আলফা-টু বলল, ব্যাপারটা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'এটা কীভাবে সম্ভব?'

আলফা-ওয়ানেরও চেহারা থমথম করছে। 'যেভাবেই হোক, গ্যাসটাকে ফাঁকি দিয়েছে ওরা। তারমানে এই নয় যে, আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

'কিন্তু গেল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই কোনও একটা একজিট ধরে পালাবার চেষ্টা করছে।'

boiRboi.net

ট্রান্সপোর্ট!' একটু ভেবে বলে উঠল আলফা-টু। 'পালাতে হলে ট্রান্সপোর্ট দরকার ওদের। তারমানে গ্যারাজে যাচ্ছে!'

'হুঁ,' নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আলফা-ওয়ানের চেহারা। 'তা হলে চলো গাড়িই ধরাই ওদের...পরপারের গাড়ি!'

এয়ার বটল্ থেকে বিশুদ্ধ বাতাস নিয়ে সবাই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা—কঠিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে সামান্যতম ফিটনেসের অভাবও রাখা যাবে না। সন্তুষ্ট হবার পর উঠে দাঁড়াল ও, দেখাদেখি বাকি দুজনও। নক-আউট গ্যাসটা দশ মিনিট পর বাতাসে মিলিয়ে যাবার কথা, তারপরও ঝুঁকি নিল না ও; হার্নেস দিয়ে এয়ার বটল্গুলো পিঠে ঝোলাল, মাস্কও মুখ থেকে সরালো না। সবার গিয়ার ঠিক আছে কি না চেক করে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল ফায়ার-ফাইটিং স্টোর থেকে।

রানা-রায়হান দুজনের হাতেই টর্চ আছে, কিন্তু অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে জ্বালাতে পারছে না। দেয়াল হাতড়ে আস্তে আস্তে এগোতে হলো ওদের—সামনে রানা, তারপর রায়হান, সবার পেছন থেকে ড. ডোনেন গ্যারাজে যাবার পথ বলে দিচ্ছেন। পা টিপে টিপে হাঁটছে, যাতে শব্দ না হয়; সেই সঙ্গে করিডরে পড়ে থাকা অজ্ঞান দেহগুলোর সঙ্গেও যেন হোঁচট না খায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে কান পাতছে ওরা—হামলাকারীদের সাড়াশব্দ পাবার আশায়, তবে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। লোকগুলো অত্যন্ত উঁচু মানের ট্রেনিং পাওয়া—বেড়ালের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে জানে।

নিরাপদেই প্রায় পুরো দূরত্বটুকু পেরিয়ে এল তিন সঙ্গী। সামনে প্যাসেজের একটা টি-জাংশান, ওটা পেরিয়ে ডানদিকে ষাট গজের মত এগোলেই গ্যারাজে ঢোকার দরজা—ফিসফিস করে

boiRboi.net

জানালেন ড. ডোনেন। মাথা ঝাঁকিয়ে আগে বাড়ল রানা, দেয়াল ধরে টি-জাংশানটা পেরিয়ে ডানে মোড় নিল। কিন্তু কয়েক কদম গিয়েই থমকে দাঁড়াল ও, মাথার ভিতরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—*বিপদ! বিপদ!!*

শব্দের চেয়ে আলোর গতি বেশি, এ-কারণে প্রথমে মাজল ফ্ল্যাশ দেখতে পেল রানা—করিডরের শেষ মাথা থেকে আসছে। পরমুহূর্তে উজি সাব-মেশিনগানের গুরুগম্ভীর আওয়াজে প্রকম্পিত হলো সংকীর্ণ প্যাসেজটা। চেঁচিয়ে উঠল ও—সঙ্গীদের সাবধান করছে...কিন্তু মুখে ব্রিদারের মাস্ক থাকায় চাপা শব্দ বেরুল শুধু। নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে ডাইভ দিল রানা, পড়তে পড়তেই জ্বালা অনুভব করল কনুইয়ের উপরে—একটা বুলেট মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। উষ্ণ রক্ত গড়াতে শুরু করল ক্ষতটা থেকে। রায়হান আর ড. ডোনেন অবশ্য বেঁচে গেছে, মোড়টা ঠিকমত ঘোরার আগেই গুলির শব্দে প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়েছে তরুণ হ্যাকার।

রানার এতদিকে খেয়াল নেই, মেঝের স্পর্শ পাওয়ামাত্র প্রসারিত হাতের নাইন মিলিমিটার থেকে পাল্টা গুলি করতে শুরু করল ও। লক্ষ্য করিডরের অপরপ্রান্ত, নিশানা ঠিক করার জন্য সময় নষ্ট করল না। ফলাফলে বুলেটগুলো ব্যর্থ হলেও একটা কাজ হলো—প্রতিপক্ষ সশস্ত্র বুঝতে পেরে গ্যারাজের ডোরওয়ের আড়ালে কাভার নিল দুই খুনী, কয়েক মুহূর্তের জন্য বাধ্য হলো গুলিবর্ষণে বিরতি দিতে।

ব্রিদিং অ্যাপারেটাসটা সমস্যা করছে ভীষণ। মাস্কের স্বচ্ছ অংশটায় প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে মাজল-ফ্ল্যাশ, উপুড় হয়ে থাকায় সিলিণ্ডারটা পিঠে চেপে আছে জগদ্দল পাথরের মত। টান দিয়ে মাস্কটা খুলে ফেলল রানা; সময় যা পেরিয়েছে, তাতে

boiRboi.net

নক-আউট গ্যাসটা অনেকটাই মিলিয়ে যাবার কথা, কৃত্রিমভাবে বাতাস না টানলেও চলবে। হার্নেস খুলে ফেলে দিল সিলিণ্ডারটাও। ঠং করে ধাতব শব্দ হলো জিনিসটা মেঝেতে পড়ার, সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ গুণল রানা।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এল আততায়ীদের উজির বুলেট, বিস্ফারিত চোখে সেগুলোকে সামনের মেঝেতে বিঁধতে দেখল রানা—সারি ধরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে...ধরে ফেলবে এক্ষুণি। ঠিক তখনই মোড়ের দেয়ালের আড়াল থেকে শরীরের একাংশ বের করে গুলি করতে শুরু করল রায়হান, রানার মত ও-ও ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের ভারমুক্ত হয়েছে। পাল্টা আক্রমণে আবারও থেমে যেতে বাধ্য হলো আততায়ীরা, এই সুযোগটা কাজে লাগাল রানা, রায়হানের কাভারিং ফায়ারের আড়াল নিয়ে ক্রল করে পিছিয়ে চলে এল মোড়ে।

খট্ আওয়াজ উঠল তরুণ হ্যাকারের পিস্তলে—ক্লিপ শেষ হয়ে গেছে। পিছিয়ে এল ও, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দফায় গর্জে উঠল আলফা টিমের মেশিনগানদুটো। ঠ্যাক্ ঠ্যাক্ শব্দ করে গুলিগুলো বিঁধছে দেয়ালে।

ভয়ে কাঁপছেন ড. ডোনেন। রানার ইশারায় মাস্ক আর এয়ার বটল্ খুলে রেখে বললেন, 'হায় যিশু! অন্ধকারে ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে কীভাবে?'

'নিশ্চয়ই নাইট-ভিশন আছে,' রায়হান বলল। 'ব্যাটারা পুরোপুরি রেডি হয়েই এসেছে।'

'হুঁ,' রানা একমত হলো। 'তবে লোক মনে হচ্ছে ওই দুজনই। সংখ্যায় ভারি হলে দুপাশ থেকে হামলা চালাত।'

'দুজন হলে কী হবে, মাসুদ ভাই! ওদের ফায়ারপাওয়ার বেশি।'

'ওটুকু ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়া যাবে,' হালকা গলায় বলল রানা।

boirboi.net

'কোনও প্ল্যান এঁটেছেন মনে হয়?'

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা, 'ফ্যাসিলিটিতে কোনও কেমিক্যাল ল্যাব আছে, ডক্টর?'

'বেশ কয়েকটা,' উত্তর দিলেন ডোনেন। 'কেন?'

'শীঘ্রি জানতে পারবেন। সবচেয়ে কাছেরটা কোথায়?'

'এই প্যাসেজেই,' ফেলে আসা পথটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বিজ্ঞানী। 'ছয়-সাতটা রুম পিছনে।'

'আমি আর রায়হান কাভার দিচ্ছি, চলুন ওখানে।'

লুকোচুরির পালা শেষ হয়েছে, টর্চ জ্বেলে হাঁটতে শুরু করলেন ড. ডোনেন। তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে পেছাতে শুরু করল রানা আর রায়হান, পিস্তল রিলোড করে তাক করে রেখেছে টি-জাংশানের দিকে। গুলিবৃষ্টি বন্ধ করেছে শত্রুরা, যে-কোনও মুহূর্তে উদয় হতে পারে ওখান দিয়ে।

আশঙ্কাটা সত্যি প্রমাণের জন্যই যেন দুটো কালো ছায়াকে মোড়ের কাছে নড়ে উঠতে দেখা গেল, মেঝেতে ডাইভ দিচ্ছে। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল উজিদুটো। আলোর ঝলকানিকে অনুসরণ করল এক ঝাঁক বুলেট—মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল সেগুলো। নাইট-ভিশন পরে আর যা-ই করা যাক, লক্ষ্যভেদ করা সহজ নয়। পাল্টা গুলি করল রানা, ধাক্কা দিয়ে রায়হান আর ড. ডোনেনকে ঢুকিয়ে দিল ল্যাবের ভিতরে, পিছু পিছু নিজেও ঢুকল।

নতুন উদ্যমে গুলি করছে আলফা টিমের দুই সদস্য, চেষ্টা করছে এগিয়ে আসার। পাল্লা ফাঁকা করল রানা, ঝুঁকি নিয়ে শরীর বের করল একটু, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে খালি করল ক্লিপটা। ওর প্ল্যানটা সফল করতে হলে লোকগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

'রায়হান! ফায়ার করো! ওদেরকে কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না!'

boiRboi.net

বলে পিস্তল রিলোড করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

'আমি কী করব?' জিজ্ঞেস করলেন ডোনেন। 'এই ল্যাবেই বা এসেছেন কেন?'

'এক্ষুণি দেখতে পাবেন,' রানা বলল। 'ফসফরাস দরকার আমাদের...জলদি খুঁজে বের করুন।'

'ফসফরাস!' ডোনেন বিস্মিত হলেন। 'কী করবেন?'

'আনুন না আগে!' রানা তাড়া দিল। 'আর হ্যাঁ, কাঁচের বোতলে ভরে আনবেন।'

অদ্ভুত নির্দেশটা শুনে শ্রাগ করলেন বিজ্ঞানী, তবে খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ল্যাবের একটা আলমারিতে পাওয়া গেল ফসফরাস—প্লাস্টিকের একটা জারে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা খণ্ড। ল্যাব টেবিল থেকে একটা খালি কাঁচের বোতল সংগ্রহ করলেন তিনি, প্লাস্টিকের জার থেকে পানিসহ সবগুলো খণ্ড ভরে ফেললেন তাতে। তারপর মুখ আটকে নিয়ে এলেন রানার কাছে।

'এই যে এনেছি। চলবে?'

লড়াই থামিয়ে বোতলটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখল রানা। মুখে হাসি ফুটল ওর। 'একদম পারফেক্ট।' রায়হানের দিকে তাকাল ও। 'গুলি থামাও, আমাদের বন্ধুরা কাছে আসুক। নইলে আপ্যায়নটা জুতসই হবে না।'

বোতলটার দিকে তাকিয়ে ওর মতলবটা বুঝে ফেলল তরুণ হ্যাকার। 'অন্ধ করে দেবেন ওদের, তাই না?'

'উঁহুঁ,' মুচকি হাসল রানা। 'জীবনটা আলোয় ভরিয়ে দেব। তাতে ওদের চোখগুলো যদি কানা হয়ে যায় তো আমাদের কী করার আছে?'

প্রতিপক্ষের গুলি থেমে গেছে দেখে ঝট করে উঠে দাঁড়াল

boiRboi.net

আলফা ওয়ান আর টু, উজি থেকে অঝোর ধারায় গুলিবর্ষণ শুরু করল—ব্রাশফায়ার করছে। টার্গেটের দিকে ছুটতে শুরু করেছে একই সঙ্গে—ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে লড়াইটার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে চায়। ওদেরকে নাগালে আসতে দিল রানা, তারপরই দরজার আড়াল থেকে অর্ধেক শরীর বের করে ছুঁড়ে দিল বোতলটা—ধনুকের মত একটা পথে উড়ে গেল ওটা।

থমকে গেল দুই খুনী। নাইট ভিশনের ইমেজে কাঁচের জিনিস ভাল দেখা যায় না, তবে এটুকু বুঝল—শত্রুপক্ষ কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়েছে। বস্তুটার পরিচয় জানতে তির্যক পথটা ধরে চুম্বকের মত সেঁটে রইল তাদের দৃষ্টি, মাত্র ছ'ফুট দূরে যখন ওটা ভূপাতিত হলো, তখনও তাকিয়েই আছে।

ঠকাস করে প্রচণ্ড শব্দে ভাঙল বোতলটা, কাঁচের টুকরোর পাশাপাশি ভিতরের পানিটা ছিটকে গেল চারপাশে—বাতাসে উন্মুক্ত করে দিল ফসফরাসের টুকরোগুলোকে। ফলে যা ঘটবার তা-ই ঘটল।

রাসায়নিক ধর্মের কারণে ফসফরাস একটা আনস্টেবল এলিমেন্ট—অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই তীব্র বিক্রিয়া ঘটায়। এ-কারণেই পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয় জিনিসটাকে। এখন পানি সরে যেতেই বাতাসের অক্সিজেনের নাগাল পেয়ে গেল পদার্থটা, চোখ-ধাঁধানো আলো বিকিরণ করে পুড়তে শুরু করল নিমেষে—যেন একটা ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ফেটেছে। আর এই তীব্র আলোকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে খুনীদের চোখে পৌঁছে দিল নাইট-ভিশন গগলস্।

'আহ্-হ্-হ্!' চেঁচিয়ে উঠল আলফা ওয়ান আর টু। আক্ষরিক অর্থেই এই মুহূর্তে অন্ধ তারা, কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

এক গড়ান দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, পিস্তল তুলে

boiRboi.net

এইমাত্র-ভরা ম্যাগাজিনটা খালি করল দুই খুনীর বুক লক্ষ্য করে. সমান ভাগে।

নাইন-মিলিমিটারের ভারি বুলেটের ধাক্কায় মাটিছাড়া হলো আলফা ওয়ান আর টু, উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। নড়াচড়া করছে না আর।

'রায়হান! ড. ডোনেন! কুইক!' চেঁচাল রানা।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল ওরা, পড়ে থাকা দুই খুনীকে টপকে ছুটতে শুরু করল গ্যারাজের দিকে।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই নড়ে উঠল আলফা ওয়ান আর টু—শকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে। পোশাকের তলায় বুলেটপ্রুফ ভেস্ট আছে দুজনেরই, সেজন্যই বেঁচে গেছে। তারপরও নাইন-মিলিমিটার বুলেটের আঘাত যেমন-তেমন ব্যাপার নয়, মনে হচ্ছে যেন ভেস্টের উপর দিয়েই বুকের খাঁচায় হামানদিস্তা চালিয়েছে কেউ। কাতরানোর মতে আওয়াজ করে উঠে বসল দুজনে, খুলে ফেলে দিল নাইট-ভিশন। চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করছে।

'গড ড্যাম ইট!' সখেদে বলে উঠল আলফা-টু। 'কে ছিল লোকটা? কীভাবে এ-কাজ করল?'

'হাইলি-ট্রেইনড় মাল,' বলল আলফা-ওয়ান। 'আমাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, বেটারও হতে পারে—ইম্প্রোভাইজেশনের ওস্তাদ।' সপ্রশংস দৃষ্টিতে নিভু নিভু হয়ে আসা খণ্ডগুলোর দিকে তাকাল সে। 'ফসফরাস...এই জিনিস আমার মাথাতেও আসত না।'

'কিন্তু কে সে?' আলফা-টু বিভ্রান্ত। 'ফ্যাসিলিটির সবার ডোশিয়ে চেক করে এসেছি আমরা, বিজ্ঞানী বা স্টাফরা তো দূরের কথা, সিকিউরিটিতেও এমন চালু হবার মত ব্যাকগ্রাউণ্ড কারও

নেই।'

'বাইরের কেউ তো বটেই, কিন্তু এখানে এল কোত্থেকে; সেটা বুঝতে পারছি না।'

'ভাবাভাবিটা বন্ধ করো এখন। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু!' মনে করিয়ে দিল আলফা-টু।

'এত দুশ্চিন্তা করো কেন?' হাসল আলফা-ওয়ান। 'ব্যাকআপ রেখেছি কি এমনি এমনি?' কোমর থেকে ওয়াকিটকি খুলে ট্রান্সমিট বাটন চাপল সে। 'আলফা-ওয়ান কলিং আলফা-থ্রি...কাম ইন, আলফা-থ্রি।'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল তৃতীয় খুনী। 'দিস ইজ আলফা-থ্রি। ব্যাপার কী, তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েছি।'

'কীসের প্রতিরোধ! গ্যাসটাতে কাজ হয়নি?'

'পরে সব খুলে বলব। এখন আমাদের সাহায্য দরকার।'

'কী চাইছ—নীচে এসে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিই?'

'না, পিছনের দরজাটা সামলাও তুমি—টার্গেট গ্যারাজ হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। সঙ্গে দুজন বডিগার্ড আছে—অত্যন্ত যোগ্য লোক। আমরা এদিক থেকে আক্রমণ করছি ওদের।'

'ওকে। আর কিছু?'

'উঁহুঁ। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দুই খুনীর। মেঝে থেকে উজিটা কুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল আলফা-ওয়ান। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো যাই। অচেনা বন্ধুদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ বাকি আছে এখনও।'

boiRboi.net

উনিশ

গ্যারাজের একজিট ডোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর রায়হান, নিষ্ফলভাবে টেপাটেপি করছে সুইচ, কিন্তু খুলছে না পাল্লাদুটো।

'হলোটা কী?' বিরক্ত গলায় বলল তরুণ হ্যাকার। 'খুলছে না কেন?'

'মনে হচ্ছে ওরা দরজার পাওয়ার সাপ্লাই কাট-অফ করে দিয়েছে,' কারণটা আন্দাজ করতে পেরে বলল রানা।

'হুঁ, ব্যাটাদের দেখছি কিছুই চোখ এড়ায়নি। আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য সব ধরনের আয়োজন করে রেখেছিল।'

'প্রফেশনাল খুনীদের বৈশিষ্ট্যই ওটা।'

'কিন্তু এখন আমরা বের হব কী করে?'

গ্যারাজে পার্ক করে রাখা যানবাহনগুলোর উপর চোখ বোলাল রানা, পরক্ষণেই মুখে হাসি ফুটল ওর। 'হাতের কাছে লৌহদানব থাকতে চিন্তা কী?'

'কীসের কথা বলছেন?' রায়হান বিস্মিত।

আঙুল তুলে একটা স্নো-প্লাউ দেখাল রানা—বুলডোজারেরই আরেকটা সংস্করণ ওটা, অত্যন্ত শক্তিশালী, বরফের চাঁই ভাঙা এবং সমান করার কাজে ব্যবহার করা হয়। একজিট ডোরের পুরু পাল্লা আর যন্ত্রদানবটাকে পালা করে দেখল রায়হান।

boiRboi.net

'এই মোটা দরজা ভাঙতে পারবে ওটা?' ওর গলায় দ্বিধা।

'জানার উপায় তো একটাই, তাই না?' স্নো-প্লাউয়ের দিকে এগোতে শুরু করল রানা। ঠিক তখুনি ডেকে উঠলেন ড. ডোনেন—বাড়তি সতর্কতা হিসেবে পিছন দিকে নজর রাখার জন্য তাঁকে ডোমের প্যাসেজ আর গ্যারাজের মধ্যকার অ্যাকসেস ডোরে পাহারায় রেখেছে ওরা।

'মি. রানা...মি. রানা! কে যেন আসছে, আমি পায়ের শব্দ পাচ্ছি।'

চট করে ঘড়ি দেখল রানা—নাহ্, এত তাড়াতাড়ি তো ডোমের অজ্ঞান মানুষগুলোর জেগে ওঠার কথা নয়! গ্যারাজে যারা এলোমেলোভাবে পড়ে ছিল, তাদের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা—জ্ঞান ফেরার সময় হলে ওদের দু-একজন নিশ্চয়ই উঠে বসত। তা হলে কে হতে পারে?

'কী করব আমি...' বলতে বলতে চৌকাঠের আড়ালে মাথা টেনে নিলেন ডোনেন, আর তক্ষুণি গর্জে উঠল জোড়া সাবমেশিনগান, খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল এক ঝাঁক তপ্ত সীসা। ভয়ে কেঁপে উঠলেন বিজ্ঞানী, মাথাটা সময়মত না সরালে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতেন।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। 'ডক্টর! সরে যান...সরে যান ওখান থেকে!'

'গুলি করছে কে?' হতভম্ব গলায় বলল রায়হান। 'ওই দুজনের সঙ্গে আরও লোক ছিল নাকি?'

'লোক না,' বলল রানা, ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। 'বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ছিল।'

ছুটতে শুরু করল ও, কাছেই একটা ল্যান্ড রোভারের রিয়ার ব্র্যাকেটে ঝুলছে ফুয়েলভর্তি একটা জেরিক্যান—ছোঁ মেরে তুলে

boiRboi.net

নিল ওটা।

ড. ডোনেন দরজার কাছ থেকে সরে গেছেন, জেরিক্যান হাতে ওখানে পৌঁছেছে মাত্র রানা, এমন সময় আবার হলো গুলি। রায়হান এগিয়ে আসছে দেখে হাত তুলে থামাল ও। বলল, 'আমি এদিকটা দেখছি, তুমি দরজাটা ভাঙো—ওটাই আসল কাজ। আমাদের অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে এসেছে, যুদ্ধ করে কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্নো-প্লাউয়ের দিকে ছুটে গেল রায়হান। ড. ডোনেন কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আ...আমাকে কিছু করতে হবে?'

পিছন ফিরে তাকাল রানা—গ্যারাজের একটা পাশে দুই ট্র্যাকের মোটর-সাইকেল জাতীয় ছ'টা বাহন পার্ক করা আছে। সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'স্নো-মোবিল চালাতে জানেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গি করলেন বিজ্ঞানী।

'গুড,' রানা বলল। 'চাবি জোগাড় করুন দুটোর—পালানোর জন্য ওগুলোই ব্যবহার করতে হবে আমাদের, প্লাউ আর ট্র্যাক্টরের স্পিড খুব কম কি না! চাবি এনে স্টার্ট দিয়ে বসুন একটায়, অন্যটা আমার আর রায়হানের জন্য থাক। ও দরজাটা ভাঙলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

নির্দেশটা পেয়ে আর দেরি করলেন না ডোনেন, চাবির জন্য দৌড়ে চলে গেলেন গ্যারাজের একপাশে বুথটার দিকে।

'গ্যারাজে যারা আছ, শোনো!' প্যাসেজ থেকে গমগম করে উঠল আলফা-ওয়ানের গলা। 'বোকামি কোরো না, পালাবার কোনও পথ নেই তোমাদের। বিজ্ঞানীটাকে তুলে দাও আমাদের হাতে, তা হলে প্রাণে মারব না। কী, রাজি আছ?'

চুপ করে রইল রানা।

'কথা বলছ না কেন?' ধমক ভেসে এল।

চৌকাঠ দিয়ে একটু শরীর বের করে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ধাঁই ধাঁই করে তিনটা গুলি ছুঁড়ল রানা। ওপাশ থেকে গালাগাল ভেসে এল।

ও বলল, 'ওটাই আমাদের জবাব। পছন্দ হয়েছে?'

খানিক নীরবতা। তারপর আবার কথা বলল কঠিন চেহারার যুবক।

'বিরাট ভুল করছ, স্ট্রেঞ্জার। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।'

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল রানা, হাত কাজে ব্যস্ত। জ্যাকেটের তলা থেকে শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে আনছে। 'কী আর করা যাবে, বলো? মানুষ মাত্রই ভুল করে—এটা জানো তো? ও-নিয়ে মায়াকান্না জুড়ে লাভটা কী?'

'কে তুমি, স্ট্রেঞ্জার? ফ্যাসিলিটির কেউ নও—তা তো বুঝতেই পারছি। কী তোমার পরিচয়?'

'তোমরা দেখি একদম অভদ্র,' কাজ করতে করতে বলল রানা। ছেঁড়া কাপড়টা জেরিক্যানের মুখ খুলে তেলে ভেজাচ্ছে। 'কারও নাম-ধাম জিজ্ঞেস করার আগে নিজেরটা বলতে হয়, এটা জানো না?'

'আমাদের নাম-পরিচয় তোমার কোনও কাজে আসবে না। ইউ আর আ ডেড ম্যান!'

তেলে ভেজা কাপড়টা পাকিয়ে সলতের মত জেরিক্যানের মুখে লাগাল রানা, আলগা করে আটকাল ঢাকনাটা। প্রতিপক্ষকে বলল, 'কথাটা আমি তোমাদেরও বলতে পারি...তবে ম্যানের জায়গায় হিজড়া শব্দটা বসাতে হবে। যারা অসহায় এবং নিরীহ মানুষকে খুন করতে চায়, তাদের আমি অন্য কিছু ভাবি না কি না! ভাল কথা, হিজড়া শব্দের বহুবচনটা কী?'

গালাগালের তুবড়ি ছোটাল আলফা-টু। 'ওই বানচোতের চামড়া খুলে যদি আমি লবণ না মাখিয়েছি তো আমার নাম...'

কথাটা ঢাকা পড়ে গেল স্নো-প্লাউয়ের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে। এগিয়ে গিয়ে একজিট ডোরের লোহার পাল্লায় নাক ঠেকিয়েছে ওটা, ঠেলতে শুরু করেছে সর্বশক্তি দিয়ে। ইস্পাত তোবড়ানোর গগনবিদারী আর্তনাদ ভেসে এল, মড়মড় করে গোটা ডোমটাই যেন প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

'গড ড্যাম ইট!' চেঁচিয়ে উঠল আলফা-ওয়ান। 'ওরা দরজাটা ভেঙে ফেলছে!'

ঝট করে সোজা হলো দুই খুনী, ব্রাশফায়ার করতে করতে ছুটল গ্যারাজের দরজার দিকে।

তাড়াহুড়ো করল না রানা, পকেট থেকে একটা লাইটার বের করল—গ্যারাজে আসার পথে অ্যামিউনিশনের জন্য অজ্ঞান এক গার্ডের শরীর তল্লাশি করতে গিয়ে পেয়েছে ওটা, সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল। সলতেটায় আগুন ধরিয়ে শুয়ে পড়ল ও, উড়ে আসা বুলেটের ধারা আর ফ্লোরের মাঝখানে যে-ফাঁকাটা আছে, সেখান দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করল। প্যাসেজটা অন্ধকার হওয়ায় ওগুলো হিট করল কি না বোঝা গেল না, তবে গুলিবর্ষণ থামিয়ে দুটো পিলারের আড়ালে কাভার নিতে বাধ্য হলো হামলাকারীরা।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, জেরিক্যানটা হাতে ঝুলিয়ে খোলা দরজায় চলে এল ও, তারপর সর্বশক্তিতে জিনিসটা প্যাসেজের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আটকে ফেলল পাল্লা।

উড়ে এসে দুই খুনীর পাঁচ গজ দূরে ধপ করে আছড়ে পড়ল ফুয়েল ভর্তি জেরিক্যানটা। জ্বলতে থাকা সলতের আলোয় দৃশ্যটা দেখে আশু বিপদ আঁচ করতে পারল ওরা সঙ্গে সঙ্গে।

'হায় যিশু! আবার?' হাহাকার করে উঠল আলফা-টু

উল্টো ঘুরে দৌড় দিল খুনীরা, পিছনে গুমগুম করে ঘটল বিস্ফোরণ—বিকট আওয়াজের পাশাপাশি কমলা রঙের একটা আগুনের গোলা বড় হলো চোখের পলকে, গ্রাস করে ফেলল অনেকটা জায়গা। নিরাপদ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেনি তখনও দুই আততায়ী. পিঠে শকওয়েভের ধাক্কা অনুভব করল ওরা—মাটিছাড়া হয়ে কয়েক হাত সামনে আছড়ে পড়ল, পতনের আঘাতে বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস।

কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে থেকে উহ্-আহ্ করে সোজা হলো দুই ঘাতক। মাথা ঝাঁকিয়ে কানের ভিতর বোঁ বোঁ করতে থাকা অদৃশ্য বোলতাগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করল।

'শালার ইসের বাচ্চাকে আমি খুন করে ফেলব,' খেপাটে গলায় বলল আলফা-টু।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আলফা-ওয়ান। 'কুইক! ওরা পালিয়ে যাচ্ছে...আলফা-থ্রি একা তিনজনকে সামলাতে পারবে না।'

তাড়াহুড়ো করে ফেরার চেষ্টা করল দুই খুনী, তবে প্যাসেজে ছড়িয়ে পড়া আগুনটা বাধা হয়ে দাঁড়াল ওদের পথে। ওটা ভেদ করে অন্যপাশে যাবার আগেই একজিট ডোর পরাস্ত হলো। ইস্পাত ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল স্নো-প্লাউ, র‍্যাম্পের উপর দিয়ে ভাঙাচোরা টুকরোগুলো ঠেলতে ঠেলতে এসে নামল শেলফের সারফেসে। ফোকরটা দিয়ে পিছু পিছু ছিটকে বেরুল দুটো স্নো-মোবিল—সামনেরটায় রানা, পিছনে ড. ডোনেন। প্লাউয়ের পাশে এক মুহূর্তের জন্য থামল রানা, রায়হান লাফ দিয়ে পিছনে চড়ে বসতেই আবার প্রবল গতিতে সামনে বাড়ল।

পাহাড়ের ঢাল থেকে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল আলফা-থ্রি। একটা রেমিংটন এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ স্নাইপার রাইফেল সেট করে অপেক্ষা করছে সে, চোখ রাইফেলটার উপরে বসানো লিওপোল্ড স্কোপে।

ওয়াকি-টকিতে বলল, 'আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি। কী করব?'

'টার্গেটকে খতম করো আগে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আলফা-ওয়ান। 'ওটাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি। বাকি হারামজাদা দুটোকে আমরা দেখছি।'

'এতক্ষণ ধরে তো দেখাদেখিই চলছে বোধহয়,' টিটকিরি মারল আলফা-থ্রি। 'ওদের গায়ে ফুলের টোকাও পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'শাট আপ!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল আলফা-টু। 'এখানে থাকলে বুঝতে শালারা কেমন পিছলা। আমাদের নাকে দম তুলে রেখেছে।'

'কথা না বাড়িয়ে যা বলছি, সেটাই করো,' হুকুম দিল নেতা।

'ঠিক আছে।'

অপটিক্যাল সাইটে দ্বিতীয় স্নো-মোবিলটা তুলে আনল আলফা-থ্রি, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ্যস্থির করার জন্য অপেক্ষা করল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর টিপে দিল ট্রিগার।

বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজে প্রকম্পিত হলো আইস শীটের শুভ্র প্রান্তর, পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়ে গেল কয়েক গুণ, গুমগুম করতে থাকল দিগন্ত জুড়ে।

স্নো-মোবিলে বসা অবস্থায় আঁতকে উঠল রায়হান। 'ইয়াল্লা! মাসুদ ভাই...'

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। 'হ্যাঁ, বাইরে একজন স্নাইপার রেখেছে ওরা।'

পিছনটা এক ঝলক দেখে নিল রায়হান। 'গুলিটা মিস হয়েছে, তবে স্যরকে সাবধান করা দরকার।'

একসঙ্গে পিছনের স্নো-মোবিলের দিকে মাথা ঘোরাল দুই

boiRboi.net

বিসিআই এজেন্ট, ঠিক তক্ষুণি দ্বিতীয়বারের মত গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল। রানাদের চোখের সামনে ড. ডোনেন ঝাঁকি খেলেন—মাথার একটা পাশ উড়ে গেল গুলির আঘাতে; অবিশ্বাসের চোখে খুলির ভাঙা অংশ, মগজ আর রক্ত ছিটকাতে দেখল ওরা।

'স্য-আ-আ-র!' আর্তনাদের মত শোনাল রায়হানের গলাটা।

এখনও সিটে বসে আছেন কম্পিউটার-বিজ্ঞানী, দৃষ্টি বিস্ফারিত, হাতদুটো হ্যাণ্ডেল বারে। তবে স্নো-মোবিলটা দশ গজ যেতেই মুঠো আলগা হয়ে গেল তাঁর, উল্টেপাল্টে লাশটা পড়ে গেল বরফের উপর।

'মাসুদ ভাই...স্যর...' রায়হান যেন কেঁদে ফেলবে।

রিসার্চ ডোমের ভাঙা একজিট ডোরের ফোকর দিয়ে নতুন দুটো স্নো-মোবিলকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠল রানা, প্রথম দুই খুনী আসছে ওদের ধাওয়া করতে। 'রায়হান!' ধমক দিয়ে উঠল ও। 'নিজেকে সামলাও!'

'কিন্তু...কিন্তু...স্যর...'

'ওঁর জন্য আর কিছু করার নেই আমাদের,' নির্দয় ভঙ্গিতে বলল রানা, স্নো-মোবিলের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। 'এখন নিজেদের বাঁচতে হবে।'

আবার গর্জে উঠল আলফা-থ্রি'র রাইফেল, ওদের বামপাশে বরফ ছিটকাল। স্নাইপার লোকটাকে ব্যর্থ করে দিতে আঁকাবাঁকা একটা পথে স্নো-মোবিল ছোটাচ্ছে রানা, স্থির থাকছে না এক রেখায়, দ্রুত রাইফেলের রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কাজটা খুব একটা কঠিন হত না, যদি না পিছু পিছু অন্য দুটো স্নো-মোবিল ছুটে আসত।

চতুর্থবারের মত গুলি করল তৃতীয় খুনী, এবার ডানদিকে বরফ উড়ল। সোজাপথে এসে ইতোমধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে

boiRboi.net

আলফা-ওয়ান আর টু, মেশিনগান তুলে তারাও গুলি করল। পলাতকদের পিছনের বরফে দুই সারিতে নিষ্ফল কামড় বসাল বুলেট—লক্ষ্য খুঁজে পায়নি।

গাল দিয়ে উঠল রানা। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা—পাহাড়ের ঢালে বসা স্নাইপার আর ধেয়ে আসা অন্য দুই আততায়ী পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। চারপাশে ব্যস্ত নজর বুলিয়ে একটাই উপায় দেখতে পেল ও—শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দেয়া যাবে বটে, কিন্তু জীবনটা রক্ষা পাবে কি না, বলা মুশকিল। এক পলকের জন্য চোখ বুজে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল ও, তারপর জুয়াটা খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

গোঁ গোঁ করে উঠল ছোট্ট বাহনটার ইঞ্জিন, ট্র্যাক ঘুরিয়ে দিক বদলাল রানা—ছুটে যাচ্ছে আইস শেলফের সবচেয়ে কাছের কিনারার দিকে। অসমতল সারফেসের উপর দিয়ে এখন রীতিমত পেন্টাথলনের ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ওদের স্নো-মোবিল।

'করছেন কী, মাসুদ ভাই!' ওর উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে পেরে আতঙ্কিত গলায় বলল রায়হান।

'শেষ চেষ্টা,' এক কথায় জবাব দিল রানা।

পিছনে আবার গুলির কর্কশ আওয়াজ হলো, আশপাশ দিয়ে তপ্ত সীসা ছুটে যেতে দেখল রানা। পরক্ষণেই একটা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শোনা গেল...তরুণ হ্যাকার নেতিয়ে পড়ল ওর পিঠের উপরে।

'রায়হান! রায়হান!! লাগেনি তো?'

জবাব পাওয়া গেল না কোনও। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার, এই পরিস্থিতি থেকে শুধু প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেই হয়, খুনীগুলোর সবকটাকে নিজ হাতে শায়েস্তা করবে ও।

এসে গেছে শেলফের কিনারা, গতি না কমিয়ে ছুটে গেল রানা, শেষ মুহূর্তে বন্ধ করে ফেলল চোখ। প্রবল বেগে ক্লিফের কিনারা অতিক্রম করল ছোট্ট স্নো-মোবিল, খালি বাতাসেই চলে গেল কিছুটা, তারপর খসে পড়তে থাকল নীচের দিকে। বেঢপ আকৃতির ভারি বাহনটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দড়ি ছেঁড়া পুতুলের মত পড়ে যাচ্ছে দুটো মানবদেহও। রায়হানকে জড়িয়ে ধরে আছে রানা, বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে লাথি মারল স্নো-মোবিলের গায়ে।

ঠিকই আন্দাজ করেছিল ও: বিশফুট নীচে সত্যিই একটা বরফের তাক রয়েছে। সেটার উপরেই আছাড় খেয়ে পড়ল দুজন। কিন্তু স্নো-মোবিলটাও দড়াম করে পড়ল ওদের থেকে তিন হাত তফাতে। তারপর গড়িয়ে কিনারা টপকে চলে গেল আরও একশ' ত্রিশ ফুট নীচে। ঝপাৎ শব্দে পড়ল ওটা পানিতে। অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে উঠল সাগরের পানি।

কিন্তু এ কী! দুলছে কেন শেলফ থেকে বেরিয়ে আসা বরফের চাঁই! কয়েক সেকেণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না রানা...তারপর যখন বুঝল, তখন আর কিচ্ছু করার উপায় নেই। ভারী স্নো-মোবিল তাকটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে, নড়ে যাওয়া দাঁতের মত নড়বড় করছে ওটা এখন—যে-কোনও মুহূর্তে...

চিন্তাটা সম্পূর্ণ করার সময় পেল না রানা। খসে এল চাঁইটা আইস শেলফের গা থেকে, সোজা নেমে যাচ্ছে এখন ওদের দুজনকে নিয়ে সাগরের দিকে। ঝপাস শব্দে পড়ল গিয়ে আর্কটিকের হিম-শীতল পানিতে।

মৃত্যু এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

boiRboi.net

কিনারায় এসে নিজেদের স্নো-মোবিল থামাল আলফা-ওয়ান আর টু, সামনে এগিয়ে যখন উঁকি দিল, তখন অথই জলের মাঝখানে

মানুষদুজনের কোনও চিহ্নই দেখতে পেল না।

ইয়াহু জাতীয় একটা উল্লাসধ্বনি করল আলফা-টু। 'ওখান থেকে কারও বেঁচে ফেরা অসম্ভব। পানিতে আছাড় খেয়ে যদি না-ও মরে; ওদের খতম করে দেবে ঠাণ্ডাটা।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো আলফা-ওয়ান।

খড়খড় করে উঠল ওয়াকি-টকি। 'কী হলো, কাজ হয়েছে?' আলফা-থ্রি'র গলা।

'হ্যাঁ,' খুশি খুশি গলায় বলল আলফা-টু। 'ব্যাটারা সোজা পানিতে গিয়ে পড়েছে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট! আপদ বিদায় হয়েছে। তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, হেলিকপ্টারটা অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ থেকে।'

'এক্ষুণি আসছি।' বলে নেতার দিকে তাকাল দ্বিতীয় খুনী। 'চলো যাই।'

স্নো-মোবিলে ওঠার আগে শেষবারের মত পানির দিকে তাকাল কঠিন চেহারার যুবক, শত্রু হলেও প্রতিপক্ষের সদ্যপ্রয়াত লোকটার জন্য শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। বিড়বিড় করে বলল, 'রেস্ট ইন পিস, স্ট্রেঞ্জার। সত্যি, তুমি ভুগিয়েছ বটে!'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

boiRboi.net